আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ

সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড

১২৮৩ সাল।

কলিকাতা।

১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্রে,

শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

সূচিপত্র।

আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোতিষ ... ১
আধুনিক ভারত ... ৪১৩
আর্য্যজাতির ব্যবহার-বিজ্ঞান ৪৯০, ৫৪৪
কপালকুণ্ডলা ৬৮, ৯৭, ১৬৩ ২০৭
কার্য্যের সোপান ... ২৫৭
গ্রীক্ এবং হিন্দু ... ৪৫১, ৪৯৫
জাতীয় চরিত্র ... ১৪
চিকিৎসা-কল্পদ্রুম ... ২৩২
তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত ১৪৫
তড়িতের ইতিবৃত্ত ... ৫০৬
দিল্লী ... ২৭৫
দুখ-সঙ্গিনী ... ৪৮১
প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ ... ১১১, ২৪১
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৪৫, ৯৫, ১৯১, ২৪০, ২৮৪, ৩৩২, ৪৭৮, ৫২২, ৫৭৩
পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি ... ২৩৭
পাণিনি ... ৩২১, ৩৬৪, ৪১৬
পরলোক ও সমাজ ৩৩৭, ৩৯৭, ৪৭২
পৌরাণিকী গাথা ... ৫৩৯
ফুলবালা ... ৫৩৫
বাঙ্গালী গরিব কেন ... ৫২৯
বেদ পুরাণ ও তন্ত্র ... ৫৫৬
ব্যবহার-বিজ্ঞান ... ২৫১
বৃক্ষচ্যুত লতা ... ৩[illegible]
বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি ... ৩১৯, ৪১১
বিবিধ সমালোচন ... ৩৪৮, [illegible]
ভারতের ভাবী পরিণাম ... [illegible]
ভারতীয় ইতিহাস ... ৩৭
মহাপুরুষের নাম ... ১১৩
মেহের আলি ২৬, ১১৬ ১৮৫, ১৯৮, ৩১৪, ৩৫৫, ৪২৪, ৪৪৪
ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী ৭৮, ৩৩, ২৬৬, ৫৬২
মনুর্ষা-বংশ ... ২৮৯
যুনানী নাট্যপ্রণালী ৪২০, ৫৯৯
শরীর ও মন ... ৪৯
শারদীয় জলদখণ্ড ... ২৮১
শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি ২১৬
সজল প্রতিমা ... ৯৩
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ৫৮, ১০৫, ১৫৯, ২২২
সন্ধ্যা ... ১১২
স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ ৩০৬
সামরিদ্ জাতি ... ৩৮৫
সম্বন্ধ-নির্ণয় ... ৪২৭

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

তৃতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১২৮৩ সাল। ১ম সংখ্যা।

আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোতিষ।*

জ্যোতিষ অতি প্রাচীন বিজ্ঞান। যখন পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব অধিক দিন হয় নাই, যখন গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার অঙ্কুর ও উঠে নাই, অধিক কি যখন মানব—বিজ্ঞান কাহাকে বলে জানিত না সেই প্রাচীন কালে ইহার জন্ম। মানব সহজ কবি। যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে সেই কবি। সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না এমন মনুষ্যই নাই। চান্দ্রমসী নিশিতে মন্দাকিনী-শোভিত, নক্ষত্রমালা-বিভূষিত নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া উহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় না এমন মনুষ্যই নাই। এই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যেদিন মানব মনে

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are,

এই ভাব উত্থিত হইয়াছিল সেই দিন হইতেই জ্যোতিষের সূত্রপাত। এই সৌন্দর্য্য সকল কালেই বিস্ময় ও জ্ঞান-পিপাসা উত্তেজিত করিয়াছে। মিশর, আরব, পারস্য, সিরিয়া, ক্যাল্‌ডিয়া প্রভৃতি দেশ সকল মানব-জাতির শৈশব-দোলা। এই সকল দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও তদানীন্তন আচার ব্যবহার তত্রত্য অধিবাসীদিগকে এই জ্ঞান-পিপাসু হইতে বাধ্য করিয়াছিল। তাহারা বিশদ নীলিম আকাশে প্রতিভাত নক্ষত্রাবলির যে ঔজ্জ্বল্য দেখিত, অপেক্ষাকৃত উত্তরে সে ঔজ্জ্বল্য—সে সৌন্দর্য্য অজ্ঞাত ছিল। অপরন্তু মৃগয়া বা পশু-পালন যাহাদের জীবনোপায় ছিল—রৌদ্রে, বৃষ্টিতে তরুতল যাহাদের আশ্রয় ছিল, তৃণাচ্ছাদিত অনাবৃত ভূমি যাহাদের শয্যার কার্য্য করিত—সুতরাং এই উজ্জ্বল নভোমণ্ডল সর্ব্বদা যাহাদের চক্ষুর উপর থাকিত তাহারা কি উহার বিষয় না ভাবিয়া; তাহারা কি উহার পরিবর্ত্তন বকল পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া থাকিতে

* Being the substance of a lecture delivered by Very Revd. Father Lafont at the last meeting of the Bethune Society.

পারিত ? ফলতঃ এই সকল অবস্থায় এই সকল রাখাল-দার্শনিক দিগের দ্বারা—যে জ্যোতিষ এক্ষণে এত উন্নতি-পথে ধাবিত —সেই জ্যোতিষের সূত্র পাতিত হয়। যদিও তাহাদের নিকট হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কাল্পনিক ভাব সকল ভিন্ন আর কিছুই পাই না এবং ইহা অপেক্ষা অধিক আশাও করিনা তাহারা বহু পরিশ্রমে বহুদর্শনে যে সকল ঘটনা, যে সকল প্রত্যক্ষ সঞ্চয় করিয়াছিল ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিদ্ গণ সেসকলের সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হন। কিরূপে তদানীন্তন তারাতত্ত্ব (Astrology) হইতে অধুনাতন জ্যোতিষের আবির্ভাব হইল কিরূপে নক্ষত্রগণ দেবত্ব ও অদৃষ্টের বিধাতৃত্ব হইতে জড়ত্বে উপনীত হইল তাহা এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে বিজ্ঞান এত অধিক কাল অনুশীলিত হইয়াছে তাহা সময়ের উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছে কিনা তাহাই দেখা যাউক।

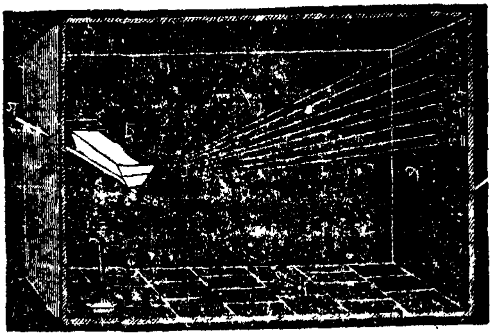
অন্যান্য আধুনিক,বিজ্ঞানের ক্রুত উন্নতির সহিত তুলনায় উহা যে নিতান্ত মন্দ-গতি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি-সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছিল তাহাকেবল পর্য্যবেক্ষণ ও অঙ্ক শাস্ত্রের বলে এবং কেবল দূরত্ব, আকৃতিও গতি সম্বন্ধে। প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অস্পষ্ট ছিল এবং তাহাও আবার অস্পষ্ট এবং অধিকাংশ কল্পনা-প্রসূত। এ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণই এবিষয়ে আমাদের প্রধান সহায় ছিল। দূরবীক্ষণ দ্বারাই চন্দ্রের কলঙ্কে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক-ভ্রম অপনীত হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারাই চন্দ্রে পাহাড় পর্ব্বতের সত্বার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু দূরবীক্ষণের ক্ষমতা অতি সঙ্কীর্ণ। ইহাদ্বারা আমরা কোন কালেই এক নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার অতিরিক্ত যাইতে পারিতাম না। দূরবীক্ষণ দূরবর্ত্তী সুতরাং ক্ষুদ্র-প্রতীয়মান বস্তু সকলকে নিকটবর্ত্তী ও বৃহদায়তন করিয়া দেখায়। অসহায় চক্ষুতে অর্দ্ধহস্তপরিমিত চন্দ্রে আমরা যাহা দেখিতে সক্ষম হই দূরবীক্ষণ-সাহায্যে শতগুণ আয়তি-প্রাপ্ত অথচ সমীপাগত চন্দ্রে তাহা অপেক্ষা শতগুণ দেখিতে পারি। এবং দূরবীক্ষণ যে পরিমাণে বৃহদায়তন করে আমরাও সেই পরিমাণে অধিক দেখি। কিন্তু দূরবীক্ষণ যথেচ্ছ আয়তির বৃদ্ধি করিতে পারেনা অর্থাৎ করিলে আমরা দেখিতে পাই না। দূরবীক্ষণের সে ক্ষমতা থাকিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রকৃতি-জ্ঞানে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইত না। যে পরিমাণে আয়তির বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে আলোকের হ্রাস হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকের হ্রাস আমাদের দৃষ্টিরপ্রতিবন্ধকতা করেনা অর্থাৎ যতক্ষণ দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট বৃহদায়তি প্রাপ্ত বস্তুর প্রতিকৃতিতে এত আলোক থাকে যে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইচ্ছানুত আয়তির বৃদ্ধি করা যায়। তাহার অধিক করিতে গেলেই প্রতিকৃতি অস্পষ্ট ও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং এইখানেই

দূরবীক্ষণের ক্ষমতার সীমা। এই সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়, স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন ভিন্ন জ্যোতিষের উপায় নাই এত কালের পর সেই স্বতন্ত্র এবং উন্নতি-অভিমুখ যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং এই পথই বাস্তবিক যুক্তি-সঙ্গত। মনে কর চীনদেশের বিষয় আমরা কিছুই জানি না সেখানে কখন যাই নাই এবং সেখানে কখন যাইতে পারিব না; কিন্তু সেই দেশ হইতে কোন দূত আমাদের দেশে আসিয়াছে এরূপ স্থলে চীনের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে ঐ সেই লোকের নিকট যাইতে হয়—ইহা সামান্য বুদ্ধিতে ও উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি চীন ভাষায় অজ্ঞ হই আমরা তাহার নিকট কিছুই জানিতে পারি না। সহস্র সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলীতে কেহ কখন যায় নাই এবং যাইবেওনা কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্র প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক সূর্য্য হইতে এক একটী দূত আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই দূত উহাদের কিরণ। সকল দূতেরই ভাষা একরূপ। জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আপনাদের ভাষায় আপন আপন দেশের অনেক কথা কহিতে পারে। যদি আমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেশের গল্প করাইতে পারি তাহা হইলে অনেক জানিতে পারি। কিন্তু এতদিন আমরা তাহাদের ভাষা জানিতাম না সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই এবং সেই জন্য তাহাদের নিকট কিছুই জানিতে পারি নাই। তাহাদের ভাষার মধ্যে এক কথা কেবল বুঝিতাম তাহার অর্থ তাহাদের দেশ আছে এবং তাহারা না বলিলে ইহাও জানিতাম না। এক্ষণে আমরা সেই ভাষা শিখিয়াছি এখন হইতে আমরা তাহাদিগকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব এবং তাহারাও আপন আপন দেশের কত গল্প বলিবে!

এইরূপে আমরা তাহাদিগকে যত গল্প বলাইতে পারিব ততই শিখিতে পারিব। এই ভাষা কাণে শুনা যায় না চক্ষে দেখিতে হয়। তুমি চন্দ্র-রশ্মিকে জিজ্ঞাসা কর "হে দূত! তোমাদের দেশে জল আছে কি?" দূত মুখে কোন উত্তর দিবে না লিখিয়া উত্তর দিবে। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র (Spectroscope) ইহার লিখিবার কাগজ। এই কাগজে উত্তর লিখিত হইবে। তুমি যদি ভাষা শিখিয়া থাক এই কাগজ দেখিলেই উত্তর বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে এই ভাষা কি? ইহা হইতে আমরা কি শিখিয়াছি? আর কত শিখিতে পারিব? এই সকল বিষয় দেখা যাউক। ইহাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পাঠক! অর্দ্ধমেঘাবৃত, অর্দ্ধ-মুক্ত আকাশে রামধনুকের শোভা দেখিয়াছ এবং বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়াও অবিকল সেইরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়াছ। এই সকল বর্ণ কোথা হইতে আইসে?—সূর্য্য-কিরণ হইতে। সূর্য্য-কিরণ স্বতন্ত্র

ইহা হইতে বর্ণ বৈচিত্র্য উদ্ভূত হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু, যেমন কতক গুলি রূঢ়-পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কতক গুলি রূঢ় বর্ণের সংযোগে বর্ণের শুভ্রত্ব উৎপাদিত হয়। শুভ্র সূর্য্য-কিরণের উপাদান ও এইরূপ কতক গুলি রূঢ় বর্ণ। সহজ অবস্থায় সেই রূঢ় বর্ণ গুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। বেল্ওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সেই শুভ্র কিরণসকল ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া তাহাদের উপাদানীভূত রূঢ়-বর্ণ সকলে বিশ্লিষ্ট হয়।



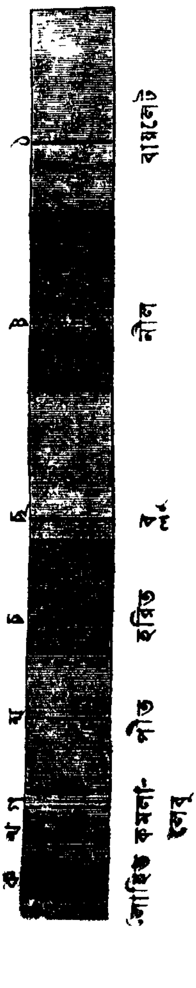
সনপ কোন অন্ধকার গৃহ। একটী সঙ্কীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু এক-তুলিকা (Pencil) সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে।

যদি কোন প্রতিবন্ধক না দেওয়া যায় ইহা সোজা চলিয়া যাইবে এবং ইহার পতন-স্থান নয় সূর্য্যের এক প্রতিমূর্ত্তি পড়িবে। কিন্তু যদি একটী ত্রিমুখ বেল্-ওয়ারি কাচ(triangular prism)চ ইহার গতির পথে ব্যবহিত হয় সে কিরণ-তুলিকা আর সে পথে না যাইয়া ভূমির দিকে অবক্ষিপ্ত (deflected) ও বিকীর্ণ(dispersed) হইবে এবং দূরস্থ এক পরদায় (screen) ঈষদায়ত লম্ব-দণ্ডে পরিণত হইবে। এই লম্ব-দণ্ড রামধনুকের সমস্ত বর্ণে রঞ্জিত। চিত্রে বা হইতে লো পর্য্যন্ত ভাগই সেই দীর্ঘীকৃত দণ্ড। ইহাকে সৌর আলোক-চিত্র (Solar Spectrum) বলে ইহাতে উপর হইতে ক্রমান্বয়ে বায়লেট্, নীল, ব্লু, হরিত, পীত, কমলা লেবুরবর্ণ ও লোহিত এই সকল বর্ণ থাকে। চিত্রে আদি অক্ষরের দ্বারা সেই সকল বর্ণের স্থান চিহ্নিত আছে। প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট অবক্ষেপণীয়তা (Refrangibilty) আছে অর্থাৎ সকল বর্ণ ভূমির দিকে

• সকল দীপ্তমান্ বস্তু হইতেই আলোক সরল রেখায় বিকীরিত হয়। প্রত্যেক রেখাকে রশ্মি বা কিরণ ও কতক গুলি রশ্মির সমবায়কে এক তুলিকা বলাযায়। এই নাম-করণ কেবল সাদৃশ্য হইতে। নতুবা আর কোন কারণ নাই।

সমভাবে অবক্ষিপ্ত হয় না। বায়লেট্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকও লোহিত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অবক্ষেপণীয়। চিত্রেও দেখ বায়লেট্ ভূমির দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবক্ষিপ্ত সুতরাং সর্ব্বোপরি; এবং লোহিত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অবক্ষিপ্ত—সুতরাং সর্ব্ব নিম্নে। অন্যান্য বর্ণ আপন আপন অবক্ষেপণীয়তা অনুসারে ইহাদের মধ্যে অবস্থিত। যে কয়েকটী বর্ণ লিখিত হইয়াছে এই কয়েকটী ভিন্ন যে আর বর্ণ ইহাতে নাই তাহা নহে। বর্ণ অসংখ্য, কিন্তু লিখিত বর্ণ হইতে সে সকলের প্রভেদ এত অল্প যে আমাদের চক্ষুতে অনুমিত হয় না। অপরন্তু ইহাও দেখা যায় যে বর্ণ সকল নিরবচ্ছিন্ন নয়। তাহাদের মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে কোন বর্ণই নাই। এবং বর্ণের অসদ্ভাবে সেই সকল স্থান কাল দেখায়। এবং তজ্জন্য বর্ণের মধ্যে মধ্যে কাল রেখা দেখা যায় (২য় চিত্র দেখ)।

আলোক-বিশ্লে-ষণ যন্ত্রে সৌর আলোক-চিত্র যেরূপ দেখায় ২য় চিত্রে তাহা দেখান গেল। ইহা ১ম চিত্রের বা হইতে লো ভাগ ভিন্ন আর কিছুই না। কেবল বৃহদায়তি প্রাপ্ত। সুতরাং ১ম চিত্রের সঙ্গেই ইহার বিষয় সমস্ত বলা হইয়াছে। ইহাতে ক খ গ ঘ প্রভৃতি কাল রেখা গুলি অতি বিষদ। এবং ইহাদের অবস্থানও সহজে নির্ণেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঐ সকল স্থানে বর্ণের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ঐ কাল রেখা গুলির উৎপত্তি। ১ম চিত্রে ঐ রেখা গুলি দেখান সম্ভব নয় বলিয়া দেওয়া যায় নাই। আমরা ক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূতদিগের যে ভাষার কথা বলিয়াছি এই রেখা গুলি সেই ভাষার বর্ণমালা।



পাঠক! এক্ষণে আলোক-চিত্রের (Spectrum) ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছ। এখন ইহার অন্য অন্য বিষয় বলা যাউক। আলোক-চিত্র তিন প্রকার। ১ম, নিরবচ্ছিন্ন(Continuous)—কেবল প্রজ্বলিত ঘন বা তরল পদার্থের আলোক হইতে উদ্ভূত। ২য়, অবচ্ছিন্ন বা রৈখিক (Discontinuous or line spectrum)—কেবল প্রজ্বলিত বাষ্প-প্রদত্ত। ৩য়, শোষণ—(Absorptin) সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির আলোক-প্রদত্ত।

তড়িতাগ্নিতে প্রজ্বলিত অঙ্গারের আলোক হইতে এমন আলোক-চিত্র পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে বায়লেট হইতে লোহিত পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বর্ণের ক্রম থাকে, কোন স্থলেই বর্ণের অভাব থাকে না। ইহাই নিরবচ্ছিন্ন আলোক চিত্রের উদাহরণ। বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্বলিত অবস্থায় এক স্বতন্ত্র

প্রকারের আলোক-চিত্র প্রদান করে। ইহাতে কতক গুলি রঞ্জিল রেখা বা রেখা সমষ্ঠি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যায়। অর্থাৎ সৌর আলোক-চিত্রে (২য় চিত্র দেখ) যেমন বর্ণ-বিশিষ্ট জমির উপর কাল রেখা আছে ইহাতে সেই রূপ কাল জমির উপর বর্ণ-বিশিষ্ট রেখা সকল থাকে। ইহাকে অবচ্ছিন্ন বা রৈখিক আলোক-চিত্র বলে। তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ শোষণ আলোক চিত্রের উদাহরণ ২য় চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র সহজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র সহজেই পাওয়া যায়। কোন বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্বলিত করিলেই তাহা হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। যদি কোন ধাতু এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে তাহা বাষ্পীভূত হইতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে দ্বিতীয় প্রকারের অতি সুন্দর আলোক-চিত্র উৎপন্ন হয়। ইহাতে রেখা গুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বিষদ হয়। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেক বাষ্পেরই রেখা-প্রণালী স্বতন্ত্র। কোন দুইটীরই একরূপ নয়। থেলিয়ম ও রৌপ্য উভয় হইতেই সম্পূর্ণ একরূপ হরিত আলোক উৎপন্ন হয়। একের আলোক দেখিলে অপরের আলোক বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু যন্ত্র দ্বারা উভয়ের আলোক-চিত্র দেখিলেই সে ভ্রম অপনীত হয়। প্রথমটীর আলোক-চিত্রে একটী ও দ্বিতীয়টীতে দুইটী হরিত রেখা বা দণ্ড দেখা যায়। এই রেখা গুলির অবস্থান সৌর আলোক-চিত্রের ক খ গ (২য় চিত্র দেখ) ইত্যাদি রেখার অবস্থানেরসহিত তুলনায় নির্ণীত হয়। থেলিয়ম বাষ্প-প্রদত্ত হরিত রেখাটী চ রেখার স্থান অধিকার করে। সোডিয়ম-বাষ্প ঘ রেখার স্থানে একটী পীত রেখা প্রদান করে। এইরূপে অবস্থান ভেদেও সংখ্যাভেদে সকল বাষ্পেরই রেখা প্রণালী স্বতন্ত্র। আবার যদি দুই কি ততোধিক ধাতু একত্র মিশ্রিত থাকে সেই মিশ্র ধাতুর আলোকচিত্রে তাহার উপাদানীভূত সকল ধাতুগুলিরই রেখা-প্রণালী দৃষ্ট হইবে। একবস্তুর রেখা প্রণালীর অবস্থান ও প্রকৃতির কখন ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং একজন বিচক্ষণ দর্শক আলোক চিত্রের রেখা গুলি দেখিয়া—অনুমানে নয় সাক্ষাৎ প্রমাণে—উহা কোন্ বাষ্প বা ধাতু হইতে উদ্ভূত তাহা বলিয়া দিতে পারেন। সেই বাষ্প বা ধাতু যেন আলোক-চিত্র হইতে তাঁহার চক্ষুকে ডাকিয়া বলে "এই দেখ আমি এখানে রহিয়াছি।" দ্বিতীয় প্রকার আলোক-চিত্রের এই ক্ষমতা পার্থিব রসায়ানের অনেক উপকার করিয়াছে। ইহা হইতে অনেক নূতন ধাতুর সত্বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং এতদ্ভিন্ন কোন অজ্ঞাত পদার্থের রাসায়নিক উপাদান নিরাকারণে কখন কখন ইহাই একমাত্র সহায়। অজ্ঞাত পদার্থ যখন এত অল্প পরিমাণ হয় যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভবে

না তখন ইহার সাহায্য ভিন্ন উপায় নাই।

সৌর বা নাক্ষত্রিক রসায়ানের উন্নতি অথবা উৎপত্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার আলোক-চিত্রের সংযোজনে। যদি সৌর আলোক-চিত্রে পার্থিব ধাতুসকলের রেখা-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলা যাইতে পারিত যে সেই ধাতু সকল সূর্য্যের উপাদান। কিন্তু আমরা তাহা দেখিনা। আমরা সৌর আলোক-চিত্রে উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে কাল রেখা দেখিয়া থাকি। এই কাল রেখা গুলি প্রথম উলাষ্টন (Wolaston) দেখিতে পান। কিন্তু পরে ফ্রনহফার (Fraunhofer) তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া এই রেখাগুলি তাঁহারই নামে অর্থাৎ ফ্রনহফারের রেখা বলিয়া আখ্যাত। এই কাল রেখা গুলির কারণ নির্ণয়ে অনেক প্রতিভা শালী ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইয়াছিল। ফলতঃ ধাতু সকল যে উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কাল রেখা গুলির সম্বন্ধ বহু দিন অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে কার্কফের(Kirchhoff) সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে এই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। তিনি চূর্ণালোকের (Lime-light) এক চিত্র Spectrum প্রস্তুত করিয়া যখন দেখিলেন যে ঘ চিহ্নিত স্থানে কাল রেখার লেশও নাই তখন সেই আলোক যে পথ দিয়া আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের ছিদ্রে প্রবেশ করিতেছে সেই পথে সোডিয়ম-সম্ভূত আলোক স্থাপন করিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ কাল ঘ রেখার আবির্ভাব হইল। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সোডিয়মই আলোক-চিত্রে উজ্জ্বল ঘ রেখা প্রদান করে। কার্কফ শুদ্ধ সোডিয়মের পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অন্যান্য বস্তুর ও এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে যে আলোক নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র প্রদান করে সেই আলোক কোন বাষ্প বা ধাতব বাষ্পের মধ্য দিয়া গমন করে তখন তাহার আলোক-চিত্রে এই বাষ্প নিজে যে কয়টী উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে ঠিক সেই কয়টী কাল রেখা থাকে। অর্থাৎ সোডিয়ম যদি ঘ উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে আর যদি সোডিয়ম ব্যবধান রাখা যায় অঙ্গারের নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্রে সেই ঘ রেখা কাল হইবে। ইহার কারণ কি ? কারকফ এই কারণ স্থির করিয়া নক্ষত্র সূর্য্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমাদের করায়ত্ত করিয়াছেন।

শব্দ ও আলোকের সাদৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বুঝিতে হইলে শব্দ ও আলোকের সাদৃশ্য ভাব অতি বিষদরূপে মনে অঙ্কিত করা আবশ্যক। মনে কর গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া আছ, অদূরে এক বাষ্পীয় পোত যাইতেছে, বাষ্পীয় পোত হইতে ক্রমে তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া তোমার দিকে আসিতেছে। তরঙ্গের অর্থ আর কিছুই না—বল-সঞ্চালন। বাষ্পীয় পোতের চাকার বেগ এক স্থানে প্রহিত হইয়া চতুর্দ্দিকে

সঞ্চালিত হইল। যখন তোমার নিকট সেই তরঙ্গ উপস্থিত হইল তখন তুমি তরঙ্গের অভিঘাত অনুভব করিতে লাগিলে। এবং ইহাও অনুভব করিলে যে ঐ আঘাত সবিরাম (intermittent)। থাকিয়া থাকিয়া তোমার শরীরে আঘাত লাগিতেছে। জলের এই রূপ তরঙ্গের ন্যায় বায়ুসাগরেও তরঙ্গ বিস্তৃত হয়। জল-তরঙ্গ সমস্ত শরীর অনুভব করিতে পারে অর্থাৎ পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যেখানেই তরঙ্গের আঘাত লাগুক অনুভূত হইবে। বায়ু-তরঙ্গ শরীরের এক মাত্র স্থান অনুভব করিতে পারে সে স্থান কর্ণ-পটহ। মনে কর সেতারের একটী তার ধ্বনিত হইয়াছে। তার একবার অগ্রে যাইতেছে, আবার পশ্চাতে আসিতেছে। তারের অগ্র পশ্চাৎ গমনে বায়ুতে তরঙ্গ উঠিল। বায়ু তারের কম্পন গ্রহণ করিল অর্থাৎ বায়ু ও তারের সঙ্গে সঙ্গে একবার অগ্রে যাইতে লাগিল আবার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। সেই বায়ু-তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া ক্রমে কর্ণ-পটহে আসিল কর্ণপটহ থাকিয়া থাকিয়া অভিহত হইতে লাগিল। সেই অভিঘাত শ্রুতিশিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইল এবং শব্দ-শ্রবণের সংজ্ঞা হইল। আবার সে তারটী ছাড়িয়া তদপেক্ষা ছোট একটী তার ধ্বনিত হউক, ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায় তরঙ্গ উঠিবে ও বিস্তৃত হইবে এবং কর্ণ পটহ ও থাকিয়া থাকিয়া অভিহত হইবে। কিন্তু এ তারের স্বর ত পূর্ব্ব তারের স্বরের মত নয়। এ যেন আর একস্বর। একই রূপে একই বস্তুতে উভয়ের উৎপত্তি, তবে উভয়ের প্রভেদ কিসে?—একটী বিষয়ে। ছোট তারের কম্পন বড় অপেক্ষা দ্রুত সুতরাং তরঙ্গের গতি ও দ্রুততর সুতরাং এক সময়ে বড় অপেক্ষা ছোট তার হইতে কর্ণ-পটহে অধিক তরঙ্গের, আঘাত লাগে। এবং এই অধিক তরঙ্গাঘাত হইতেই স্বর-বৈষম্য। প্রত্যেক স্বরের নির্দ্দিষ্ট আঘাত আছে অর্থাৎ কর্ণ-পটহ এক সেকেণ্ডে সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বার অভিহত হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট স্বরের অনুভূতি হয়। সুতরাং মূল হইতে ধরিলে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কম্পন এক নির্দ্দিষ্ট স্বর উৎপাদন করে।

ইথর নামে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অতোলনীয় সূক্ষ্মতম পদার্থ সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া আছে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে সকল বস্তুর ভিতরে ভিতরে অণু সকলের মধ্যে মধ্যে ইহার স্থিতি। ফলতঃ জগতের সমস্ত বস্তু সমস্ত পরমাণু ইথর-সমুদ্রে মগ্ন। যেমন কোন কম্পন শীল (Vibrating body) বস্তু হইতে বায়ুতে তরঙ্গ উঠে সেইরূপ কোন উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত বস্তু হইতে এই ইথর সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে। বায়ু তরঙ্গের আঘাত যেমন শুদ্ধ কর্ণ পটহে অনুভূত হয়। এই ইথর তরঙ্গের আঘাত কেবল চক্ষু-আমায় (Retina) অনুভব করিতে পারে। বস্তু উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত হইলে তাহার অণুসকল কম্পিত হইতে থাকে এই অণুসঙ্ক-

ল কম্পিত হইতে থাকে। এই অণু সকলের কম্পনে ইথর-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে অর্থাৎ ইথরের অণু সকল ঐ কম্পন গ্রহণ করে, ক্রমে তরঙ্গ বিস্তৃত হয় এবং বিস্তৃত হইয়া যখন চক্ষুর নিকট আসে তখন ঐ তরঙ্গের সবিরাম (intermittent) আঘাত উহাতে লাগে অর্থাৎ চক্ষু-আনায় থাকিয়া থাকিয়া ইথর তরঙ্গ কর্ত্তৃক অভিহত হয়। শব্দের পক্ষে স্বর ও আলোকের পক্ষে বর্ণ একই রূপ। কর্ণপটহ এক সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বার অভিহত হইলে যেমন নির্দ্দিষ্ট স্বরের অনুভূতি হয়, চক্ষু-আনায় সেইরূপ এক সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বার ইথর তরঙ্গের অভিঘাত প্রাপ্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি হয়। বায়লেট্ বর্ণে এই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও লোহিতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এবং অন্যান্য বর্ণ ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যক আঘাতের ফল। সুতরাং মূল হইতে ধরিলে বলিতে হইবে স্বরের ন্যায় বর্ণ সকল বস্তুগত অণু সকলের কম্পন-পরিমাণের বৈষম্যে উৎপাদিত হয়।

সোডিয়মের আলোক পীতবর্ণ দেখায়। তাহার কারণ এই, সোডিয়মের অণু সকল এরূপ কম্পন-শীল যে সেরূপ কম্পন ইথরের দ্বারা চালিত হইয়া চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু এক সেকেণ্ডে যে সংখ্যক বার অভিহত হয় সে সংখ্যা পীত বর্ণের অনুভাবক। আবার আলোক-চিত্রে (Spectrum) দেখিয়াছ, পীত বর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মধ্য স্থান নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানের পীতবর্ণই কি একরূপ কম্পন হইতে উদ্ভূত হয়? তাহা নহে। প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিশেষ কম্পন আছে। এবং সোডিয়ম-অণুসকলের কম্পন কেবল উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী য রেখাস্থ পীতবর্ণ উৎপাদন করিতে পারে। কম্পনের ন্যূনাধিক্য অনুসারেই বর্ণের অবক্ষেপণীয়তা (Refrangibility) হয়। আবার সকল ধাতুই কিছু সোডিয়মের ন্যায় একটী উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে না। কোনটীতে, দুইটী কোনটীতে তিনটী, কোনটীতে বা ততোধিক রেখা প্রদত্ত হয়। এরূপ স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুর এক স্থানের অণু সকল এক ভাবে কম্পিত ও অপর স্থানের অণু সকল অপর ভাবে কম্পিত হয়। এবং এই বিভিন্ন কম্পন হইতে বিভিন্ন রেখার স্থানীয় বর্ণ উৎপন্ন হয়।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিতে পারিলে আলোক চিত্রে বিভিন্ন বাষ্পের বিভিন্ন রেখা প্রণালী কেন। এক্ষণে সৌর আলোক চিত্রের কাল রেখা গুলি কেন হয় তাহাই বলা যাউক। কোন গৃহে একটী তার অপর একটী সম-স্বর-বদ্ধ তার হইতে যথেষ্ট দূরে আছে; একটী তার ধ্বনিত হউক, ক্ষণ পরে অপরটী ধ্বনিত হইবে। ইহার কারণ এই যে একটী তারের কম্পন বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া অপরটীতে ক্রমাগত লাগিতে

লাগিতে সম কম্পন শীলতা গুণে অপ রটীও ঠিক্ সেইরূপে কম্পিত হয়। ঠিক্ এই কারণে যখন কোন সর্ব্ব বর্ণ-বিশিষ্ট আলোক কোন বাষ্পের ভিতর দিয়া যায় তখন ঐ বাষ্প নিজে যে বর্ণের আলোক প্রদান করিতে পারে ঐ সর্ব্ব বর্ণ বিশিষ্ট আলোক হইতে সেই বর্ণ শোষণ করে অর্থাৎ ঐ বাষ্পের অণু সকল যেরূপ ভাবে কম্পিত হইতে সক্ষম, তাহারা ইথর হইতে সেই কম্পন গ্রহণ করে। ইথরের সেই কম্পন ঐ বাষ্পের অণু সকলকে কম্পিত করিতেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ঐ বাষ্পের ভিতর দিয়া বহির্গত আলোকে ইথরের সেই কম্পনের অভাব হয় এবং তজ্জন্য সেই কম্পেনোদ্ভূত বর্ণের ও অভাব হয়। যদি বল এই কারণে সর্ব্ব-বর্ণ বিশিষ্ট আলোকে যে বর্ণের অভাব হয় কম্পন-শালী বাষ্প হইতে আলোক উদ্ভূত হইয়া সেই বর্ণের অভাব পূরণ করে না কেন? তাহার কারণ অতি সহজ। যে কারণে অতি তেজোবিশিষ্ট আলোকের নিকট হীন-তেজ আলোক নিষ্প্রভ হয়, যে কারণে দিবসে প্রদীপের আলোক অনুভূত হয় না, ইহাও সেই কারণে হইয়া থাকে। চূর্ণালোক সোডিয়ম-বাষ্পের ভিতর দিয়া গেলে আলোক-চিত্রে সোডিয়ম-বাষ্প যে উজ্জ্বল ঘ্ রেখা প্রদান করে, সেই ঘ্ রেখা কাল দেখায়। অর্থাৎ সোডিয়ম-বাষ্প ঘ্ স্থানীয় বর্ণের উৎপাদক ইথরের কম্পন শোষণ করে। সেই শোষণে যে সোডিয়ম-বাষ্পের অণু-সকল কম্পিত হইতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তুমি বলিতে পার অণু সকলের কম্পনে সোডিয়ম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয়, সে আলোকের ঘ্ রেখা উজ্জ্বল করা যুক্তি-সঙ্গত এবং বাস্তবিকও করিয়া থাকে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবাতে সোডিয়ম আলোকের যে হ্রাস হয়, চতুঃপার্শ্বস্থ চূর্ণালোকের ঔজ্জ্বল্যে সে হ্রাস-প্রাপ্ত আলোক অনুভূত হয় না, এবং সেই জন্য ঘ্ রেখা সোডিয়ম-আলোকে যে ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, পার্শ্বস্থ বর্ণ সকলের ঔজ্জ্বল্যে তাহা অনুভূত হয় না।

সে যাহাহউক এক্ষণে এই সকল যুক্তি হইতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সূর্য্য বাষ্পাবৃত কোন প্রজ্বলিত ঘন বা তরল (সম্ভবতঃ তরলই) পদার্থ। উক্ত ঘন বা তরল পদার্থ হইতে বিকীরিত আলোক বাষ্পাবরণের ভিতর দিয়া আসাতে সূর্য্য কিরণে নিরবচ্ছিন্ন আলোক চিত্র উৎপন্ন না হইয়া ঐ বাষ্পের কিরণ-শোষণে শোষণ-আলোক চিত্র দেখিয়া থাকি। এই শোষণ আলোক-চিত্রের কাল রেখা গুলি দেখিয়া আমরা সূর্য্যের বাষ্প-গোলকে (Atmosphere) আমাদের পৃথিবীর কোন্ কোন্ ধাতু বা কোন্ কোন্ বাষ্প আছে তাহা জানিতে পারি। এই কাল রেখা-গুলির সহিত ধাতুর বা যে বাষ্পের উজ্জ্বল রেখা প্রণালীর অবস্থান ও সংখ্যা মিলিবে, সেই বাষ্প বা সেই ধাতু সূর্য্যের বাষ্প-

গোলকে আছে। সূর্য্যের আলোক-চিত্রে ঘ রেখা আছে কিন্তু সোডিয়ম উজ্জ্বল ঘ রেখা প্রদান করে, সুতরাং সূর্য্যকিরণ সোডিয়ম-বাষ্পের ভিতর দিয়া না আসিলে কাল ঘ রেখা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সূর্য্য-কিরণ যে সোডিয়মের ভিতর দিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সোডিয়ম-বাষ্প কিছু ভূবায়ুতে নাই, কারণ আমরা ভূবায়ুর উপাদান সকল জানি। সুতরাং নিশ্চয়ই এই সোডিয়ম সূর্য্যের বাষ্প-গোলকে আছে। এইরূপে সূর্য্যে অধিকাংশ পার্থিব ধাতুরই সত্বার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা পৃথিবী যে সূর্য্যের বিচ্যুত অংশ এই অনুমান অত্যন্ত দৃঢ় হইতেছে।

পাঠক! স্বর্গীয় দূতদিগের যে ভাষার কথা বলিয়াছিলাম তাহা জানিলে। আলোক চিত্রের ক খ গ ঘ রেখা-গুলি সেই ভাষার বর্ণমালা তাহাও জানিয়াছ। দূতেরা এই বর্ণমালায় লিখিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহাও দেখান হই-য়াছে। সৌর আলোক-চিত্রে লিখিত সৌর দূতের অনেক গল্প আমরা শুনিয়াছি এবং এখনও কত গল্প শুনিব। সে দূত সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহাও বলিয়াছি। নক্ষত্রগণের দূতেরা উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও একই কথা বলিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের প্রকৃতি একই অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত তরল পদার্থ ইহাদের শরীর এবং বাষ্প-গোলক ইহাদের আবরণ।

নভোমণ্ডলের যে দৃশ্যকে কবির কল্পনা মন্দাকিনী অথবা স্বর্গগঙ্গা আখ্যা দিয়া-ছিল এবং ইংরাজীতে যাহাকে (Milky way) "দুগ্ধ পথ" বলে, এক্ষণে সে স্বর্গ-গঙ্গায় আর দেবতারা অবগাহন করেন না; উহা বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলের সমষ্টি বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কারণ সূর্য্য নক্ষত্রাদির ন্যায় উহা শোষণ-আ-লোক-চিত্র (Absorption spectra) প্রদান করে।

ধূমকেতু প্রভৃতি কতকগুলি দৃশ্য দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন আলোক চিত্র (discontinuous spectra) প্রদান করে। এবং আমরা জানি যে বাষ্পীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুতেই এরূপ আলোক-চিত্র প্রদান করে না। সুতরাং ধূমকেতু সকল নিশ্চয়ই বাষ্পীয় পদার্থ। ধূমকেতু নাম হইতে অনুমান হয় যে প্রাচীন আর্য্যেরা এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন নতুবা এ নাম-করণ কেন?

আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা নক্ষত্র ইত্যাদি নভশ্চারীদিগের প্রকৃতির বিষয় ব্যতীত আরও একটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। যেমন সোজা রাস্তায় অধিক দূরের লোক আসিতেছে কি যাইতেছে অনুমান করা সহজ নয়, সেইরূপ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশে নিজস্থানে থাকিয়া যদি আমা-দিগের নিকট আইসে বা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে যায় তাহা হইলে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। একটী ধূমকেতু উঠিল, আকাশে তাহার অবস্থান দেখিয়া আমরা বলিলাম পশ্চিম হইতে

পূর্ব্বে গেল কি উত্তর হইতে দক্ষিণে গেল; কিম্বা ঐ ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট আসিতে লাগিল কি পৃথিবী হইতে দূরে গেল তাহা জানিতে পারি না। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দীপ্তি-শালী বস্তু হইতে ইথর-তরঙ্গ বিস্থৃত হইয়া চক্ষুতে লাগে। যেমন কোন নৌকা একস্থানে নঙ্গর করিয়া থাকিলে এক সময়ে যত তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হইত, তরঙ্গের প্রতিকূলে গমন করিলে, সেই সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ কোন দীপ্তিমান্ বস্তু নিকটে আসিতে থাকিলে তাহা হইতে ক্রমশঃই অধিক-সংখ্যক ইথর-তরঙ্গের অভিঘাত চক্ষুতে লাগিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তরঙ্গের অভিঘাত-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত বর্ণের বৈষম্য হয়। অর্থাৎ অভিঘাত অধিক হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবক্ষেপণীয় (Refrangible) বর্ণের অনুভূতি হয়। সুতরাং সূর্য্য যদি পৃথিবীর নিকট আইসে, সৌর আলোক-চিত্রের য় রেখা আরও অবক্ষিপ্ত (Reflected) হইবে অর্থাৎ আরও বায়লেট্ বর্ণের দিকে যাইবে। দীপ্তিমান্ বস্তু দূরে গেলে ঠিক্ ইহার বিপরীত ক্রিয়া হয়। এই রূপে একটী মহৎ অভাবের পূরণ হইয়াছে। আমরা আর একটী বিষয় বলিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

আমরা চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডল বিশদ-রূপে দেখিতে পাই না। যদি সূর্য্য-মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্ব সূর্য্যের চাক্‌চিক্যে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে সূর্য্যের ধাষ্প-গোলকে আমরা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যেমন উচ্চ শব্দ লঘু শব্দকে বিলুপ্ত করে, যেমন অতি তেজো-বিশিষ্ট আলোক লঘুতেজকে নিষ্প্রভ করে, সেইরূপ সূর্য্যের চাক্‌-চিক্যে সেই সকল দৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সূর্য্য-গ্রহণের সময় সর্ব্বগ্রাস হইলে যখন এই চাক্‌চিক্য তিরোহিত হয়,তখন সূর্য্য-মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে লোহিত উদগ্র পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় দৃশ্য দেখা যায়। কখন কখন ইহারা সূর্য্যমণ্ডলের সীমা হইতে সহস্র মাইল দূর পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়। ১৮৪২খৃঃ অব্দে এই দৃশ্যে বৈজ্ঞানিকদিগের চিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। এবং তাঁহারা ইহা দেখিয়া সায়াহ্ন সূর্য্য কৃত-লোহিত তুষার-মণ্ডিত আল্পস্ পর্ব্বতের শিখর সকলের সহিত ইহার তুলনা করেন। ইহার যথার্থ প্রকৃতি নির্ণীত হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। কারণ গ্রহণের সময় ভিন্ন ইহা দেখা যাইত না। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্ট যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেই সময় জ্যানসেন (Jansen) ভারতবর্ষে থাকিয়া ইহার পরীক্ষা করেন। তিনি ইহার আলোক-চিত্রে উদজানের ন্যায় উজ্জ্বল রেখা দেখিলেন। ঠিক্ এই সময় লকইয়ারও পরীক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইরূপে ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় দৃশ্য সকল প্রজ্জলিত

উদজান বাষ্প বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু এ সকল পর্য্যবেক্ষণের জন্য কবে গ্রহণ হইবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা এবং গ্রহণের ক্ষণ-স্থিতির মধ্যে ঈপ্সিতানুযায়ী পরীক্ষা সম্পন্ন করা—এ সকল অতি অসুবিধার বিষয়। এবং যত দিন এই অসুবিধা নিবারিত হয় নাই, তত দিন এ সম্বন্ধে অধিক উন্নতি হয় নাই। এক্ষণে সৌর বাষ্পগোলকের (Solar atmosphere) দৃশ্য সকল যখন তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সূর্য্যের চাক্চিক্যে আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাই না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়, যে যদি কোন উপায়ে সূর্য্য কিরণে ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস করিতে পারা যায়, অথচ সৌর বাষ্প গোলকের আলোক যেমন তেমনই থাকে তাহা হইলে আমরা সেই সকল দেখিতে পাই। এবং ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে একখানির পরিবর্ত্তে অধিক সংখ্যক বেলওয়ারি কাচ ব্যবহার করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্রে সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ প্রজ্জ্বলিত বাষ্প-গোলক হইতেও কিরণ প্রবেশ করে। সূর্য্য কিরণ একখানি বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া গেলে যত বিকীর্ণ হইবে, দুই খানির ভিতর দিয়া গেলে তাহার দ্বিগুণ বিকীর্ণ হইবে অর্থাৎ এক তুলিকা কিরণ একখানি কাচের ভিতর দিয়া গিয়া যে পরিমাণ স্থান আলোকিত করিবে দুইখানির ভিতর দিয়া গিয়া তাহার দ্বিগুণ স্থান আলোকিত করিবে। এবং আলোক যত অধিক স্থান ব্যাপিয়া পড়ে ততই তাহার হ্রাস হয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে সূর্য্য কিরণের ঔজ্জ্বল্যের যথেচ্ছ হ্রাস করা যায়। কিন্তু বাষ্প-গোলকের কিরণ যত কাচের ভিতর দিয়াই যাউক একইরূপ থাকিবে। সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ হয়, তাহার কারণ ইহার বর্ণ সকল বিশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু সৌর-বাষ্পগোলকস্থ বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে যে বিশেষ বিশেষ বর্ণের কিরণ বিকীরিত হয় তাহা এরূপে বিশ্লিষ্ট হয় না। কারণ একবর্ণের কিরণ যত বেল-ওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া যাউক না কেন উহা বিকীর্ণ (dispersed) হইবে না, কেবল উহার গতির দিকের পরিবর্ত্ত হইবে। বর্ণের সংশ্লেষ ভিন্ন বিশ্লেষ অসম্ভব; সুতরাং একবর্ণের কিরণ আর কি বিশ্লিষ্ট হইবে?

এইরূপে সূর্য্য কিরণের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস করিয়া সৌর বাষ্প গোলকের দৃশ্য সকল আমরা সকল সময় দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যে পর্ব্বতশৃঙ্গাকার উদগ্রভাগ সকলের (Solar protuberances) কথা বলা হইয়াছে সে সকল এক্ষণে উক্ত বাষ্প-গোলকে বাত্যাদির ফল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ কিছু দিন চলিলে সৌর গগণের পরিবর্ত্তন

সকল (Solar meteorology) শীঘ্রই আমাদের করায়ত্ত হইবে—স্বর্গীয় গ্রহ-মণ্ডলীর প্রকৃতি আর আমাদের অবিদিত থাকিবে না; এবং কালে এই সকল প্রকৃতি জ্ঞান হইতে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীগণের প্রকৃতিও জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এবং কে ভাবিয়াছিল যে বিশ্বরাজ্যের কণাবৎ অংশ পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য হইতে এই সকল সাধিত হইবে?

শ্রীম—

জাতীয় চরিত্র।*

স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ!

আমার অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "জাতীয় চরিত্র"। জাতীয় চরিত্র, অতি অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি বাহ্যিক সভ্যতা ও উন্নতির উপকরণ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সংশয় কি, কিন্তু জাতীয় চরিত্র অনেক গুণে অধিকতর মূল্যবান্ পদার্থ। জাতীয় চরিত্র অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার উন্নতির ভিত্তি মূল স্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লেকি (Leckey) সাহেব বলিয়াছেন, 'A nation's character is its most sacred possession" অর্থাৎ কোন জাতির চরিত্র তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সম্পত্তি। এ দেশের তাঁতি কুল উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, মাঞ্চেষ্টর আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, আমাদের জাতি ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, ইত্যাদি যতপ্রকার অনিষ্ট বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আমরা ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু সে সকল অনিষ্ট বরং এক দিন সহ্য করা যায়, জাতীয় চরিত্রের প্রতি আক্রমণ আমরা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারি না। সহ্য হয় না বা কি করিয়া বলি? এ কাল পর্য্যন্ত ইংরেজেরা আমাদিগের প্রতি যে প্রকার অন্যায় গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ত আমরা অনায়াসে সহ্য করিতেছি। আমরা এতদূর দুর্ব্বল, নির্জ্জীব ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছি, যে আমাদের এখন সকলই সহ্য হয়।

অতি অল্প দিন হইল বেথুন সভায় যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে ইংরেজ চরিত্রের কএকটি অভাব বা দোষের কথা বলিতে-

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিগত হিন্দুমেলায় অভিব্যক্ত।

ছিলেন; সভাপতি ফিয়ার সাহেবের তাহা অসহ্য হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করাতে কালীচরণ বাবু তাঁহার বক্তৃতার শেষ অংশ ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না। এই প্রকার ব্যবহারে ফিয়ার সাহেব কলিকাতার সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিক ফিয়ার সাহেব যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল, কালীচরণ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে বলিতে পারিতেন। কিন্তু ফিয়ার সাহেবের ব্যবহারে কি প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই? কেবল প্রশংসার কেন? আমাদের শিক্ষার বিষয়ও কি কিছুই নাই? যে স্বজাতি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ফিয়ার সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রশংসনীয় নহে? তাঁহার দৃষ্টান্তে কি আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না, যে তিনি যেমন আপনার জাতির নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইরূপ আমাদের জাতির কেহ অন্যায় নিন্দা করিলে আমরা কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিব না।

লর্ড মেকলে হইতে চুনো গলির আণ্ডু পিণ্ডু পর্য্যন্ত কেহই আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। হ্যাট্ কোট্ পরা প্রত্যেক চাটগেঁয়ে তেঁতুলে বাগ্দি পর্য্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে দু কথা বলিতে পারিলে ছাড়েন না। মেকলে আমাদের কি না বলিয়াছেন?

"What the horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the sting is to the bee, what beauty, according to the old Greek song, is to woman, deceit is to the Bengali. Large promises, smooth execuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive, of the people of the lower Ganges."

ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের জন্য ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ বলিতে যদিও আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে, তথাচ বাধ্য হইয়া উহার মর্ম্ম বলিতে হইতেছে:—শৃঙ্গ, যেমন মহিষের হুল যেমন মধুমক্ষিকার, এবং প্রাচীন গ্রীক্ কবিতানুসারে সৌন্দর্য্য যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক, প্রবঞ্চনা সেইরূপ বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। ছল, মিথ্যা সাক্ষ্য, ও জাল বঙ্গবাসীগণের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র স্বরূপ।

মহাশয়গণ! এ কথায় কি আপনাদের উষ্ণ শোণিত প্রত্যেক ধমনীতে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় না? যদি তাহা না হয়, যদি বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক এ প্রকার অপমান প্রাপ্ত হইয়াও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, যদি মন হইতে অপমান বোধ একেবারে চলিয়া গিয়া থাকে, তবে বলি হে দক্ষিণ মহাসাগর! তুমি তরঙ্গের উপর

তরঙ্গ আঘাত করিয়া এই হতভাগ্য দেশকে আপনার উদরসাৎ করিয়া লও।

ইংরেজ জাতির স্বভাবই এই যে তাঁহারা নিপীড়িত জাতির অন্যায় নিন্দা করিতে বড় ভাল বাসেন। তাঁহারা আইরিসদিগের প্রতিও অবিকল এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেবল অন্যায় রাজনিয়ম সকল প্রচার করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইত এমন নহে, তাহাদিগকে প্রবঞ্চক, ও মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিও যার পর নাই আক্রমণ করা হইত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার অসহ্য বোধ হওয়াতে, কতক গুলি আইরিস স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসি দেশে গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি আইরিস সৈন্যদল (Brigade) প্রস্তুত করেন। ফণ্টেনোর যুদ্ধে ফরাসীদিগের পরাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; এমন সময়ে কেবল অওল সাহেবও আইরিস যোদ্ধাগণের সাহায্যে তাঁহারা জয়লাভ করেন। এই ঘটনায় ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ বলিয়াছিলেন, 'cursed be the laws that deprive me of such subjects" আইরিসেরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী ছিলেন। ইংরাজেরা বলেন যে, সাহস ও সত্যপ্রিয়তা একত্র বাস করে। এ কথা সত্য হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী আয়লণ্ডবাসীগণ অবশ্য অধিকতর সত্যপ্রিয় ছিলেন।

ইংরেজেরা কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্রের উপর আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত নহেন, প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রশংসাও তাঁহাদের সহ্য হয় না। এল্‌ফিন্‌ষ্টন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত কাওয়েল সাহেব সটীক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেকেন্দর সাহেব সমভিব্যাহারে আরিয়ান নামক জনৈক গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার প্রণীত ইণ্ডিকা নামক পুস্তকে এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতবাসীগণ, আসিয়ার অন্যান্য জাতি সকল অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। তৎপ্রণীত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে যে, কোন ভারতবাসীকে কখন মিথ্যা বলিতে দেখা যাইত না। এ কথাটি কাওয়েল সাহেবের ভাল লাগে নাই। তিনি টীকা করিয়াছেন যে, উহা অবশ্য অত্যুক্তি হইবে। অতুক্তি কেন? বোধ হয় কাওয়েল সাহেবের যুক্তি এই যে, অধুনাতন হিন্দুগণ মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ইত্যাদি। সেকেন্দার সাহেবের সময়ের হিন্দুরাও হিন্দু, সুতরাং তাহারাও অবশ্য মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি ছিল। কি চমৎকার যুক্তি! যদি স্বীকার করা যায় যে, আধুনিক হিন্দুগণ যথার্থই প্রবঞ্চনাপরায়ণ, তাহা হইলেও কি ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীন আর্য্যগণও সেই রূপ ছিলেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী

চলিয়া গেল, শতশত রাজ্য ও রাজার সমুত্থান ও বিলোপ হইল, কত প্রকার অত্যাচার ও অধীনতায় ভারতভূমি জর্জ্জরিত হইল, ইহাতে কি জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না? কি চমৎকার যুক্তি! আমাদের দেশী গৌতম ও বিলাতি হোয়েটলি ও মিলকে নিশ্চয়ই ইঁহার নিকট হার মানিতে হইবে।

কিন্তু কাওয়েল সাহেবের কথা অযুক্ত হইলেও গ্রীক্ পণ্ডিত আরিয়ানের কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার তো ভ্রম হইতে পারে? আরিয়ানের যে ভ্রম হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। চীনদেশ হইতে হিউনসাং নামক জনৈক পণ্ডিত সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীগণ অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা প্রবঞ্চনা-পরায়ণ ছিলেন না। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহারা মোকদ্দমা-প্রিয় ছিলেন না, বিষয় কর্ম্মে কোন প্রকার লেখা পড়ার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়াই তাঁহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হিউনসানের কথা বিশেষ রূপে গ্রাহ্য এই জন্য যে, তিনি এদেশে ষোড়শ বর্ষ বাস করিয়া যথোচিত অনুসন্ধান দ্বারা হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যখন বিপরীত দিক্ হইতে দুই জন পর্য্যটক, পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব অসত্ত্বেও হিন্দুচরিত্র সম্পর্কে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন সে কথায় যে সত্য আছে, ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু আরিয়ান ও হিয়ুন্সাং আমাদিগের পিতৃ পুরুষগণের চরিত্র সম্পর্কে যে প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহার উপযুক্ত কি না ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে নীতি সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ অবনতি হইয়াছে। আত্মাদরের আতিশয্য বশতঃ লোক যেমন আপনার দোষ আপনি দেখিতে পায় না, সেইরূপ স্বদেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে স্বজাতির দোষ দেখিতে পায় না। স্বদেশানুরাগ আদরণীয়, কিন্তু সত্য অধিকতর আদরণীয়! সুতরাং আমাকে ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে আমাদের অবনতি হইয়াছে। লর্ড মেকলের কথা অসত্য ও অশ্রদ্ধেয় হইলেও আমরা কখনই অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি না যে, আমাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু অবনতির কারণ কি? আমার বোধ হয় পরাধীনতাই প্রধান কারণ। অত্যাচারের পর দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে ভারত সন্তানগণ প্রপীড়িত হইল, বিদেশীয় জাতির যুদ্ধাশ্বের পদাঘাতে ভারতের বক্ষ পুনঃ পুনঃ ক্ষত বিক্ষত হইল, ইহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত না হওয়াই আশ্চর্য্য। যে জাতি শতশত বৎসর বিদেশীয় জাতির

পাদুকা মস্তকে বহন করিল, তাহাদের চরিত্রে পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হওয়াই আশ্চর্য্য। আজও যে আমরা পৃথিবী-তলে অবস্থিতি করিতেছি, অদ্যাবধি যে সংসার হইতে হিন্দু নাম বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

কিন্তু যাঁহারা আমাদের নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি স্বর্গের দেবতা হইতেন, তাহা হইলে আমরা অবনত মস্তকে উহা সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহারা তাহা নহেন। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি আমার দোষের জন্য আমাকে তিরস্কার করিলে তাঁহার কথায় অত্যুক্তি থাকিলেও আমার উচিত যে, উহা অতি বিনীতভাবে গ্রহণ করা। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যেরূপ জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। ইংরেজেরা স্বর্গের দেবতা হইলে আমরা তাঁহাদের অন্যায় তিরস্কার সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহারা যে তত উচ্চ-প্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আমি "কালাবাঙ্গালী হিদেন"। সুসভ্য ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। সুতরাং আমি নিজে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ইংরেজ জাতির মধ্যে যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত তাঁহারা স্বজাতির ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। হালাম সাহেব তৎপ্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস নামক পুস্তকে বলেন যে, মধ্যকালে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সত্যানুরাগের এতদূর অভাব ছিল যে, বিচারকগণ উভয় পক্ষের সাক্ষীর উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল যে, অর্থী প্রত্যর্থীদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া যে জয় লাভ করিত, বিচারক তাহার পক্ষেই রায় দিতেন।*

হার্বর্ট স্পেন্সর একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। অনেকের মতে তিনি বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি

---

* One crime as more universal and characteristic than others, may be particularly noticed. All writers agree in the prevalence of Judicial perjury. It seems to have almost invariably escaped human punishment; and the *barriers of superstition were in* this, as in every other instance; too feeble to prevent the commission of crimes, many of the proofs by ordeal were applied to witnesses as well as to those whom they accused, and undoubtedly trial by combat was preserved in a considerable degree on account of the difficulty experienced in securing a just cause against the perjury of witnessess. **Hallam's Middle Ages P. 309 vol. III.**

তাঁহার স্বজাতির নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মদ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দোকানে দোকানদার ক্রেতাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে অতি তীব্র খাদ্য আস্বাদ করিতে দেয়, সুতরাং তৎপরে তাঁহারা অন্য কোন প্রকার পদার্থের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে অক্ষমতা হেতু প্রতারিত হন। স্পেন্সর বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য বস্ত্র সকল এরূপ প্রণালীতে তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করা হয় যে, তাঁহারা সহজেই প্রবঞ্চিত হন।*

বিখ্যাতনামা পণ্ডিত বকল কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

What is lightly taken is easily broken. And the best observers of English society,—observers too whose characters are very different, and who hold the most opposite opinions, are all agreed on this, that, the perjury habitually practiced in England, and of which Government is the immediate creator, is so general, that it has become a source of national curruption, has diminished the value of human testimony, and shaken the confidence which men naturally place in the word of their fellow creature.

মনোবিজ্ঞানের উন্নতিসাধক সুপ্রসিদ্ধ সর উইলিয়ম হামিলটন ইংরেজদিগের সত্যপ্রিয়তার বিষয় যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ করুন:—

But if the perjury of England stands preeminent in the world, the perjury of the English Universities, and of Oxford in particular, stands preeminent in England.

আপনারা অনেকেই ম্যাট্‌সিনির নাম শুনিয়া থাকিবেন। যে সকল লোকের অধ্যবসায় ও যত্নে ইতালিদেশ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, ম্যাট্‌সিনি তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইনি স্বদেশ হইতে, এমন কি সমস্ত ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া লণ্ডন নগরে কিছুকাল বাস

* Again it is usual purposely to present samples of cloths, silks, &c. in such order as to disqualify the perceptions. As when tasting different foods or wines, the palate is disabled by something strongly flavoured, *from appriciating* the more delicate flavour of another thing taken; so with the other organs of sense a tempoıary disability follows an excessive stimulation.—Essays. Scientific, political and speculative by Herbert Spencer. VOL. II. P. 111.

করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে নিওপোলিটান রাজ্য আক্রমণ করিবার বিষয়ে, তিনি সনগর নিবাসী বেণ্ডিয়ারা ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। একদিন তাঁহার বোধ হইল যে, তাঁহার পত্র সকল নিয়মিত সময়ে না আসিয়া, কিছু বিলম্বে আসিয়া পৌঁছে। তিনি এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য কতকগুলি পত্র নিজের নামে আর কতকগুলি পত্র কএকটি কল্পিত নামে শিরোনামা দিয়া আপনার ঠিকানা লিখিয়া ডাক ঘরে নিজে দিয়া আসিলেন। যে পত্র গুলিতে কল্পিত নাম ছিল, সে গুলি যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু যে গুলি তাঁহার নিজের নামে সে গুলি কিছু বিলম্বে হস্তগত হইল। তদনন্তর ম্যাট্‌সিনি আর একটি পরীক্ষা করিলেন, তিনি নিজের নামে কতক্‌গুলি পত্র লিখিয়া উহার অভ্যন্তরে কতক্‌গুলি সূক্ষ্ম কেশ ও পোস্ত রক্ষা করিয়া ডাকে দিলেন, পত্র সকল নিয়মিত সময়ের দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। দেখিলেন তাহার অভ্যন্তরে সেই কেশ ও পোস্ত নাই। এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক প্রমাণ করিবার জন্য কএক জন ভদ্র লোককে তিনি সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। তিনি এখন নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহার পত্র অবশ্য ডাকঘরে খোলা হয়; এবং তাঁহার বিলক্ষণ সন্দেহ হইল যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই এই গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন তিনি পার্লেমেণ্ট মহাসভার জনৈক সভ্যকে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। উক্ত সভ্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে এক দিবস মহসভায় প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জোসেফ ম্যাট্‌সিনির পত্র সকল খুলিয়া দেখা হইয়াছিল কি না, এবং তাহার সার মর্ম্ম নিয়াপোলিটান গবর্ণমেণ্টকে অবগত করান হইয়াছিল কি না। পত্র সকল যে খোলা হইত, মন্ত্রী তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার মর্ম্ম যে নিয়াপোলিটান গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করা হইত তাহা তিনি অস্বীকার করিলেন। পরে এই বিষয় লইয়া অতিশয় আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং উহার অনুসন্ধান জন্য কমিসন নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিসন দ্বারা পরিশেষে এই ভয়ানক কথা প্রকাশিত হইল যে, কেবল ম্যাট্‌সিনির পত্র সকল যে উন্মোচন করিয়া দেখা হইত তাহা নহে, তাহার মর্ম্ম নিয়াপালিটান গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিত রূপে জানান হইত। প্রধান মন্ত্রী মহাসভায় যে মিথ্যা বলিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিতেছি। তদ্দ্বারা আপনারা জানিতে পারিবেন যে, কেবল যে ম্যাট্‌সিনিরই পত্র সকল ডাকঘরে খোলা হইত এমন নহে, বহুকাল হইতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ এই ঘৃণিত জঘন্য কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

"We read with surprise amounting almost to incredulity, in the

report of the committee of the House of Commons, the following list of cabinet ministers, who, within the last forty years, have *stooped to the tricks (to some of them at least)* of a Fouchi adminstration—

1806—7. Earl spencer.
1807. The Right Hon. C. W. W. Wynn.
1809—12. The Right Hon. R. Ryder.
1812—21. Lord Viscount sidmouth.
1822—30. The Right Hon. Sir R. Peel.
1822—3. The Right Hon. G. Canning.
1823. Earl Bathurst.
1827. Lord Viscount Goderich.
The Right Hon. V. sturges Bourne.
1827. The Marquis of Landsowne.
1830—4. Lord Viscount Melbourne.
1833—40. Lord Palmerston.
1834. Lord Viscount Duncamon.
The Duke of Wellington.
1834—5. The Right Hon. H. Goulburn.
1835—9. Lord John Russell.
1838. Lord Glenelg.
1839—41. The Marquis of Normandy.
1841—4. The Right Hon. Sir *James Graham.*
1844. The Earl of Aberdeen"

Westminster Review, IXXXII. Sept. 1844.

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি'র গুপ্ত ডাকঘর ছিল বলিয়া তাঁহার জীবন চরিত লেখক সর ওয়াল্টর স্কট যার পর নাই তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি যদি জানিতেন যে, তাঁহার দেশীয় গবর্ণমেণ্ট ডাকের পত্র লইয়া কি প্রকার ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি কি বলিতেন বলিতে পারি না। বিগত ১৮৭৫ সালের এডিবর্গ রিভিউয়ে ব্যবস্থা সংস্কারের উন্নতি (Progress of law reform) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। উহাতে ১৮৬০ সালের ইংলণ্ডের চ্যান্সেলর লর্ড ম্যাক্লসফিল্ডের উৎকোচ গ্রহণ ও প্রবঞ্চনার বিষয় বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন।

Excessive greediness apart, Lord Macklesfield was probably no more guilty in principle than many of those who condemned him.

এতদ্দেশীয় বিচারালয়ের আমলারা অনেকে উৎকোচ গ্রহণ করে বলিয়া সাহেবেরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কটু কাটব্য বর্ষণ করিতে ত্রুটি করেন না।

আমলাগণ সামান্য অবস্থার লোক ও সামান্য বেতনভোগী হইয়া যে উৎকোচ গ্রহণ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? বিগত শতাব্দীর সিভিলিয়ান মহাপুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন ভোগী হইয়াও এ দেশে কতিপয় বৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া কেন ইণ্ডিয়ান নবাব বলিয়া আখ্যাত হইতেন তাহার কারণ অনেকেরই অবিদিত নাই।

ক্লাইবের জালের কথা আপনারা সকলেই জানেন। ইহা বলিলে অসঙ্গত হয় না যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এ দেশে জালের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই মহাপাপ বিদেশীয় জাতির আনীত বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত ক্যানিংহ্যাম সাহেব তৎপ্রণীত সিখদিগের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, উক্ত জাতির সহিত যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা লালসিং ও তেজসিংকে উৎকোচ দিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন। (১)

ক্যানিংহ্যাম সাহেব স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া সত্যের অবমাননা করেন নাই। কিন্তু তিনি সে সত্যপ্রিয়তার কি পুরস্কার পাইয়াছিলেন? গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিদূরিত করা হইয়াছিল। ক্যানিংহ্যাম সাহেব নির্দ্দোষী হইয়াও যখন এ প্রকার অন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন যে, কোন বাঙ্গালী-যুবক সামান্য অপরাধে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে বিদূরিত হইবেন, তাহাব আর আশ্চর্য্য কি (২)

---

(1) It was sufficienty certain and notorious at the time that Lall singh was in communication with captain Nickolson, the British agent at Ferozepore, but owing to the untimely death of that officer, the details of the overtures made, and expectations held out, cannot now be satisfactorily known. Cunningham's History of the Shiks.

The object, indeed, of Lall Singh and Teg singh was not to compromise with the English by destroying an isolated division, but get their own troops despersed by the converging forces of their opponents. Their desire was to be upheld as the ministers of a dependent kingdom by greateul conquerors, and they thus deprecated an attack on Ferozepore and assured the local British authorities their secret and efficient good will.

Cunningham's History of the Shiks.

(2) Compare the governor-general's letter to the secret committee of the 19th February 1846; from which however, those only who were mixed up with the

আর একটি কথা। কে সাহেবের আফগান যুদ্ধের ইতিহাস পুস্তকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ব্লু বুক (blue book) পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা মিথ্যাতে পরিপূর্ণ *

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে, "আমাদিগের জাতীয় চরিত্র যে বহুল পরিমাণে বিদেশীয় জাতি কর্তৃক আরোপিত গুরুতর দোষনিচয়বিবর্জ্জিত ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে, এখন কি গৌরব করিবার সময়? দেশের লোকের যে সকল প্রকৃত দোষ,—অভাব আছে তাহা প্রদর্শন করাই যথার্থ দেশহিতৈষিতার কার্য্য। এখন জাতীয় গৌরবের সময় নহে, পিতৃপুরুষদিগের মহত্ত্বের কথা বলিয়া এখন অহঙ্কার করা ভাল দেখায় না।" জাতীয় গৌরব অবশ্য করিব। আত্মমর্য্যাদা না জানিলে নীচ হইয়া যাইতে হয়, এ কথা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। রাজপুত্র যদি না জানেন, যে তিনি রাজপুত্র, তাহা হইলে তিনি হয়তো ইতরের সহিত আপনাকে সমান করিবেন। কিন্তু যখনই তিনি জানিবেন যে তিনি কে, তখনই তিনি আপনার মান আপনি রক্ষা করিতে শিক্ষা করিবেন। পিতৃপুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তনে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের বিষয় স্মরণ করিলে মন সহজেই বলে, আমরা এমন মহাপুরুষদিগের সন্তানপরম্পরা হইয়া আর এতাদৃশ হীন ও জঘন্য অবস্থায় থাকিতে

negotiation can extract aught indicative of the understanding with Golap S'gh which is alluded to in the text. It was for this note chiefly, if not entirely, that the author was removed from political employment by the East India Company. This was the author's own conviction, from careful enquiries made in India; and has been the result of equally careful inquiries made by me in England. P. C. Vide History of the Sikhs by Cunningham, second edition Page 370.

* The character and carear of Alexander Burnes have both been misrepresented in those collection of State Papers which are supposed to furnish the best materials for history, but which are often only one—sided compilations of garbled documents—counterfeits, which the ministerial stamp forces into curreney, defrauding the present generation and handing down to posterity a cluster of dangerous lies. Ibid.

পারি না। আত্মমর্য্যাদা অনুভব কর, তোমার পক্ষে নীচ ও ইতর হইয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে। আমাদের এত যে অধোগতি হইয়াছে, তথাচ যখন স্মরণ করি যে আমরা নবহলণ্ড নিবাসী অসভ্য জাতি নহি, আমরা ভারতবর্ষীয় পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের সন্তান পরম্পরা, যখন স্মরণ করি আমাদের বাল্মীকি ব্যাস, আমাদের ভবভূতি কালীদাস, আমাদের আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচায্য, আমাদের শাক্যমুনি ও শঙ্করাচার্য্য, তখন নিরুৎসাহ হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয়, হতাশ চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, নির্জ্জীব মন সজীব হয়;—মনে হয়, আর এই হীন অবস্থায় থাকিব না, আমরা জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম পবিত্রতায় আবার উন্নত হইব;—আবার ভারতের যশঃপাতাকা সুসভ্য জগতের সম্মুখে উড্ডীন করিব।

কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে,—অপব্যবহার আছে। এক্ষণে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক জাতীয় গৌরবে অন্ধ। তাঁহাদের কথা শুনিলে বোধ হয় তাঁহারা স্বজাতির গুণ ব্যতীত দোষ কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থার প্রশংসাবাদ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও সংস্কার যোগ্য কোন কুপ্রথা,—জাতীয় চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্ক দেখিতে পান না। যাহা কিছু জাতীয় তাহাই তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়। আর এক শ্রেণীর লোক ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহারা হিন্দুচরিত্রে,—হিন্দু সমাজে কিছুই ভাল দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকলই মন্দ,—হিন্দু সমাজের ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সকলই মন্দ। এদেশীয় লোক জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাহেব হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এই উভয় দলের মধ্যে কোন দলেরই সহিত আমার সহানুভূতি নাই। জাতীয় গৌরবে অন্ধ হইয়া জাতীয় দোষ দর্শনে বিমুখ থাকিতে ইচ্ছা করি না এবং জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাহেব হইতেও চাহি না। (১) আমাদিগকে মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান অবনতি বিস্মৃত হইব না; এবং বর্ত্তমান অবনতি দেখিয়া জাতীয় মর্য্যাদা একবারে ভুলিয়া যাইব না। একটি আর একটিকে স্মরণ করিয়া দিবে।

আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নিশ্চয়ই উন্নতির পর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিব। যতই কেন আমাদের দুর্দ্দশা হউক না, আমরা কখনই চিরপতিত থাকিব না, আমাদের কোন ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে অধীনতা, অত্যাচার, নানাবিধ অকল্যাণের স্রোত প্রবাহিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমি অদ্য এই হিন্দুমেলায়

(১) এস্থলে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যে কোন ব্যক্তি বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন তিনিই সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ভাবপরিশূন্য।

দণ্ডায়মান হইয়া নিঃসংশয়চিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি যে, ভারতবর্ষের এ দুর্গতি চিরকাল থাকিবে না, আমাদের দুঃখ দুর্দ্দিন শীঘ্র বা বিলম্বে নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে। পরাধীনতা এদেশের প্রভূত অনিষ্ট সংসাধন করিয়াছে। আমার দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সুদূর ভবিষ্যতে ভারত সন্তানগণ স্বাধীনতার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া উৎসাহ-প্রফুল্ল হৃদয়ে জয়-ভেরী নিনাদিত করিতেছেন। কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমার কথায় রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে, স্বাধীনতার কথা বলিলেই রাজ-ভক্তির অভাব হয়, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। ব্রিটনবাসীগণ যেমন স্বাধীনতার গৌরব জানেন, এমন আর কেহ জানেন না। স্বাধীনতার কথা শুনিলে প্রকৃত হৃদয়বান্ ইংরেজ তাহার যত আদর করিবেন, বাঙ্গালী তত পারিবে না। যে মুহূর্ত্তে ক্রীতদাস ব্রিটিস সাম্রাজ্যে পদক্ষেপ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পড়িয়া যায়। ইংরেজেরা যদি হতভাগ্য ভারতবাসীগণকে ক্রমশঃ জ্ঞান সভ্যতায় সমুন্নত করিয়া স্বাধীনতার পবিত্র মন্দিরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের কীর্ত্তি জগতে চিরদিন অক্ষতভাবে বিদ্যমান থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চতর কীর্ত্তি, যশঃ, পুণ্য তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের হস্ত ধরিয়া উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে লইয়া চলুন, পরমেশ্বর স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। যেন পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় পরস্পরে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে না হয়। উভয় জাতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যেন পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিধাতা ইহাই করুন, যেন স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধার জন্য ভারতবর্ষকে তলবার ধারণ করিতে না হয়।

জাতীয় চরিত্র সংশুদ্ধ করিয়া অকুতোভয়ে সুদৃঢ়চিত্তে, উৎসাহিত হৃদয়ে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে।

"কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়;
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল, করিতে কি ভয়?
জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

মেহের আলি।

সপ্তম অধ্যায়।

শীত কাল অতীত হইয়াছে, তত্রাপি প্রাতঃকাল বলিয়া শীত বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিক্ নির্ব্বাত ও ধূম্রবর্ণ; কারণ কুআশায় পূর্ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোকিল-রব ও টাকাচোরা পক্ষীর অর্থগৃধ্নু রব বিনা আর কিছু শুনা যায় না। রাস্তার লোক নিতান্ত সম্মুখে আসিলেই দেখা যায়, নচেৎ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছে না, সুতরাং বেলা হইয়াছে কি না বুঝা যায় না। এমত সময়ে ঝব্ঝব্যা বটতলার দোকানী আপন আপনির সম্মুখীন রাস্তা সম্মার্জ্জনী হস্তে পরিষ্কৃত করিতেছেন। সহসা কিঞ্চিৎ শব্দাকর্ণনে দক্ষিণমুখ হইয়া দেখিলেন কি একটা প্রকাণ্ড আসিতেছে। কুআশায় বুঝা ভার; প্রকাণ্ড দৃষ্টে দোকানী অনুভব করিলেন হস্তী হইবে। যত অগ্রসর হইল ঐ অনুভবই দৃঢ় হইল। দোকানী ক্ষিপ্র হস্তে ঝাট দিয়া রথ্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। চলৎ বস্তু সম্মুখে আসিলে হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখা গেল। যখন পার্শ্বে উপনীত হইল উহা দাঁড়াইল; এবং একটী অশ্ব হইতে আরোহী নামিল। অশ্বটী বৃক্ষে বাঁধিয়া আরোহী দোকানীর সম্মুখে আসিল ও কহিল।

"সেলাম বুড়ামিঞা, ইস্ জাগাকে নাম ক্যা ?"

দোকানী। ঝব্ঝব্যা বটতলা, মসহুর হায়। আপ কাঁহাসে আতা হায় ? কিধার জায়ে গা ?

অশ্বারোহী। কুলাগাঁও হিয়াঁসে কেত্তা দূর ?

দোকানী। নজদিক, কিস্কা পাশ জায়ে গা ?

অশ্বারোহী। সেখ মিঞাজান খাঁ হাবেলী।

দোকানী। নেহি জানতা হায়, এই আদমী কুলাগাঁওমে হায় নেহি।

অশ্বারোহী। মৌলভি আমীর আলি জানতা হায় ?

দোকানী। ওঃ! বড়া আদমী থা, আব তো নীস্ত নাবুদ হুয়া।

অশ্বারোহী। আর্ কুলগাঁওমে বড়া আদমী কোন থা ?

দোকানী। আসগর আলি মোক্তার।

বলিতে বলিতে কুআশা ছাড়িল, রৌদ্র প্রকাশ হইল;—কারণ সূর্য্য যথেষ্ট উদয় হইয়াছে। দেশবাসীরা কহে বেলা দুই বাঁশ হইয়াছে অর্থাৎ সূর্য্য ৮ হস্ত পরিমিত বাঁশের দ্বিগুণ উচ্চ দেখা যাইতেছে। দোকানী দেখিলেন যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি সম্ভ্রান্ত-বেশধারী। অশ্বটী অতি সুবৃহৎকায় ও সুদৃশ্য। পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ-কারু-খচিত আসন। পুচ্ছের

উপরিভাগের কেশ থাক করে কাটা। আরোহীর মস্তকে জরীর আমামা, অঙ্গে সাটীনের জোব্বা, হস্তে দিব্য এক দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত চাবুক। দোকানী সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিলেন। আরোহী ভদ্রো-চিত ঈষদ্ধাস্যে অভ্যর্থনা গ্রহণ পূর্ব্বক বসিবার প্রয়োজন নাই বলিলেন, ও কুলগ্রামের পথ অবগত হইলেন। দোকানী আসনে বসাইতে না পারিয়া অনুমতি লইলেন, ধূম পানার্থ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করেন। অবিলম্বে একটী ডাবা হুকায় তামাকু দিলেন এবং আগন্তুকের ধূম পান করণ অবসরে দোকানী জিজ্ঞাসা করিলেন "ইস্মে সরিফ ?"

আরোহী। খোদাবক্স খাঁ।

দোকানী। কাঁহাসে তকলিফ ফর-মায়ে ?

আরোহী। বোসাঙ্গসে আয়েথে—আর চাটগাঁও সে।

দোকানী। দৌলতখান্ ?

আরোহী। চাটগাঁও।

অশ্বারোহী অশ্বারোহণে কুলগ্রামে গেলেন। আসগর আলির নাম করিয়া এক লোকপূর্ণ বৈটকখানায় উপনীত হইলেন। স্থানটী কাছারীর ন্যায় অর্থী প্রত্যর্থীতে পূর্ণ। প্রধান ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে বসিয়া গ্রাম্য বিচার কার্য্য করিতে-ছেন। উনিই আসগর আলি মোক্তার। তাঁহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—একটু অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় হইয়াছেন। আস-গর এক জনকে শাসন করিয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণী দেখাইতেছে ও ঐখানে যে আমীর আলি মৌলভির বাস ছিল তাহার দুর্দ্দশা দেখাইয়া স্বীয় প্রভুত্ব ও প্রতিহিং-সার পরিচয় দিয়া কহিলেন "দেখ্ আমার কথা না শুনত ঐ দশা হইবেক এখনও বুঝ।"

শাসিত ব্যক্তি "বুঝি," বলে কিঞ্চিৎ অন্তরালে গেল ও বাকর আলিকে জিজ্ঞাসা করিল "কি বল ভাই, এর চেয়ে আদালত হলে আমার ক্ষতি কি ? আমার লাখেরাজ জমীর যদি খাজনাই দিলাম তবে থাকিলে আর গেলেই বা কি ?"

বাকর কহিল "আদালত, আদালত মোক্তারের হাতে যে কি ভয়ানক তুই কি শুনিস্ নাই ! আমীর আলি মৌলভি রাজা ছিল—তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখে কে ? ঐ পুষ্করিণী তাঁহারই ভিটায় মোক্তার করেছেন। তাঁহার স্ত্রীকে মোক্তার কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার জাহাজ মোক্তারের হস্তে আছে। মোক্তা-রকে এক দিন তিরস্কার করে মৌলভির এই দুর্দ্দশা হয়েছে।" মকদ্দমাকারী কিঞ্চিৎ ভয়চকিত হইয়া কহিল "আমি সব শুনেছি—মোক্তারের আদেশ অব-হেলন কি আমি করিতে পারি ? তবে ভাই তুমি একটু বলে কহে দাও যাহাতে মকরবী টা হয়, তোমায় ১০ টাকা দিব।"

আর এক জন ব্যক্তি তথায় ছিল, সে মোক্তারের প্রতিহিংসা শুনে অবাক্ হইল ; এবং সোৎসুক বচনে বাকরকে জিজ্ঞাসা করিল "ও ভাই বাকর, মৌল-

ভির যে মেহের আলি নামক পুত্র ছিল ও তাহার নামে বিষয়াদি ছিল কি হইল?"

বাকর হাসিয়া কহিল—"দৈবও মোক্তারকে ভয় করে, বাপ মা মুর্লে মেহেব আলি ক্ষেপে কোথায় গেছে,—সে মরিয়া গিয়া থাকিবে নচেৎ ... কেহ না কেহ দেখিত। আর সে মোক্তারের নিকাহা-পুত্র বলে মোক্তার আদালতের হুকুম লইয়া তাহার বিষয়াদি ও তন্মাতার বিষয়াদি দখল করিতেছেন।"

এই মণ্ডলীর কাছে অশ্বারোহী নামিল ও স্থানের পরিচয় লইল। অশ্বারোহী কহিল "এ গ্রামে সেখ মিঞাজান কেহ আছে?"

বাকর কহিল "কৈ না। কেন?"

আরোহী। তাঁহার কন্যার নামে এক পত্র আছে।

বাকর। নাম?

আরোহী। মেহেরন্নিসা।

বাকর শিহরিল; সতর্ক হইয়া কিঞ্চিৎ উপেক্ষা ভাবে কহিল "শুনেছি তিনি এই আসগর আলি মিঞার প্রতিপালিতা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহিতা। কর্ত্তার কাছে গেলেই সব জানিবেন। বাকর আগন্তুককে মোক্তারের কাছে লইয়া গেল। মোক্তার পত্র দেখিলেন এবং আক্যাব হইতে কে লিখিবে ভাবিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন "কে পত্র দিয়াছে?" আরোহী কহিল "মেহের আলি ওলদে আমীর আলি মৌলভি।" মোক্তার চকিত হইলেন, দাড়ীটী দন্তে দন্তে ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। মুখটী বিমর্ষ দেখে পাছে আগন্তুক কিছু ভাবে বলে আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন।

"ঈশ্বরের জয়! আমার পলায়িত পুত্র মেহেরের সন্ধান পাইলাম! সে কোথায়, কেমন আছে?"

আগন্তুক। আমি ছয় মাস তাঁহাকে আক্যাব দেখে এসেছি, এখন কোথায় জানি না। মোক্তার বিশ্বস্ত হইবার জন্য কহিল "দুর্দান্ত বালক আমাকে ভয়ে পত্র লিখে নাই তাহার ভগিনীকে লিখেছে। আর কিছু বলেছে?"

আগন্তুক। "আমায় কিছু বলেন নাই, কয়েকটী টাকা দিয়াছেন" বলে ৫০ টাকা দিলেন। আসগরের নাম পুস্তিকায় টুকিয়া লইয়া আগন্তুক চলিয়া গেলেন। মোক্তার ব্যথিত-হৃদয় হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন—এবং ফজর আলিকে লইয়া গোপনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মোক্তার স্বরভঙ্গ ভাবে কহিলেন "ফজর আলি, এত যে পরিশ্রম এত যে কৌশল সব বি বিফল হইবে? মেহের আলি থাকিতে মৌলভির বংশ থাকিতে আমার হৃদয়ে রক্ত আসিতে পায় না। আবার সে সুখের সোপানে উঠিতেছে!"

ফজর। তাই ত, এখন কি করা যায়? যদি এর মধ্যে দেশে আসে কোন উপায় করা যাইবে, এবার তাহাকে ছাড়া হইবে না।

মোক্তার। দেশে আসিলে আমাদের আর নরহত্যা করিতে হইবে না; পত্রে

মেহেরন্নিসার উপর যে প্রণয় দেখিতেছি তোমার ভোগে সে আছে জানিলেই আপনি মরিবে। একটা বড় পরামর্শ আছে আবজানীকে ডাক ত।

ফজরআলি আবজানিকে ডাকিল, সে মোক্তারের দাসী। নামও যেমন, মনও তেমন, দেখিতেও আবর্জ্জনা বটে। আবজানি আসিলে মোক্তার কহিল "আবজানি, বাছা একটু বিশেষ কাজ কর, শীঘ্র যা, মেহেরন্নিসার দাদীকে ডেকে আনত; ছেড়ে আসিস না।" ফজরআলি খুল্লতাতের সকল অভিপ্রায় বুঝে নাই; মেহেরন্নিসার পিতামহীকে ডাকিতে কথায় বুঝিল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত মেহেরকে তাঁহাকে অর্পণ করিবেন। ফজরআলি মেহেরকে কখন দেখেন নাই। তাহার রূপ গুণের কথা শুনে পূর্ব্বে বড়ই আগ্রহ করিতেন তাহাকে পাইবেন; কিন্তু মেহেরের কাটকুড়ানী অবস্থা দেখে ও শুনে তাঁহার হতশ্রদ্ধা হয়েছিল। এজন্য তাঁহার বড় অভিমত নাই যে তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। তত্রাচ যতক্ষণ না আর একবার দেখেন একেবারে অস্বীকার করিবেন না ভাবিলেন। এমত সময় মেহেরন্নিসার পিতামহী আসিল। ভয়ে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা কহিল: "আমাকে ডাকাইয়াছেন কেন?"

মোক্তার। বৃদ্ধ মাতা, আর কেন আমার সহিত বিবাদ কর, মেহেরআলির আশা করে আছ, জগতে সে আর নাই, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র কি মন্দ? তাহার সহিত তোমার মেহেরের বিবাহ দাও।"

বৃদ্ধা। আমি কি মানুষ, যে আপনার সহিত বিবাদ করিব? শাস্ত্রমতে কাহারও সহিত মেহেরের বিবাহ দাও, দিব।

মোক্তার সহর্ষ হইয়া কহিল "অবশ্য আমি অশাস্ত্র বিবাহ দিতে বলি না। কল্য মোল্লা ডাকিয়া ফজরের সহিত মেহেরের নিকাহা সম্পন্ন করিব।"

বৃদ্ধা নিকাহাতে সম্মত নহেন, এক মাত্র পৌত্রী তাহার বিবাহ (সাদী) দিবেন বড় সাধ। অতএব ভয়ে অর্দ্ধোক্তভাবে বলিলেন "নিকাহা! সাদী না হলে কি হইল! আর কি কেহ নাই?" ফজরআলি এতক্ষণ নীরব ছিল এক্ষণেনিজ অবমাননা বোধে ঈষদুষ্ণ ভাবে কহিলেন, "নিকাহা কি বিবাহ নহে?"

মোক্তার কহিলেন "ফজর বুঝাইবার প্রয়োজন কি? বৃদ্ধা, আমার সৎপরামর্শ শুনত যাহা বলি কর। এত দিন যদি করিতে দুঃখের মুখ দেখিতে না। আর ইহা নিশ্চয় জানিও আসগর যাহা মনে করেন করিবেনই; তবে সহমানে করিলে আপনার লাভ নচেৎ অলাভের সীমা নাই।"

বৃদ্ধা জানেন মোক্তারের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা, কি হতে কি হয়েছেন ভাবিলেন; আমার কি হতে কি হন ভাবিলেন। অনেকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন আচ্ছা আমি সম্মত হইতে পারি। দেখ যেন আবার মেহের সপত্নীতে পড়ে ক্লেশ না পায়; এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করত সম্মত হই।"

মোক্তার হৃষ্ট হইয়া বলিলেন তাহার জন্য চিন্তা নাই, আমার কন্যা বড় ভাল। যাহাহউক এত দিন পরে তোমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী উদিত হইল এই জান। কল্য বিবাহের আয়োজন করিব, মেহেরকে এখানে আনিবে।"

পর দিন বিবাহের তাবৎ উদ্যোগ হইল, কিন্তু মেহেরন্নিসা আসিল না; তাহার নিকাহাতে সম্মতি ছিলনা; সুতরাং সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইল। মোক্তার ব্যর্থ হইবার নহে; যথা-পূর্ব্ব ফয়সালা জারি করিয়া আদালত বলে মেহেরকে ফজরের বাটীতে আনাইলেন। মেহেরন্নিসা অসহায়া স্ত্রীলোক, কি করেন অগত্যা পত্নীভাবে ফজর আলির ভবনে রহিলেন। তাঁহার পিতামহী ধর্ম্মভীত, একে পৌত্রী বিচ্ছেদে কাতর, আবার সেই সাধের পৌত্রী বিনা বিবাহে পর পুরুষ সহবাসে গেল দেখে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। শোক দুঃখে বৃদ্ধা কাল গ্রাসে কবলিতা হইলেন এবং মেহের যথার্থ বান্ধব-বিহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিলেন।

মোক্তার মেহেরন্নিসাকে এই জন্য হস্তগত করেন যে যদি ইতিমধ্যে মেহেরআলি দেশে আসে তাহার প্রণয়িনীকে পরভোগ্যা দেখে জীবনে হতাশ হইবে। কিন্তু অত বিলম্ব সহে না। বিদেশে তাহার অমঙ্গল করা মোক্তারের চেষ্টা হইল। যদি সে উন্নতি-সোপানে একবার উঠে, চাহি কি মেহেরন্নিসাকে ভুলে সুখের উপায় দেখিতে পারে। এজন্য তিনি কিছুকাল পরে ফজরআলিকে আক্যাবে মেহেরআলির সন্ধানে পাঠাইলেন। রকিমন্নিসার জাহাজ মোক্তারের হস্তে ছিল, সেই জাহাজে ফজরআলি অবিলম্বে আক্যাবে পৌছিল। বন্দরে পৌছিলে চট্টগ্রামী প্রবাসীরা প্রায় সকলে জাহাজে আসে। দেশগামী সঙ্গীগণকে জাহাজে তুলিতে আসে, কেহ দেশে পত্র ও টাকা পাঠাইতে আসে এবং প্রায় সকলেই দেশের কুশল জানিতে আসে।

এই সকল লোক দ্বারা মেহের আলির সন্ধান লওয়া ফজরআলির প্রধান কার্য্য হইল। সাতদিন জাহাজ বন্দরে রহিল এবং ঐ সাত দিনই ফজরআলি আগন্তুক ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত রহিলেন। যাহারা যাহারা জাহাজে আসিল ফজরআলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেককে দেখিলেন এবং ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া প্রত্যেকের বিবরণ ও প্রবাস স্থল অবগত হইলেন। অবসর মত-এক এক জনের আবাসে গিয়া তাহার গল্প শুনিতেন। অনুসন্ধানে শুনিলেন নুরআলি নামক এক ব্যক্তির সহিত মেহেরআলি নামক এক জন সহবাসী ছিল। সন্ধান করিয়া জানিলেন নুরআলির বাটী ফটীকছরী, এবং সে কএক দিন হইল দেশে গিয়াছে। তদ্ভিন্ন আর কোন সংবাদ পাইলেন না, অতএব যাত্রা জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে দিন জাহাজ ছাড়িবেন তৎপূর্ব্ব রজনীতে ফজরআলি—খুল্লতাত মোক্তার

হইতে এক খানি পত্র পাইলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে মেহেরআলি গালিবন্দর— হইতে মেহেরন্নিসাকে পত্র লিখিয়াছে যে জলফিকর খাঁ নামক এক ব্যক্তির জাহাজে তিনি রওনা হইলেন, সঙ্গে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আছে। উহার তথ্য অনুসন্ধান আবশ্যক। ঐ পত্র খানি যথারীতি মোক্তার আবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহার এক অনুলিপিও ফজরআলিকে পাঠাইলেন। পত্রটী ফারসীতে ছিল তাহার মর্ম্ম এই :—

"হৃদয়ানন্দদায়িনি মেহেরজান! আজ দুই বৎসর হইল তোমার প্রেমমুখ-স্বর্য্য-কিরণে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি, কি অপরাধে যে তোমার অঙ্গুলিচুম্বিত-লেখনী-নিঃসৃত মধুপানে বঞ্চিত আছি জানি না। আমি প্রায় ছয় খানা পত্র দ্বারা নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছি। প্রিয়ে! শয়নে স্বপনে তোমার মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে বিরাজমান রহিয়াছে। আমার সঙ্গীরা এখানকার মগিনীদের সুন্দরী দেখেও আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমার দাসীর যোগ্য তাহারা নহে। যে তোমায় দেখেছে সে কি আর অন্য স্ত্রীর মুখ দেখিতে চায়? প্রিয়তমে তুমি রাগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু কি অবস্থায় আছ কেমন আছ একবার জানাইলে এই দুঃখ-ক্লেশ-পূর্ণ হৃদয় শীতল হইত। আমি গালি বন্দরে জলফিকর খাঁর জাহাজে তবাধিষ্ঠিত স্বর্গধামে চলিলাম, সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ লইলাম, পঞ্চ সহস্র হইবেক। তোমার জন্য মগী অলঙ্কার ও বস্ত্র লইয়াছি। ইহাতে তোমায় রাণী করিতে পারিব না বটে, কিন্তু একবার শ্রীমুখ না দেখে তেজোহীন হইয়াছি তাই একবার যাইতেছি এখন তোমার অনুগ্রহ যাহা হয়।"

পত্র পাঠে ফজরআলি বিমনা হইলেন। ইচ্ছা দেশে ফিরে যান, কিন্তু মোক্তারের কার্য্য করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আছেন, কি করেন, গালিবন্দরে জাহাজ চালাইলেন। তথায় যাইবা মাত্র বন্দরের লোক আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল" পথে একটী জাহাজ ডুবিয়াছে দেখিয়াছ? শুনিলেন জলফিকর খাঁর জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে এবং তাহাতে মেহেরআলি রওনা হইলে অবশ্য কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে জানিয়া হৃষ্টমনা হইলেন। সত্বর সংবাদ লইয়া দেশে আসিবেন বলিয়া জাহাজ ছাড়িলেন। সেই জাহাজে বন্দর হইতে একটী লোক উঠিল তাহার নাম নুরআলি। ফজরআলি তাহাকে আপন কক্ষে লইয়া মেহের আলির সংবাদ লাভার্থ তাহার আক্যাব ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে কহিলেন।

নুরআলি আমুদে লোক, বহুভাষী; সে আদ্যোপান্ত গল্প আরম্ভ করিল। নুরআলি আপন ঘর হইতে রওনা হইয়া যে যে পথ দিয়া যত দিনে যেখানে আসেন আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আরম্ভ করিলে ফজরআলি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে নুরআলি কহিল "মহাশয় অমন করিলে আমি কিছুই বলিতে পারিব না।" অগত্যা ফজরআলি বাগাড়ম্বর সহ্য করিলেন ও নুরআলি কহিলেন—

"মহাশয়! আপনি দেখিতেছি ব্যস্তাগ্রগণ্য। যাহাহউক স্বদেশ-বিবরণ-কৌতূহলাক্রান্ত না হইলেও হাড়ভাঙ্গ, ঢালা, ও সমুদ্র-তটপথ বিবরণ শুনিতে অনিচ্ছুক হইবেন না।" ফজরআলি হতাশ হইয়া কহিলেন "বল তোমার যাহা ইচ্ছা হয়।"

নুরআলি কহিলেন "মহাশয়, আমি "একটী খাঁর ডিঙী বাজারে আসিলাম বেলা দ্বিপ্রহরাতীত হইয়াছে, বর্ষাকাল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে । খাঁর ডিঙীতে, আপনি জা... কিছু পাওয়া যায় না। চূড়াদধি আহার করিলাম। হাড়ভাঙ্গ ঢালার মুখ সেই। ঢালা যাইবার জন্য আমরা ২০ জন একত্র হইলাম। খাঁর দিঘিতে ওজু বানাইয়া মসজিতে নমাজ পড়িলাম, পরে আল্লা আল্লা বলিয়া ঢালায় প্রবেশ করিলাম। দুই ধারে ঘন নিবিড় বন; অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষলতা সমূহের নাম কেহ জানে না। কিয়দ্দূর গিয়া এক দ্বিহস্ত-পরিমিত খাত দেখিলাম। পুরাতন পথিকগণ কহিল এই হাড়ভাঙ্গ নদীর সূত্রপাত। পরে সময়ে সময়ে ঐ নদী ক্রমে বিস্তারিত আকার ধারণ করিল এবং আমরা ঐ নদীকে পাঁচবার পার হইলাম। যাত্রীরা কহিল এই বার বন ছাড়াইলাম। প্রথম প্রথম বনে প্রবেশ করিয়া মনে হইতেছিল দুইধারে লোকের বাগান। আবার বন ছাড়াইয়া গ্রামে আসিলাম। গ্রাম্য বৃক্ষাদিকে চিনা ভার। এইটী বনের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। এই খানে হাড়ভাঙ্গকে ষষ্ঠবার অতিক্রম করিতে হয়, এখানে সাঁতার জল। আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবনে প্রবেশ করিলাম, আবার বনকে উপবন ও উপবনকে বন বলিয়া ভ্রম হইল।" ফজরআলি আর ধীর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন "নুরআলি মেহেরআলির কথা বল ত শুনি নচেৎ আপন স্থলে যাও বিশ্রাম করগে।" নুরআলি কহিলেন "মহাশয়! আমি যত সংক্ষেপে বলিতেছি কেহ এমন পারে না, আরও কিছু শুনিলেই মেহেরের কথা পাইবেন। যদি এত অধীর হয়েন নাচার। ফজরআলি আবার নীরব হইলেন, ও নুরআলি কহিতে লাগিলেন। "মহাশয়, সন্ধ্যাকালে আমরা এক বিস্তীর্ণ নদীতে পড়িলাম, উহা হাড়ভাঙ্গের সপ্তম অতিক্রমণ। কি করি, কষ্টে সন্তরণ দিয়া পার হইলাম। বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল। বাজারে উঠিলাম। দোকানীরা স্থান দিল না। হাটের চালায় আগুণ করে সকলে গল্প স্বল্পে রাত কাটাইলাম। ঝমঝমে বৃষ্টি, ঘোর অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে দোকানীরা "ছি ছি" বলিয়া কুক্কুর তাড়াইতেছে। মহাশয়, এ জাহাজে আশা নয় যে সুখে খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে আসিব, গরিব লোকের বড় কষ্ট।"

ফজর কহিলেন "বটেই ত, এই কষ্ট গেলেই বাঁচ, শীঘ্র বলে ফেল"।

নুরআলি কহিলেন "সকালে আহার করে নৌকায় উঠিলাম। মহাশয়, বলিব কি, হাড়ভাঙ্গ এবার বড় দরিয়া হয়েছে, চেনা ভার! এপার ওপার দেখা ভার। আবার

জলে কুমীর; ডাঙ্গায় বাঘ। দিন রাত্রি নামা হইল না। রজনীতে সমুদ্র গর্জ্জন শুনিলাম। পার্শ্বস্থ সুন্দরবন হইতে হরিণ দল, "টউ টউ" করিতে লাগিল। ঘর ছেড়ে যে বিদেশে এলাম এই বার বুঝিলাম।"

ফজরআলি কহিল "বটেই তো ঘর ছাড়িলেই বিদেশে, পথে বিলম্বের প্রয়োজন কি? একেবারে একাবে এস না।"

নুর আলি কহিল "মহাশয়, আপনি তো বল্লেন, এ তো জাহাজ নহে, যে পাল ছেড়ে দিবে। পথটি কেমন! মাঝিরা ভয়ে বড় নদী ছেড়ে এক খালে ঢুকিল। তাহার পর, এক বিস্তীর্ণ জলে পড়িলাম, তাহার নাম "গুজনটিঙ্গা" উহার পাঁচটি মুখ। এক দিকে হাড় ভাঙ্গা নদী, এক দিকে কুতোবদ্বীপ খাড়ি, এক দিকে বাহির সমুদ্র, এক দিকে সাঁপলাপুর (যথায় জল সাঁপলার ন্যায় ফুটিতেছে) ও এক দিকে মহেশ খাল খাড়ি। কেহ ন্যূন নহে, এবং পাঁচ দিক হইতে জোয়ার এসে এখানে এমন তোড় করেছে যে মাঝি ভায়াদের ফিরাইবার যো নাই। নৌকা সামাল সামাল, যাত্রীদের মধ্যে তুল তামাল। আমি বড় শক্ত, বমি করি নাই।"

ফজর আলি। "ধন্য বল তোমার!"

নুর আলি। নয় মহাশয়! গুজনটিঙ্গা সমুদ্র বলিলে হয়, কুতোবদ্বীপ দেখা যায় যেন সবুজ দূর্ব্বার ছটি জলে ভাসিতেছে। সেই রজনী মহেশ খালে আহারাদি করে পর দিন প্রাতে পাড়ী দিলাম। মাঝি বেটা হাল ধরিতে জানে না; সোজা ধরেছে, আর ভাঁটায় হড় হড় করে সমুদ্রের মুখে লয়ে গেল। দাঁড়ীরা বাহিতে লাগিল, "কোলা, কোলা, কোলা" বলে, কিছু হয় না। তুল তামাল, নৌকা বড় দরিয়ায় ভেসে যায়!"

ফজর আলি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া গেলেন। পরদিন অনেক করে বুঝাইয়া নুর আলি হইতে এই সংবাদ পাইলেন যে একাবে আসিলে মেহের আলি তাহার সঙ্গ লয়, ও উভয়ে এক বাসায় থাকে। মেহেরের রোজকার নুর আলির হাতে থাকে, এবং নুর আলি একটি মাগিনী বন্দক রাখার নিমিত্ত মেহের বিরক্ত হইয়া এক দল রেঙ্গুণ যাত্রীর সহিত, রেঙ্গুণে গিয়াছিল। তাহার পর কোন রকমে গালিবন্দরে আসিয়া জাহাজে দেশে যাইতেছিল; পথে জলমগ্ন হইয়াছে। ফজর আলি দেশে আসিয়া এই সংবাদ মোক্তারকে দিল, এবং মোক্তার তৎ সম্বাদে নিশ্চিন্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মেহেরন্নিসা যে দিবস ফজর আলি ভবনে আদালতবলে নীতা হয়েন, তাহার পক্ষান্তরে মেহেরন্নিসার পিতামহীর কাল হয়। এই ঘটনার দিন কএক

পরে একদা বেলা তিন প্রহরে সময় মেহেরন্নিসা ও ফজর আলির স্ত্রী আমীরজান বিবি বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। আমীরজান হেঁট হইয়া পান সাজিতেছেন—মেহেরন্নিসা ছল ছল লোচনে কি বলিতেছেন। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ তারকদ্বয় জলে ভাসিতেছে—সেই কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্ম বিকম্পিত হইতেছে। কেবল তাহাতে যে বালিকার নিশ্চিন্ততা ও নির্ভীকতা ছিল তাহা নাই। কাঠকুড়ানী অবস্থায় যে সবল অপাঙ্গদ্বারা বনবাসী যুবা উপহাসিত হইয়াছেন—অন্যমনস্কে যে নয়নদ্বয় সরলতাময় হইয়া মেহের আলির প্রতি চাহিয়া থাকিত—এখন সে নয়ন ভারি ভারি ঠেকিতেছে। শুদ্ধ দুঃখ চিন্তার ভার নহে—যৌবনের ভারও পড়িয়াছে। মেহেরন্নিসাকে আর রৌদ্রে যাইতে হয় না—অন্নাহার জন্য ক্লেশ করিতে হয় না—এবং অনাহারেও থাকিতে হয় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যৌবনও শনৈঃ শনৈঃ দেহকে সম্পূর্ণ করিয়াছে, সে ত জানে না এখন না আসিলে ভাল হইত। মেহের যত কেন না চাহুন, যত কেন না চিন্তামগ্না ও দুঃখিতা হউন—যৌবন বুঝে না। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যেমন কৃষ্ণাঙ্গ গৌর করিতে অক্ষম হয়—ইহার রূপও লুকায় না। মেহের আর অঙ্গসংস্কার করেন না, তথাপি সে স্বর্ণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মেহের চুল বাঁধেন না, তথাপি তদীয় কেশরাশি স্বীয় স্বাভাবিক সুচিক্কণতা লাভ করিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অল্প অল্প পরিদৃশ্যমান মুখচন্দ্রকে অতি তেজোময় করিয়াছে। নদী যেরূপ খাল খোল পূর্ণ হইয়া জোয়ারের জলে থম থম করে—মেহেরন্নিসার দেহ যৌবনে থম থম করিতেছে। মেহেরের কি সাধ্য ওজন ঠেলেন,—কি করেন একেবারে কাল-সমুদ্রে ডুব দেওয়া বিনা উপায় নাই—এবং আশা থাকিতে কেহ জলে ঝাঁপ দেয় না। সে আশা কি ?

মেহেরন্নিসা কহিতেছেন "ভগিনী, যখন আমাকে জোর করে এখানে আনিল, বুঝিলাম নরককুণ্ডে পড়িলাম, রক্ষা নাই, উপায় নাই। এক আশা ছিল, বিক্ষেপ আঘাতে প্রাণত্যাগ হইবেক;—কঠিন প্রাণ গেল না। যাহাতে যাইত তাহার উপায় করিতাম, কিন্তু এখানে স্বর্গীয় দূত এসে আমায় ডানায় ঢাকিল, আশা দিল, যাঁহার জন্য এই ক্ষুদ্র দেহ হইয়াছে তাঁহাকে সমর্পণ না করে, এ প্রাণ যাবে না। ভগিনী তুমিই সেই দূত। আবার যখন শুনিলাম—দাদী লীলা সম্বরণ করিলেন, পৃথিবীতে যে আত্মীয় আমার কেহ রহিল না বুঝিলাম, কিন্তু সত্য কহিতেছি—আমীরজান তোমার স্নেহ দেখিলে ঐ কথা মিথ্যা বোধ হয়। কিন্তু বল, তুমি অবলা, অসহায়া, কি করিবে ?—আর পারিলে না, কেন বিড়ম্বনা দাও, এ কাল রূপ এ কাল যৌবন এ দেহকে ধূলিসাৎ না করে ক্ষান্ত হবে না। তোমার

স্বামী স্বচক্ষে আমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, পোড়া শরীর কি তেমনি যে পর পুরুষকে তাড়াইবে? সত্য বলিতেছি ভাই—পোড়া দেহের রঙ্গ দেখে হাসি পায়, এই দুঃখের সময় যেন আহ্লাদে গড়াইয়া পড়িতেছে। বন বিদায় দাও, আজ রাত্রির মধ্যে যেন এ দেহ মন একত্র না থাকে, তা হলে অনর্থ হবে, এত যে তোমার ভালবাসা, যত্ন,—কৌশল,—বিফল হইবে। তুমি কি আমাকে পুরুষের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে,—না আমার জন্য চিরকালের নিমিত্ত স্বামীর বিরাগ-ভাজন হইবে?"

এতক্ষণ আমীরজান অভিনিবেশে, পান সাজিতে ছিলেন, কাল আলপাকার ন্যায় সুচিক্কণ পেটে পাড়া চুল চক চক করিতেছিল। আমীরজান মাথা তুলিয়া একটী পান গালে দিলেন, একটী মেহেরকে দিলেন। মেহেরের হাতের পান হাতে রহিল দেখে আমীরজান পানটী পুনঃ নিজ হস্তে লইয়া মেহেরের গালে দিলেন ও বলিলেন "ভয় কি বন—বেটা ছেলে ত গাড়ল, তাহাদের ঠকাইতে কতক্ষণ,—দেখিও দেখি আমি কি করি।" আমীরজান মেহেরের পানে সহাস্যে চাহিলেন,—সে সহাস্য আনন দৃষ্টে মেহেরের সাহস হইল, স্ফূর্ত্তি হইল। আমীরজান মেহের অপেক্ষা সুন্দরী নহেন—কিন্তু কিঞ্চিৎ বয়োধিকা। তাঁহার মুখশ্রী চিত্রকরের কাছে অনেক দোষ-যুক্ত,—মেহেরের মুখছবির কাছে অনেক অংশে হীন, কিন্তু সবটী ধরিলে বড় মন্দ নহে। বিশেষতঃ সরলতা অমিয়ভাব ও স্নেহ সে মুখ-কমলকে অনির্ব্বচনীয় প্রেমময় করিয়াছে। দেখিলে বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধা হয়, ভাল বাসা হয়। আমীরজানের নয়নের শ্বেতবর্ণ কিঞ্চিৎ অধিক থাকায়—চক্ষুদ্বয় যেন বড় বড় দেখায় এবং না হাসিলেও যেন হাসি হাসি দেখায়। সে মুখ সে শরীর যেন আমোদের জন্য, সুখের জন্য, পরোপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সস্নেহ অথচ সহাস্যভাবে রমণী মেহেরন্নিসার দাড়ী ধরিয়া এক হস্তে আলুলায়িত কেশ পাশ অপসারিত ও অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন, "বন! এ চাঁদ মুখ কি আমার স্বামীকে দেখাইতে পারি,—তা হলে যে জন্মের মত আমার অন্ন যাইবে।"

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও মেহেরের হাসি এল—কহিলেন, "ভগিনী আপনার দোষ ঢাকে অনেক লোক, গুণকে আত্মম্ভরিতায় পরিচয় দেয় সে কিরূপ লোক?" বাস্তবিক যে মুহূর্ত্ত মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন আমীরজান তাঁহার সতীত্ব রক্ষণে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। শাশুড়ীকে বুঝাইলেন, এ রূপ-রাশি দেখিলে, এ সুন্দরী সপত্নী হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশ। ফজরআলির মাতাও বিচক্ষণ ছিলেন, বিবাহ বিনা স্ত্রী-সহবাসে পুত্রের পরকাল যাইবে ভয় করেন এবং স্নেহময়ী পুত্রবধূ আমীরজানের মনঃপীড়া দিতে কাতরা। এ জন্য তিনি পুত্রকে পরস্ত্রী স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন, বধূর সহিত একমত হইয়া

মেহেরকে গোপন রাখিতে ও তাঁহার রূপকে ছাপিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন; আমীর-জানের উপহাসে, কৌশলে, বর্ণনায় ফজরআলি মেহেরন্নিসার যথার্থ পরিচয় পান নাই,—সুতরাং সহসা মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধ অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। মেহেরন্নিসা আমীরজানের স্নেহে অতি সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন। আমীরজান বলেন তিনি আত্মরক্ষার্থ মেহেরকে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে ও ভাবে উন্নততর ভাব প্রকাশ পায়।

কএক দিবস পরে ফজরআলি আপন স্ত্রীর কথা অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, স্বয়ং একবার মেহেরন্নিসাকে না দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না কহিলেন। আমীর-জান বুঝিলেন অধিক পীড়াপীড়ি করিলে অনর্থ ঘটিবে অতএব তাহাতে সম্মতি দেন। এই কারণেই মেহেরন্নিসা কাঁদিতেছিলেন ও অনুযোগ করিতেছিলেন। অল্প কথায়ই আমীরজান মেহেরকে ক্ষান্ত করিলেন। তখন মেহের পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "আমীরজান, তোমার ধার যে আমি কিরূপে শোধিব জানি না,—জগতে আমার যদি কিছু থাকিত সর্ব্বস্ব তোমায় দিয়া এক মুহূর্ত্তও দুঃখিত হইতাম না।" আমীরজান হাসিতে হাসিতে কহিলেন "মেহেরআলি ত আছে,—তাহাকে আমায় দিতে পার।"—মেহেরন্নিসা একটু ভাবিয়া কহিলেন "পারি।" আমীরজান বড় রসিকা অমনি মুখ বঁাকাইয়া কহিলেন "না ভাই, তা বলে, আমি আমার ভাতারকে দিতে পারিব না।"

এমত সময় ফজরআলির মাতা কতক গুলি চাউল লইয়া আসিলেন, উভয়ে মস্তক আবরণ করিল ও নীরব হইল, বৃদ্ধা তাহাদের নিষ্কর্ম্মা দেখিয়া চাউল বাছিতে দিয়া গেলেন। আমীরজান চাউল বাছিতে বাছিতে বলিলেন "মেহেরজান' (ঐ নাম তিনি মেহেরের কাছে গল্পে শুনেছেন) "মেহেরআলি কেমন পুরুষ? বোধ হয় তাহার গোঁপ সবুজবর্ণ, ভ্রূ হরিদ্রাবর্ণ, চক্ষু নীল, দন্ত পাটল; আর তাহার তিন টী চক্ষু ৪টী নাসিকা ৫টী কান ও আড়াইটি হাত। মেহেরন্নিসা কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিলেন—"ও কি বর্ণনা, অমন কি মানুষ থাকে?" আমীরজান ঠোঁট বাঁকাইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "মানুষ তোমার মনের পুরুষ হ'ল—আর আমার ভাতারকে তোমার মনে ধরে না?" মেহেরন্নিসা তখন উপহাস বুঝিলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ঠিক বলেছ ভাই, মেহের আলির মত মানুষত পৃথিবীতে দেখি নাই।" আমীরজান বালিকার ন্যায় চাপল্য ভাবে কহিলেন "আচ্ছা ভাই, বলদেখি তাহার গোঁপটী কেমন?" "মনের মত।" "নাক কাণ কেমন?" "মনের মত।" "মুখ চখ কেমন?" "মনের মত।" হাত পা গুলি?" "মনের মত" "বয়স? রূপ?" "মনের মত।"

"মনের মত ভাবিস ভাল।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিনটা গেল॥"

আমীরজান কহিল "মেহেরআলি যে তোমায় তেমনি ভাবে, তাহার বিশ্বাস কি? পুরুষ মগের মুল্লুকে গেলে কি ঘরের কথা মনে রাখে?" মেহের কহিল 'আমিত বিশ্বাস করি, কেহ যদি বিশ্বাসঘাতক হয় সে কি আমার দোষ? শুনেছি আমায় নাকি সে পত্র ও টাকা পাঠায়, তোমার বাপ আটকে রেখেছে। ভোলে নাই, ভুলিলে কি এমন করে?" "যদি তোমাকে পরপুরুষ ভবনে দেখে অবিশ্বাস করে?" "স্বধর্ম্মে থেকে যাঁহাকে চক্ষু মুদিয়া দিন রাত ভাবি, চক্ষু খুলে একবার তাঁহাকে দেখিব। এই ক্ষুদ্র শরীরটা যাঁহার জন্য এত যত্ন করে রেখেছি একবার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিব; নালয়েন সেই খানে প্রস্থান করিব যেখানে মনের খোলা খুলি আছে এবং তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকব।"

এত বিশ্বাস, এত গাঢ় প্রণয় দেখে আমীরজান বড়ই প্রীত হইলেন; সহসা উঠিয়া গিয়া এক খানি পত্র আনিয়া মেহেরকে দিলেন, এবং কহিলেন 'মাপ কর ভাই—সকালে এই পত্র বাবার ঘর হইতে এনেছি—তোমার জন্য দিতে ভুলেছিলাম' মেহের আস্তে ব্যস্তে পত্রটী লইলেন, শিরোনামে আপন নাম ও মেহের আলির স্বাক্ষর দেখে অশ্রুতে অন্ধদৃষ্টি হইলেন। হস্ত কাঁপিতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এমত সময় আমীরজান শাশুড়ীর আহ্বানে বাহিরে গেলেন। মেহের অবসর পাইয়া পত্র খানি চুম্বন পূর্ব্বক বক্ষস্থলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিলেন; কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পাঠ করিলেন, আবার ভাবে মগ্ন হইলেন, আবার পত্রকে চুম্বন করিলেন, কি যে করিবেন বলা যায় না।

এমত সময় আমীরজান আসিলেন ও কহিলেন "ভাই মনচোরার কথাটা একবার আমায় শুনাবে না?" "শুন" বলিয়া মেহের পত্র পাঠ করিলেন,—তাহার মর্ম্ম এই।

"মেহেরজান, মম প্রাণ!

(মেহের) চন্দ্র এখনও তিন সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে নাই—আমি দিক্-চতুষ্টয় হইতে চারি খানা পত্র দূতে চট্টগ্রামের (মেহের) চন্দ্রের সমীপে কিঞ্চিৎ অর্থ ও সংবাদ প্রেরণ করিলাম, কেহ ফিরে এল না। জীবিতেশ্বরি! রাজরাজেশ্বরী না হইলে বুঝি বাঙ্গালের প্রতি মন উঠিবে না? আমিও তেমন করিতে না পারিলে হুজুরে হাজির হইব না। যাহা হউক এবার একটা হাসির কথা বলি।

একদিন আমি বাসায় বসে আছি। একটা মগ স্বীয় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী লইয়া বলিল বাঁধা রেখে টাকা দিবে? বাজারে সব জিনিসের খরিদ্দার আছে। আমার বাসার এক জন লোক ইহাতে সম্মত হইল, মগ ১০০ টাকা লইয়া স্ত্রীকে ছয় মাসের জন্য রেখেগেল—তন্মধ্যে গর্ভ হলে সুদ দিবে না বলিল। রুগিনী একটু কাঁদিল, পরে

কায়মনোবাক্যে বন্ধক-গৃহীতার সেবায় নিযুক্ত হইল! অবিশ্বাসীর দেশে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বিশ্বাসী লোকে সেই সওদায় মন দেয় এই আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি? যে চট্টগ্রামের (মেহের) চন্দ্রকে চক্ষে দেখে নাই, মগের জোনাকী আলোয় মোহিত হবে সন্দেহ কি? আমার অন্তরে যে মধুর রূপ বিরাজিত আছে,—সমগ্র মগের সৌন্দর্য্য একত্র করিলে তাহার কাছে নিষ্প্রভ। দুঃখ, চক্ষু মেলে দুই দণ্ড সেই হৃদয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম না।"

মেহেরন্নিসা ভাবিতে লাগিলেন—কেনই বা তিনি প্রাণনাথকে এমন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন,—রাজরাজেশ্বরী হয়ে লাভ কি? কাঠ কুড়ানীর সুখ কি তাহাতে হইবে? আমীরজান কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন।

"যেমন হাবী, তেমনি হাবা,
বর মিলেছে ভাল।
হাবী হাবার বিয়ে হবে রাজচোটক হল।

সেই রজনীতে দিব্য বেশভূষা করিয়া ফজরআলি আপন গৃহে এলেন। আমীরজান তাঁহার স্ত্রী আজ সদয় হয়ে চিরসাধের মেহেরকে দেখাবেন। নবীন নায়ক চুল আঁচড়ে, আতর কানে দিয়ে, পান মুখে দিয়ে, গোঁপে তা দিতে দিতে সহাস্য বদনে কহিলেন "আমীরজান, কৈ আন।" আমীরজান ঘোমটা টেনে মান করে বসিলেন। নায়ক দায়ে পড়েছেন—মালিনীকে না সাধিলে চলে না—অনেক খোসামোদ করিলেন। শেষে রাগ করে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা রাখিবে ত রাখ, নয় ত আর খাতির করিব না।" আমীরজান ঘোমটা তুলে বলিলেন "উঃ, আর খাতিরে কাজ নাই,—ভেড়ার খাতির চায় কে?" "আমি কি ভেড়া?" "তা না হলে আর এমন বুদ্ধি! ঘরের এমন পাকা মিষ্টি আম ফেলে পরের গাছের টকো আমে ঢিল মার?" "আমি দেখিব বৈ ত নয়—দেখিলে কি গিলে খাব?" "গেলো গিলিবে—কাঠকুড়ানীর কাঁটা ঝোড় গলায় বেধে যন্ত্রণা পেয়োনা যেন।" ফজর আলি পুনঃ খোসামোদ করে বল্লেন "লও, রঙ্গ রাখ—মেহেরকে দেখাও।" আমীরজান উপহাসচ্ছলে কহিলেন "আমার রঙ্গ কি আর ভাল লাগে? সেই পোড়ার মুখীকে দেখাই রঙ্গ" বলিয়া চলিয়া গেলেন ও বলিলেন—"তাহারে আনাই, কিন্তু দেখ গায়ে হাত দিও না—আমার অপমান করোনা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিলেন ও কহিতে লাগিলেন "মর ছুঁড়ি আয় না, মিন্‌সে দেখুক তুই আমার চেয়ে কিসে ভাল।" অবগুণ্ঠনবতী আমীরজানকে ধরিয়া দরোজার ধারে দাঁড়াইলেন। ফজরআলি এতক্ষণ ভাবসাগরে ডুবে ছিলেন। যে মেহেরন্নিসাকে চেয়েছিলেন নিজায়ত্তে পেয়েছেন; যে স্ত্রী

প্রতিবন্ধক ছিল আজ সেও কতক সদয় হয়েছে। এক দৃষ্টে অবগুণ্ঠনবতীর পানে চাহিলেন। হস্তপদ মাত্র দেখিতে পাই-লেন তাহাতে এক প্রকার মনোভঙ্গ হইল। বুঝিলেন বহুদিবস জঙ্গলে ভ্রমণ জন্য এরূপ কদাকার হইয়াছে। যাহাহউক বলিলেন "ফারসী না কি বেশ জানেন কৈ একটা শুনি।" আমীরজান বলিতে বলি-লেন,—অবগুণ্ঠনবতী অতি নীরস স্বরে অশুদ্ধভাবে একটী বায়েৎ আবৃত্তি করিল। ফজরআলি বুঝিলেন, স্ত্রীলোকের লেখা-পড়া নাম ডাক মাত্র। অতএব তিনি যাহা চান তজ্জন্য জিদ করিলেন একবার মুখটী দেখিবেন। অনেক ক্লেশে আমীর-জান অবগুণ্ঠন উঠাইলেন, ফজরআলি দেখিলেন এবং অবগুণ্ঠনবতী তৎক্ষণাৎ পলাইল। মুখের চেহারা দেখে ফজর-আলির স্বপ্ন ভাঙ্গিল—কহিল এই কি সেই পরমাসুন্দরী মেহেরন্নিসা?" আমীরজান কহিল "পরের মুখে যে টক খায় সেই জানে—কাটকুড়ানীর আবার কি রূপ হবে?" বলিয়া আপনি অবগুণ্ঠনাবৃতা হই-লেন। ফজর কহিলেন "আবার মেঘে চাঁদ ঢাকিল কেন?" "যে ভেড়াকান্ত রূপ চিনে না তাহাকে দেখাবার প্রয়োজন কি?" ফজরআলি অপ্রস্তুত হইয়া কহি-লেন "আমি কি মন্দ করিলাম, ঘরের আসা মাল যাচাইয়া লইয়ে বুঝিলাম ঠকেছি কি জিতেছি। তোমায় কি আমি ছাড়িতে পারি?" "ও কথায় আমি ঠকি নাই, দিবা গাল আর সেই পোড়ার মুখীর নাম করিবে না তবে মুখ খুলিব।" "না করিব না।" "ও হবে না তোবা কাট।" "তোবা, তোবা, তোবা।" তখন আমীরজান ফজরআলির পার্শ্বে বসিয়া স্বচ্ছন্দে ক্ষুদ্র হাতটী দিয়া দেখে দিয়ে গেলেন। আমীরজান ডাকিলেন, ফজর কহিলেন বড় গ্রীষ্ম একটু বাহিরে বেড়াইবেন, আমীরও সঙ্গে এলেন, তাঁহারও ঐ জন্য নিদ্রা হয় নাই। উভয়ে অঙ্গনে পরিচারণ করিতে লাগিলেন। ফজর কহিলেন *"হিম লাগিবে, ঘরে যাও।"* "উঃ—বড় গ্রীষ্ম।" "রাত্রি হইয়াছে ঘুমাইবে না?" "তোমার ঘুম পাইয়াছে কি?" "না।" "আমারও না।" ফজর আলি নিরুপায় ভেবে বলিলেন, "বৈটক-খানার কবাট বুঝি খুলে রেখে এসেছি—যাই।" আমীরজান কহিলেন তাঁহার সাধ ছিল একবার বৈটকখানা দেখেন—আজ শ্বাশুড়ী নাই—বাটীতে গুরুলোক নাই—সঙ্গে গিয়া দেখে আসিবেন। অগত্যা ফজর আলি স্ত্রী সঙ্গে বৈটক-খানায় গেলেন,—ও কহিলেন "না, কবাট যেমন তেমনি আছে, যাও ঘরে যাও, আমি একবার বাহিরের ফুল-বাগানে যাব।" "বাহিরে বাগানে যাই-বারও আমার সাধ—জোৎস্না রাত্রি কেহ নাই চল না।" ফজর আলি কি করেন বাগানে গেলেন,—আমীর ফুল তুলিয়া ফজরকে দিলেন—ফজরের কিছুই ভাল লাগে না—কি অসুখ হইতেছে।

আমীর শয়ন করিতে কহিলেন যে তিনি সেবা করিবেন। ফজর পাইখানায় যাইবেন। আমীর কহিলেন তাঁহার সাধ হইয়াছে—স্বামীর খানসামা হইবেন। স্কন্ধে গামছা—হস্তে বদনা লইয়া স্বামীর অপেক্ষায় রহিলেন। ফজর যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া, অবশেষে গৃহে এলেন। উভয়েই কপট নিদ্রা গেলেন। ফজর উঠিলেন—বাহিরে যাবেন—আমীর কহিলেন "আমিও যাইব।" সঙ্গে গেলেন আর এলেন,—আবার কপট নিদ্রা। যখনি ফজর উঠেন—আমীরও উঠেন। ভুষ্টে ভুষ্টে,—ফজর নিরুপায় হয়ে রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিবস তিনি মাতার কাছে কুটুম্ব বাটী যাইবেন ও রজনীতে আসিবেন না কহিলেন। সহসা অর্দ্ধ রজনীতে গৃহে আসিলেন। বেড়া দিয়া দেখিলেন নিজ গৃহে আলোক জ্বলিতেছে—শয্যায় আমীর জান নিদ্রিতা রহিয়াছেন। আস্তে আস্তে শূন্য পদে ফজর আলি মেহেরের শয়ন গৃহে গেলেন। মেহেরও শয্যায় শয়িত—গৃহে আলোক জ্বলিতেছে। ফজর বড় ঘরে আসিলেন—বহির্ভাগ হইতে ঝাঁপ বাঁধিলেন। বাহিরের দ্বারও আবদ্ধ করিলেন যে গোল করিলে বহির্ব্বাটী কি অন্তঃপুরের পরিচারকগণ না আসিতে পারে। আমীরজানের ঘর বাঁধিয়াছেন সেও আসিতে পারিবে না। আস্তে আস্তে মেহেরের ঘরের ঝাঁপ খুলিলেন মেহের জাগিল না। আনন্দে করিল। লম্পটের অভিসন্ধি খাটিল—এখন সহজে না হয় বলে ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, তাহার পর যাহা হয়। ফজরআলির মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পা চাঁপিতে লাগিল সহসা ভূমে বসিয়া পড়িলেন। ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন না পাছে মেহের অনায়ত্তে জাগিয়া উঠে।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ফজর শয্যায় উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সহসা রমণী উঠিয়া বসিল, বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বসিল। ফজরআলি থমকে দাঁড়াইলেন। মেহের যে চীৎকার করিল না—পলাইল না, ইহাতে আশান্বিত হইয়া কহিল "সুন্দরী ক্ষমা কর, তোমার জন্য আমি আজ ছয় মাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি। আর বাল্যকাল হইতে তোমার রূপ মাধুরী দর্শনে লোলুপ আছি। স্বয়ং বিচারপতি আমাকে তোমায় সমর্পণ করেছেন, তাহাতে দোষ কি? সদয় হও। সুন্দরী আর একটু ঘোমটা টানিলেন ও ফিরিয়া বসিলেন। ফজর অনেক চাটুবাদ ও মধ্যে মধ্যে মধ্যে ভয় প্রদর্শন ও করিলেন। অবশেষে পদধারণ করিতে গেলে রমণী পা গুটাইয়া লইলেন। ফজর শয্যায় বসিবার উপক্রম করিলে—রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ফজর হাত ধরাইয়া বলপূর্ব্বক বসাইল এবং যেমন তাহার প্রতি বল প্রকাশের উদ্যম করিল—সহসা রমণী অবগুণ্ঠন তুলিয়া কহিলেন "ছিছি! ধিক্ তোমায় তোমায় ধিক্!" ফজর

এ মেহের নহে আমীরজান। আমীরজান তাহার স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। এই জন্য আপন শয্যায় বালিকাকে বস্ত্রাবরণ করিয়া শয়ান রাখিয়া ও মেহেরকে এক নিভৃত স্থলে লুকাইয়া মেহেরের শয্যায় কপট নিদ্রায় ছিল। আমীরজান নিজ মুখ খুলিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিলেন; কহিলেন "দেখ দেখি এমন মুখ কোথা পাবে—স্বর্গে গিয়া পাও কিনা সন্দেহ! ভাগ্যে নাই, তাই এদিক্ ওদিক্ চাও।" সেই বচনের সহিত কটাক্ষ বাণে সেই মুখভঙ্গীর সহিত হাস্যভাবে ফজরআলি মোহিত হইলেন। আমীরের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া এক হস্তে তাহার হস্ত ধরিলেন ও অমিয় ভাবে বলিলেন "প্রিয়ে, রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে অবহেলন করিতে পারি, না করেছি? এবার হতে যাহা বলিবে করিব।"

আমীরজান জয়ী হইলেন—সখীর বিপদ কৌশলে মোচন করিলেন। এক জন রমণী কাষ্ঠ বেচিতে আসিত—তাহাকে মেহের হইতে কিছু বাএত শিখাইয়া অর্থের বশীভূত করিয়া অবগুণ্ঠনবতী সাজাইয়া দিলেন। ঐ অবধি ফজরআলি আর মেহেরের নামও করিতেন না। পরে মোক্তারের অনুরোধে মেহেরআলির অনুসন্ধানে যান। তথায় মেহেরআলির পত্র দৃষ্টে সন্দেহ হয়, তিনি যাহাকে দেখেছেন সে প্রকৃত মেহেরন্নিসা নহে। গৃহে আসিয়া কেবল অনুসন্ধানে রহিলেন, কিসে মেহেরকে গোপনে দেখিতে পান। একদা মেহেরন্নিসার আলুলায়িত কেশ-রাশি আমীরজান বল-পূর্ব্বক ধরিয়া আঁচড়াইতেছেন। ফজরআলি বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিলেন—কেশরাশির অভ্যন্তরে অপূর্ব্ব রূপ বিকীরিত হইতেছে। সহসা মুখের চুল আমীরজান সরাইল,—ফজরআলি যাহা দেখিলেন জন্মে কখন দেখেন নাই। আর ফজরআলি স্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখিলেন না। কিসে মেহেরকে হস্তগত করিবেন—নিজে নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। মেহের তাঁহার মাতার শয্যায় শয়ন করে, মাতাকে পৃথক্ করিতে পারিলে হয়। ফজর কৌশল করিয়া মাতাকে কুটুম্ব বাটীতে পাঠাইলেন। মেহের সঙ্গে গেলে কুটুম্ব স্থলে অখ্যাতি হইবে বলে সে সঙ্গে যাইতে পাইল না।

সে রজনীতে সখীর রক্ষার জন্য আমীরজানের নিদ্রা নাই। ফজরালিরও নিদ্রা নাই। তিনি রাত্রি করিয়া ঘরের দিকে এলেন আমীরজান ঘুমাইয়াছে কি না?—দেখিলেন আমীরজান বসিয়া আছে। এই রূপে বার বার পরাভূত হইয়া ফজরআলি আর বল ও কৌশল উপায় ছাড়িয়া স্পষ্টতঃ আপন মাতাকে কহিল বহুদিন স্ত্রী বলিয়া একজন স্ত্রীলোক যে বাটীতে আছে তাহাকে পরের ন্যায় রাখা অনুচিত। তাহার মাতা নিকাহা করিতে অনুমতি দিলেন এবং মোল্লা আনিয়া বিবাহের উদ্যোগ হইল। মেহেরন্নিসা সাবালিকা তিনি অসম্মত, সুতরাং নিকাহা

অশাস্ত্রীয় বলিয়া মোল্লা সম্পন্ন করিল না। তবে মহম্মদীয় শাস্ত্র মতে ক্রীতদাসী সহবাসে বিবাহ আবশ্যক নাই। মেহের-ন্নিসার উপর ডিক্রী করিতে শতেক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে, সেই ডিক্রীতে বল পূর্ব্বক তাহাকে আনা হইয়াছে, সুতরাং মেহের শাস্ত্রমতে ফজরআ-লির দাসী সাব্যস্ত হইল। ফজরের মাতা মেহেরের অসম্মতিতে বিরক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন। তদবধি মেহেরের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। আমীরজান যত কেন করুন না—দাসীদের সহিত মেহেরকে শয়ন করিতে হইল ও গৃহকার্য্য করিতে হইল। মেহের সম্মার্জ্জনী হস্তে কর্তৃগৃহ সংস্কার করিতে গিয়া দেখিলেন, আমীরজান সব সম্পন্ন করে রেখেছেন—আমীর তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহি-লেন এ ঘর আমি করে রেখেছি, আমার ঘরে চল। মেহের জানেন আমীরের জন্য তাঁহার কাজ করিতে হয় না। তত্রাপি কি বলিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় আমীরজান তাঁহার হাত ধরিয়া আপন ঘরে লইয়া গেলেন। মেহেরকে ধরিয়া বিছানায় বসাইলেন, মেহের কহিলেন "বন, এখন আমি দাসী, আর কেন আমার সহিত সখ্যভাব?"

আমীর কহিলেন "সে কি বন, ও রূপের গোলাম বিনি, তাঁহার দাসী আমি, কবে যে তুমি বিছানায় শোবে আর আমি তো-মার পা সেবা করিব,—ভেবে মরিতেছি।"

মেহের। না ভাই তাহার চেয়ে আমি আছি ভাল। এরূপ থাকিতে পারিলেও একরূপ জীবন কাটে। বন্ মনে হয় দেহটাকে খুব কষ্ট দেই, ভেঙ্গে যাউক, কিন্তু ভাঙ্গে না।

আমীর। না না—এখন ভাঙ্গিবে কেন? যাহার জন্য দেহ রেখেছ সে ত ভুলে নাই। বাপের বাটীতে শুনে এসেছি—মেহেরআলি ২০০০ টাকা তোমায় পাঠাইয়াছে, বাবা তাহা লইয়া-ছেন,—লউন, সে দেশে এলে যে আরও টাকা আনিবে তাহার সন্দেহ নাই।

মেহের শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন "বন তোমার ভাল হউক, বল বল, আবার বল, কিরূপে জানিলে?"

আমীর। আমি যার কাছে শুনি-লাম সেখান হইতে ২০০০ টাকা কল্য এসেছে, আর আবজানি এক খানা পত্রের খাম এনে দেছে, তাহাতে তোমার নাম লেখা দেখিলাম।

মেহের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর কি বন সে কপাল হবে?"

মেহের এক চালায় শয়ন করে,—তাহার রক্ষার জন্য আমীরজান সতত সজাগ থাকেন। একজন দাসীও মেহে-রের দ্বারে রক্ষক স্বরূপ থাকে, এজন্য ফজরআলি—মাতার শয্যা হইতে তাড়া-ইয়াও—অদ্যাপি মেহেরকে আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

একদা রজনীতে মেহেরের সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন গৃহে আলোক আসি-

য়াছে—এবং যাহাকে ভয় করেন, সেই ফজরআলি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মেহের ভয়চকিত স্বরে দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ফজর কহিলেন "সুন্দরি! ভয় নাই,—ভয় নাই,—আমি চোর নহি, দস্যু নহি, ব্যাঘ্র নহি, রাক্ষস নহি। মনুষ্য—তোমার রূপের দাস। কৃপা কর—অতিথি গৃহে—বিরতা হইও না।" মেহেরের মস্তক ঘুরিল—ঘন ঘন দাসীকে ডাকিলেন। দাসী দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল "কি হইয়াছে?"

ফজরআলিকে গৃহে দেখিয়াও যে দাসী নির্ব্বোধের ন্যায় ঐ প্রশ্ন করিল, তাহাতেই মেহেরের ভয় জন্মিল, তত্রাপি কাতর ভাবে কহিল "আমীরজানকে ডেকে আন,—আমার বড় ভয় হইতেছে।" ফজরআলি তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল,—মেহের ভাবিলেন নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুষ্ট পুনঃ গৃহে প্রবেশ করিল। মেহের কি করিবেন ভাবিতেছেন এমত সময় দাসী আসিয়া কহিল "বহুঠাকুরানী বলিলেন, তিনি আর রোজ রোজ কি করিবেন, আপনার যাহা হয় করুন।" শুনিয়া মেহেরের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল, তথাপি দাসীর কথা বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং আমীরজানকে অনেকবার ডাকিলেন, উত্তর নাই। ফজরআলি কহিলেন "প্রেয়সি, কেন ক্লেশ কর,—আমি স্ত্রীর অনুমতি না লয়ে কি এসেছি? তুমিও ত আমার পত্নী, তবে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর কেন?"

মেহের। পত্নী কিসে হলাম?

ফজর। কেন আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছে—আবার কি?

মেহের। তাহাতে আমার কি? আমি কি সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিলাম? আর ফয়সালায় কি কাহারও বিবাহ হয়?

ফজর। না হয়, নাই হইল; এক্ষণে তোমার উপরত আমার অধিকার আছে?

মেহের। কি অধিকার?

ফজর। তোমাকে টাকা দিয়া বল করে ঘরে এনেছি,—ইহাতে তুমি আমার দাসী হইয়াছ। দাসীর শরীর প্রভুর আয়ত্তাধীন। তোমার ইচ্ছা না থাকুক, তোমার শরীরভোগে আমার কি তোমারও পাপ নাই।

মেহের। এমন শাস্ত্র কে শিখালে? আপনি জ্ঞানী, কেন বিড়ম্বনা করেন? আমাকে ছাড়ুন আপনার পায়ে পড়ি।

বলিয়া মেহের কাঁদিয়া পায়ে পড়িলেন। ফজর "উঠ উঠ" বলে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন;—কহিলেন "অনুগত হও, যাহা কহিবে দিব, নচেৎ অদ্য রাত্রিতে নিস্তার নাই।"

মেহের নিতান্ত ভীতা হইলেন; বিছানার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ফজর শয্যার দিকে আসিতে লাগিল দেখে—মেহের উঠিলেন। দ্বার বদ্ধ। নিরুপায় ভেবে বলিলেন "মহাশয়, পরমেশ্বর জানেন আমি ধর্ম্মরক্ষা-

জন্য কত চেষ্টিত ছিলাম। এক মাত্র সহায় আমীরজান,—আজ তিনিও বিমুখ হইলেন। সব আমার কপালে হয়। যাহাহউক—আমার একটী ভিক্ষা, এক দিন সাবকাশ দিন,—কল্য মোল্লা ডাকান, আমি সম্মতি দিব এবং আপনি নিকাহা করিবেন।" লম্পট অনেক সন্তুষ্ট হইল—এবং কহিল "এই ঠিক পরামর্শ,—অনেক দিন ত বলেছিলাম। যাহাহউক তাহাই হইবে,—এখন এ রাত্রি অতিথি সৎকার কর, কল্য বিবাহ করিব।"

মেহের। সে কি? তাহাও কি হয়?

ফজর। কেন? লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষ কি? আর দোষ হউক বা না হউক,—আজ ফিরিব না।"

মেহের সঙ্কল্প বুঝিয়াছিলেন, আর বিতণ্ডা করা বৃথা জানিয়া কহিলেন "নিতান্তই ছাড়িবেন না তবে বসুন।" বলে একটী মোড়া বসিতে দিলেন। ফজর যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—"এইত, অমন রূপ কি নির্দ্দয় হইতে পারে?" মেহের তামাকু সাজিয়া দিলেন,—ফজর হুকা লইয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। মেহের কহিলেন "অধিনীর শয্যা অতি হীন, বেশ মলিন, দেহ অপরিষ্কার—অদ্য ক্ষমা করুন, কল্য পরিষ্কার হয়ে থাকিব।" ফজর ভুলিবার নহে,—দ্বার খুলিলেন, দাসীকে ডাকিয়া কহিলেন তাঁহার উত্তরীয় শয্যায় পাতিয়া দেয় এবং মেহেরকে কহিলেন "প্রিয়ে, তোমার রূপ ও মধুর বচনে প্রীত হইয়াছি—চাঁদের কি গহনা চাহি? মেঘেও চাঁদের ক্ষতি হয় না।"

মেহের কহিলেন "আপনার না হউক—আমার অসুখ হইবে। আমার ত অদ্য বিবাহ। নিদান গাত্র মার্জ্জন করিয়া এক খানি ভাল কাপড় পরি। আর আমাকে বহির্দ্দেশে যাইতেই হইবে।"

ফজরআলি দ্রবীভূত হইয়াছেন,—আর অবিশ্বাস করেন না,—বিশেষতঃ যে দাসী তাঁহার বশীভূত আছে তাহাকে লইয়া মেহের বহির্দ্দেশে গেলেন। ফজরও খিড়কী পর্য্যন্ত গেলেন। মেহের এক বাঁশ বাগানে গেলেন,—সর্ব্বদা ভয় করিতেছে বলে দাসীর সাড়া লইলেন। ফজর তাহাতে নিশ্চিন্ত হইলেন—মেহের পলাইবেন না। পরে, বহুক্ষণ পরে মেহের ঘাটে এলেন। ফজর নিশ্চিন্ত হইলেন। এমত সময় বৃষ্টি আসিল। ফজর ঘরে এলেন,—দাসী ছায়ায় দাঁড়াইলেন। অনেক ক্ষণ বৃষ্টি হইল,—মেহের আসিল না,—দাসী ডাকিল, উত্তর নাই। বৃষ্টি থামিল,—ঘাটে মেহের নাই। দাসী দৌড়িয়া ফজরকে সংবাদ দিল, ফজর লণ্ঠন হস্তে ঘাটে খুঁজিলেন। মেহের জলমগ্না হইয়াছে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। ফজর জলে নাবিলেন, সমস্ত খুঁজিলেন,—মেহের নাই। এমত সময় রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

জাতীয় সঙ্গীত—প্রথমভাগ। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা। জি পি রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ উনত্রিশটী জাতীয় সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুটি কত এত উৎকৃষ্ট যে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—সে গুলির প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক ভাব, আমাদিগের হৃদয়ের সহিত যেন তারে তারে গাঁথা রহিয়াছে। সে গুলি আমরা কতবার পড়িয়াছি, কতবার শুনিয়াছি, এবং কতবার আপন মনে গাইয়াছি, কিন্তু যতবার পড়ি, যতবার শুনি, এবং যতবার গাই, প্রতিবারই যেন নূতন বোধ হয়; প্রতিবারই যেন আমাদিগের হৃদয়ের গূঢ়তম যন্ত্র সকল বাজিয়া উঠে। পাঠক! আমরা সত্য বলিতেছি, কি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা আপনারা পাঠ করিয়াই অনুভব করুন্ :—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোবন
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন॥
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়॥
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী নট বেহাগ*—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি॥
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

(হিন্দুস্থানী ধরণে গান করিতে হয়)

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও॥ ধ্রু
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নব অঞ্জন ও॥
যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও॥
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাথা ও॥
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব
গত যত বৈভব, কালে ও॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন, যে দিন ও॥

* রাগিণী তিলক কদমেও গাওয়া যায়।

তব জল তীরে, পৌরব যাদব
পাতিল রাজসিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥

* * * * *

কভু শত ধারে, এ উভ পারে
পাঠান আভ্গান মোগল ও।
ঢালিল সেনা ত্রাসি নিবাসী
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও॥
অহ! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটী পালটি
লুঠি নিল যা ছিল সার ও॥
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।
সে দিন হইতে অন্ধ মনোগৃহ
পরবল-অর্গল-পাতে ও॥
সে দিন হইতে তব জল তরলে!
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে ভারত নারী
অবরোধ অবরোধিত ও॥
সে দিন হইতে তব তট গগনে
নূপুর নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে সব প্রতিকূলে
যে দিন ভারত বন্ধন ও॥
গোবিন্দচন্দ্র রায়।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত কাল পরে বল ভারতরে,
দুখ সাগর সাঁতরে পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে,
নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে,
পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে
(গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

আমরা স্থানাভাবে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যে কয়েকটী উদ্ধৃত করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইলাম তাহার মধ্যে ভারতে যবনের "দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি", ভারত সঙ্গীতের "বাজরে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", সরোজিনীর "দেখ্‌রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন", এবং বীরনারীর "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এই কয়েকটী প্রধান। যাহা হউক যাহা তুলিলাম তাহাতেই পাঠকগণ আমাদিগের প্রশংসার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

সংগ্রহকার এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মালা স্বজাতি গলে অর্পণ করিয়া গভীর সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গলদেশ এই অপূর্ব্ব দেব-আভরণে ভূষিত দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসী স্বজাতি-ভাষায় বীতশ্রদ্ধ। তাহারা যে সকলে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া এই অমূল্য—দেবদুর্লভ—মালা পরিধান করিবে, আশা করা যায় না। যাঁহাদিগের হৃদয় অগ্রেই স্বদেশানুরাগে বিগলিত

হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাই যত কেন মূল্য হউক না দিয়া অবশ্যই ইহা পরিধান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদিগের বিগলিত হৃদয়কে পুনর্ব্বার বিগলিত ও উত্তেজিত করাও এ মালা গাঁথার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। যাহাদিগের হৃদয় স্বদেশানুরাগ বিষয়ে এখনও পাষাণবৎ রহিয়াছে, সেই পাষাণ দ্রব করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিনামূল্যে বা অতিশয় স্বল্প মূল্যে বিক্রীত না হইলে আর সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই-জন্য আমরা সংগ্রহকারকে পরামর্শ দিই হয় তিনি চাঁদা দ্বারা ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিনামূল্যে ইহা কুটীরে কুটীরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিতরণ করুন, নয় শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিক্রয়ার্থ ইহা প্রেরণ করুন। এই দেবদুর্লভ সঙ্গীতগুলি রমণী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হইলে হৃদয়কে যে কি পরিমাণে আর্দ্র করে, তাহা গ্রেট্ ন্যাসানেল নাট্যশালার সহৃদয় শ্রোতৃ মাত্রেই অবশ্য অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের বড় বাসনা যে কতিপয় স্বদেশহিতৈষিণী মনস্বিনী রমণী সন্ন্যাসিনী বেশে এই সকল স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত গাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। কোন বিষয়ে সহস্র বক্তৃতা কর, অগণ্য গ্রন্থ রচনা কর, জনসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না; কিন্তু সেই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট গান কর—সকলেরই হৃদয় বিগলিত হইবে—পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মযাজক বেদির উপর বসিয়া অসংখ্য বক্তৃতা করিলেন, নরকের ভয় দেখাইলেন, ঈশ্বরকে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি প্রদান করিলেন, পাপীর হৃদয় বিগলিত হইল না; কিন্তু বক্তৃতা শেষ হইলে যেই বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং বাদ্যের সহিত একতানে যেই ভক্তিরসের গান গীত হইতে লাগিল, অমনি পাপীর হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত হইল, চক্ষু বহিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। এই-রূপ সকল বিষয়েই বক্তৃতা এবং গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা সঙ্গীতের শক্তি অধিকতর বলবতী। সেই সঙ্গীত আবার রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত হইলে সহস্রগুণ অধিকতর শক্তি ধারণ করে। এই জন্যই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাসনা। এরূপ বাসনা আপাততঃ অতি অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু সে দিন অতি দূরবর্ত্তি নয়, যে দিনে এরূপ সন্ন্যাসিনী গণের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে ভারতের চিরনিদ্রিত অধিবাসিগণ জাগরিত হইবে।

সংগ্রহকার এরূপ আশা দিয়াছেন যে তিনি সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয় ঘটিত সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সঙ্গীতের অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা আমাদিগের এই আশা যেন অচিরাৎ ফলবতী হয়!

——

শরীর ও মন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনেকে আপত্তি করেন যে মন যদি শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে সকলের মন সমান হয় না কেন? তাঁহারা কহেন,—"তোমরা বলিতেছ, মন সামান্য জড় পদার্থ হইতে উৎপাদিত হইতে পারে না। তর্কের কারণ তাহা স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিলাম যে চেতন পদার্থ সামান্য জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না; জড় পদার্থ শারীর পদার্থ রূপে পরিণত না হইলে কখন চেতন পদার্থের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। মন যখন শারীর পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে, তখন একই শারীর-পদার্থ-সমুদ্ভূত বিভিন্ন-শরীরস্থ মনের এত ভেদাভেদ লক্ষিত হয় কেন? এক জন বন্য অসভ্য ব্যক্তির শরীরে যে শারীর পদার্থ, এক জন বিজ্ঞতম সুসভ্য মহাজনের শরীরেও সেই শারীর পদার্থ। কিন্তু ইহাদিগের পরস্পরের মানসিক প্রকৃতি ভাব, চিন্তা, বিবেচনা, প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখিলে অনুমান হইবে, যেন ইহারা দুই জনে স্বতন্ত্র প্রকার জীব; দুই জনেই এক মনুষ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আবার দেখুন কোন বিষয় আপনি দেখিলেন, দেখিয়া বিচার করিলেন, আমিও দেখিলাম এবং বিচার করিলাম; কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের সিদ্ধান্ত ও মত হয়তো সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথবা বিপরীত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দেখুন, যাঁহারা বালক বালিকাগণের অধ্যাপনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সকলে সমভাবে কখন শিক্ষিত হয় না, উহাদিগের পরস্পরের মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি এত বিভিন্ন যে এক জন যাহা বুঝিতে পারে অন্য জন তাহা বুঝে না, এক জন যে সময়ের মধ্যে এক বিষয় শিক্ষা করে, অন্য জন সে সময়ের মধ্যে তাহা কখনই শিখিতে সমর্থ হয় না। সমান পরিশ্রম করিলেও সকলের সমান উন্নতি হয় না। আরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে মন যদি শরীর-সমুৎপন্ন হইল, তবে সেই শরীরের স্ফূর্ত্তি অনুসারে মনেরও স্ফূর্ত্তি হয় না কেন? যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীমের বুদ্ধি বিবেচনা ও বিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠতা অবলক্ষিত হয় নাই কেন? প্রত্যুতঃ দুর্ব্বল অপেক্ষা বলবান্ এবং কৃশ অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির উৎকর্ষ কখনই প্রতিপাদিত হইবে না। অতএব এক-শারীর-পদার্থ-সমুৎপন্ন মনের ধর্ম্মাদির যখন এতদূর প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে, তখন বিভিন্ন-শরীরস্থ মনের উৎপত্তি কারণ কিরূপে একই শারীর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? ঈশ্বর

ইহাদিগকে বিভিন্ন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই তাহার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।" এই আপত্তি কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিচার করা যাইতেছে।

আমাদিগের আপত্তিকারীর অর্থ এই, যে, মন যদি দৈহিক উৎপত্তি হইত, তবে একই কারণের ফল সমূহে এত প্রভেদ ঘটিত না এবং শারীরিক স্ফূর্ত্তি অনুসারে মনেরও স্ফূর্ত্তি হইত; কিন্তু যখন এরূপ হয় না, তখন শরীরকে মনের ব্যুৎপত্তি কারণ বলা যাইতে পারে না।

অনুমান তর্ক দ্বারা * দর্শন শাস্ত্রের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। এই অনুমান প্রণালী অবলম্বন করিয়া মন সহসা প্রমাদে পতিত হয়। আমরা এক বিষয়ে যে প্রকার নিয়ম দেখি, সেই নিয়মের জ্ঞান মনে মনে সর্ব্বদাই এত জাগরূক থাকে, যে সর্ব্ব প্রকার বিচারেই সেই জ্ঞান প্রবিষ্ট হইতে চাহে। আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পিতার নিকট আহার প্রার্থনা করি এবং জনক আমাদিগকে আহার প্রদান করেন। আমরা এই পার্থিব নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের নিকট সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে যাই, যেন প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। তদ্রূপ পক্ষিশাবককে ডিম্ব হইতে বিনির্গত হইতে দেখিয়া বিশপ বট্‌লারের সহিত অনুমান করি, মৃত্যুর পর মনও একদা দেহ হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। এই প্রকার এক বিষয়ের নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আরোপ করিয়া, মনে করি সেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ও সেই একই নিয়মাধীন; সুতরাং নানা ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হই। এক বিষয়ের নিয়ম যখন অন্যবিধ বিষয়ে প্রয়োগ-যোগ্য বলিয়া অনুমান করি, তখন হয়তো বিচার করি না সেই অপর বিষয়ে তাহা বাস্তবিক প্রযুক্ত হইতে পারে কি না। সাবধান না হইলে এই প্রকার অনুমান দ্বারা মন সহসা প্রতারিত হইয়া যায়।

আমাদিগের আপত্তিকারীও এই প্রকার অনুমান দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন একই বৃক্ষজাত ফল সমূহে যেমন রসের বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না এবং কোন বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ একই-শরীর-পদার্থ-সমুৎপন্ন মনের তারতম্য ঘটিতে পারে না। কিন্তু তিনি কি দেখেন নাই, সকল বৃক্ষই উদ্ভিদ-পদার্থ-সমন্বিত, অথচ বিভিন্ন-বীজ-জাত বৃক্ষ ভেদে ফলের তারতম্য কেন ঘটিয়া থাকে। শরীর ও মন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। আচার্য্য যে তদীয় শিষ্য-মণ্ডলীর সকলকেই সমান-ধীশক্তি-সম্পন্ন দেখেন না তাহার কারণ এই। কিন্তু ইহাতেও একটি কূট তর্কের নিরাসন হইল না। যদি একই বীজের ফল সমান হওয়া প্রাকৃত নিয়মাধীন, তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মানসিক শক্তির এত তারতম্য কেন ঘটিয়া থাকে? একই-জনক-জননী-সম্ভূত

* Reasoning from analogy.

শরীর হইতে ভ্রাতৃগণের মানসিক ধর্ম্ম কেন বিভিন্ন হইয়া যায়, তাহার কতিপয় কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ। ভ্রাতৃগণের মানসিক শক্তির বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদিগের বংশ-সম্ভূত কতকগুলি মানসিক লক্ষণ সমান থাকে। এই বিশেষ মানসিক লক্ষণ গুলি কি প্রকার তাহা পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ গুলিতেই তাহাদিগের জনক জননীর একত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। অতএব এই লক্ষণ সমূহ অবশ্য বীজ-জাত বলিতে হইবে। তবে একই বীজ-জাত-বৃক্ষের ফল সমূহে, অন্য কারণ বশতঃ পরস্পর কথঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিলেও তাহাদিগের যে কতিপয় প্রধান ধর্ম্ম সাধারণতঃ সর্ব্ব ফলেই বিদ্যমান থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যরশ্মির অভাব এবং বিদ্যমানতা হেতু একই বৃক্ষের ফলে বর্ণাদির বিভিন্নতা ঘটিলেও রসের অল্পই তারতম্য ঘটে। তদ্রূপ অন্যান্য কারণ বশতঃ ভ্রাতৃগণের মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা ঘটিলেও তাহাদিগের রাগ, দ্বেষ, ঔদার্য্য, মহত্ত্ব, প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা যে সর্ব্ব জনকেই এক-কুল-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। পুত্রোৎপাদন সময়ে জনক জননীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেদ হেতু পুত্রেরও শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে। শারীরতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন জনক জননীর শারীরিক ধর্ম্মের উপর তাহাদিগের সন্তান সন্ততির শারীরিক অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। জনক জননীর শারীরিক অবস্থা আবার তাহাদিগের মানসিক অবস্থার প্রভাবে প্রচলিত হয়। কারণ মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; মন সুখী হইলে শরীর প্রস্ফুরিত হয়, মন শোক-সন্তপ্ত হইলে শরীরও তৎসঙ্গে শুখাইতে থাকে। সুতরাং জনক জননীর মানসিক অবস্থার উপর তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থাও অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে, এবং তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থানুসারে পুত্রেরও শারীরিক অবস্থা নিয়মিত হয়। কিন্তু জনক জননীর শারীরিক অবস্থা কখন চিরদিন সমান থাকিবার নহে, সময়ে সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এবং এই পরিবর্ত্তনানুসারে তাঁহাদিগের পুত্রগণের মধ্যেও শারীরিক ভেদাভেদ উৎপন্ন হইতেছে। অতএব যখন ভ্রাতৃগণের মধ্যে শারীরিক ভেদাভেদ জন্মিবার এমন সুস্পষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের মানসিক ধর্ম্মের ভেদাভেদ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি?

তৃতীয়তঃ। ভ্রাতৃগণের মানসিক উন্নতি ও অবনতি তাহাদিগের শিক্ষার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষা প্রভাবে মানসিক অবস্থার কত দূর ভেদাভেদ হয় তাহা সকলেরই বিদিত আছে; এ জন্য সে বিষয় বিস্তারিত লিখিবার আবশ্যক নাই। সকলই আ-

পন আপন জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতীত হইতেছে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মানসিক বৈলক্ষণ্য জন্মিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। আপত্তিকারীর অন্যান্য তর্ক অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। তিনি কহেন ভীমের শারীরিক স্ফূর্ত্তি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অধিকতর ছিল, তবে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীমের মানসিক উন্নতি অধিকতর হয় নাই কেন। এতদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, আপত্তিকারী কি বড় গাছে বড় ফল ধরিতে দেখিয়াছেন? যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র, এবং ভীম পবনপুত্র ছিলেন।

আমরা বোধ হয় অনেক দূর প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, শরীরেরই মনের ব্যুৎপাদক কারণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। লোকপ্রচলিত সাধারণ মতে কহে যে মন স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহা শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমরা মনের এই ব্যুৎপত্তিকারণেরই প্রতিবাদ করিয়াছি। মন যে কি পদার্থ তৎ-সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মতের প্রতিবাদ করি নাই। সাধারণজনগণের মত এই যে মন জড় পদার্থ নহে, উহা একটি স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ। আমরাও তাহাই বলি। আমরা বলি, শরীর যেরূপ জড়পদার্থ, মন সেরূপ জড়পদার্থ নহে, উহা আর একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যাহাকে চেতন অথবা আত্ম পদার্থ* বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ মতের সহিত আমাদিগের অনৈক্য নাই। কারণ মনকে জড়পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে কতক গুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়।

১। মন যদি জড় পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনেতে জড়ের গুণ-সমুদায় বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু আমরা জড়ের কোন গুণই মনোমধ্যে বর্ত্তমান দেখি না। প্রত্যুত মনের যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা জড় পদার্থের গুণ-নিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়াই পদার্থের নির্ণয় হয়; তদ্ব্যতীত মনুষ্য-হস্তে পদার্থ-নির্ণয়ের অন্যতর উপায় নাই। সুতরাং মনকে জড় পদার্থ বলিয়া স্থির করিতে হইলে, মনের যে সমস্ত গুণ তাহা জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়াও স্থির করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

২। মন যদি জড় পদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে শরীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাইত। কিন্তু শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া কেহ কখন মনোরূপ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

৩। জড়বাদীর মধ্যে এক দল কহেন, যে মন স্বতন্ত্র পদার্থ কিছুই নহে; মানবের মস্তিষ্ক দেশই মানসিক-শক্তি-সম্পন্ন এবং মনের কার্য্য করিয়া থাকে। এই প্রকার জড়বাদীরা মানসিক শক্তি-সমূহকে মন পদার্থের সহিত এক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাহ্য জগতের

* Spirit

জ্ঞান যেন মস্তিষ্ক দেশে উপলব্ধি হইল, মস্তিষ্ক দেশে বাহ্যজগতের জ্ঞানোৎপাদক ইন্দ্রিয়বাহিত যেন কতক গুলি অঙ্কপাত হইল। কিন্তু কে সেই সমস্ত অঙ্কপাতের উপলব্ধি করে? দর্শন-শক্তি দ্বারা মস্তিষ্ক দেশে পুষ্পের যে অঙ্কপাত হয়, সেই অঙ্কপাতই কিছু পুষ্পের জ্ঞান নহে, সেই অঙ্কপাত হইতে পুষ্পের জ্ঞান মনে উপলব্ধি হয়। পুষ্পের জ্ঞান মাত্রে যেন বাহ্যজগতের অঙ্কপাত হয়, কিন্তু সেই পুষ্পকে আমরা যখন গ্রহণ করিবার অভিলাষ করি, তখন কি আর অভিলাষোৎপাদক কোন স্বতন্ত্র অঙ্কপাত সংঘটিত হয়? না যখন সেই পুষ্প গ্রহণ করা উচিত কি না এরূপ বিচার করি, তখন সেই বিচারোৎপাদক কোন স্বতন্ত্র অঙ্কপাত মস্তিষ্কদেশে সমুৎপন্ন হয়? অথবা যখন সেই পুষ্পের একটি পুষ্পময় আধার মনে মনে সৃষ্টি করি, তখন সেই সৃষ্টি-সমুৎপাদক অনুমান মূলীয় কি কোন অঙ্কপাত মস্তিষ্কদেশে সমুদিত হয়? জ্ঞানোৎপাদক অঙ্কপাত হইতে কিরূপে বিচারের অসংখ্য তর্ক জড় মস্তিষ্কদেশ হইতে সমুদিত হইতে পারে তাহা অনুভবই হয় না, জড়মস্তিষ্কের ধর্ম্মাদি বিবেচনা করিলে, বিচারের নানাবিধ তর্কজাল, এবং কল্পনার অগণ্য রচনা কিরূপে তাহা হইতে সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা বোধগম্য হয় না। বাস্তবিক জড় মস্তিষ্কদেশ যে বিচার করিবে, অসংখ্য কল্পনার সৃষ্টি করিবে, ভূতপূর্ব্ব বহুদিনের বিষয় স্মরণ করিয়া আনিয়া তদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিবে, বাহ্যজগৎ হইতে চিন্তাকে অপসৃত করিয়া অনুধ্যান-পরায়ণ হইয়া অন্তরে অন্তরে একটি কাল্পনিক চিন্তা-রাজ্য সৃষ্টি করিবে, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি নানাবিধ অবাস্তবিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত, ও মতামত স্থির করিবে, ইহা জড় মস্তিষ্কদেশের ধর্ম্মাদি বিবেচনা করিলে একেবারে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ডাক্তার এবেরক্রম্বী * তদীয় মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে কতিপয় ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে মস্তিষ্কদেশের অধিকাংশ বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট প্রায় হইলেও মানসিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে না, সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে নিজ মস্তিষ্কদেশ হইতে মানসিক ভাবাদি সমুত্থিত হয় না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখ করেন যাহার শিরোদেশের অর্দ্ধভাগ একবারে পীড়ায় পরিপূর্ণ ও অভিভূত হইয়াছিল, তথাচ তাহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত মানসিক শক্তি নিবহ অব্যাহত ছিল, তাহার কেবল দৃষ্টি মাত্রের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। ডাক্তার ফেরার একটি লোকের বিষয় উল্লেখ করেন, মৃত্যুর পর যাহার মস্তিষ্কের অর্দ্ধদেশ বিনষ্টপ্রায় দৃষ্ট হইয়াছিল অথচ তাহার হঠাৎ মৃত্যুর

* Abercrombie. "On the Intellectual Powers."

পূর্ব্বে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান ও বিবেচনা ছিল। এক জন শীরঃ-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে কালগ্রাসে পতিত হইলে পর ডাক্তার হিবার্ডিন তাহার শিরোদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেন, যে তন্মধ্যে অর্দ্ধ পাউণ্ড বারিপূর্ণ রহিয়াছে। মাষ্টার হেলোরান এক জনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি শিরোদেশে এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন যে তাহার একটি শিরোদেশস্থ অস্থি দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, এবং চিকিৎসার সময় তাহার মস্তিষ্কদেশ হইতে ভূয়ঃ পরিমাণে মস্তিষ্কের গলিত পদার্থ বিনির্গত হইয়াছিল। এই রূপ নিরবচ্ছিন্ন সতের দিন ঘটাতে তাহার মস্তিষ্কের প্রায় অর্দ্ধ ভাগ একেবারে বিনষ্ট ও বিনির্গত হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তি তথাচ বরাবর সজ্ঞান এবং তাহার মানসিক শক্তি বরাবর সম্পূর্ণ ছিল। এমন কি তিনি যতদিন তদ্রূপ অবস্থায় বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য কিছুই বিনষ্ট হইতে দৃষ্ট হয় নাই। আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। কিন্তু এই প্রকার ঘটনা শুনিলে কিরূপ অনুমান করিতে হয়? যাঁহার এ বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মে তিনি বোধ হয় কোন উপযুক্ত হাঁসপাতালের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সদৃশ দৃষ্টান্তের উল্লেখ শুনিতে পাইবেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত নিচয় জড়-বাদীর মতের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। জড়বাদী যদি বলেন আমার মতের অনুকূল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কর দেখিতে পাইবে সে প্রকার দৃষ্টান্তের সংখ্যা থাকিবে না। স্বীকার করিলাম তাঁহার অনুকূল দৃষ্টান্ত অগণ্য। কিন্তু তাহা হইলেই কি তাঁহার প্রতিকূল দৃষ্টান্তের আপত্তি খণ্ডিত হইবে? যত দিন না প্রতিকূল দৃষ্টান্তের আপত্তি খণ্ডিত হইবে, ততদিন জড়বাদীর মত অখণ্ডিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রণালীর গতি এইরূপ।

আমরা এই প্রকার কতিপয় আপত্তির জন্য জড়বাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই আপত্তি নিচয় অভাব-পক্ষীয় * বটে, কিন্তু মত সম্বন্ধীয় তর্কে অভাব-পক্ষীয় আপত্তি ভিন্ন ভাবপক্ষীয় † কিছুই বলা যাইতে পারে না। যেহেতু চিত্তের পদার্থ-সম্বন্ধীয় কোন কথা স্থির নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে মনের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি তৎসমুদায় সম্ভাবনা-মূলক ‡। কারণ এ প্রস্তাবে সম্ভাবনা ব্যতীত, ঔপপত্তিক সাধন-প্রণালী (১) অনুসারে কিছুই বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে কথা এই, মনের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় আমাদিগের বিপক্ষীয় মতও কি সম্ভাবনা-মূলক নহে? এই বিষয় বিচার করিতে হইলে দৃষ্ট হইবে যে আমাদিগের বিপক্ষীয়

---

* Negative. † Positive.

‡ Probable Evidence, see Introducton to Butler's Analogy of Religion.

(1) Demonstrative [illegible]soning.

মতও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা-মূলীয়। তবে দেখিতে হইবে কোন্ পক্ষীয় সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল ও যুক্তির অনুমোদনীয়। এই বিচারে যদি আমরা পরাজিত হই, যদি এমত প্রমাণিত হয় যে, আমাদিগের পক্ষীয় যুক্তি-সমুদায়ের সম্ভাবনা দুর্ব্বলতর, তাহা হইলে মন শরীর হইতে উৎপন্ন নহে, ঈশ্বর তাহাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

মন জড় পদার্থই হউক অথবা স্বতন্ত্র চেতন পদার্থই হউক তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। কারণ, মনকে স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ বলিয়া স্থির করিলেই তাহা হইতে এমত সিদ্ধান্ত হয় না যে সেই মন অবিনশ্বর ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে পারে। যদি সেই মনের ব্যুৎপত্তি কারণ মনুষ্য-দেহ না হয় তবে একদা সেরূপ সিদ্ধান্তের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। নহিলে মন জড় পদার্থই হউক, আর নাই হউক, তাহা হইতে আত্মার পরকালের বিষয় কিছুই মীমাংসা হয় না। কিন্তু অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণ মনকে চেতন পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াই অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে যখন ইহা জড় পদার্থ নহে, যখন ইহা স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ তখন অবশ্য মৃত্যুতে ইহার বিনাশ সাধন হয় না, সুতরাং আত্মার পরকাল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণ জনগণেরও এই মত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে যে একটী ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। যা করিয়া বলিয়া থাকেন মন কি পদার্থ, তাহার উৎপত্তি কি প্রকার এরূপ প্রস্তাব লইয়া অনর্থক ভাবিবার এবং জল্পনা করিবার ফল কি? কিন্তু এই বিষয়ের উপর আত্মার পরকালের ন্যায় যে একটী প্রধান সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণের একটী প্রধান মূল বিশ্বাস, নির্ভর করিতেছে তাহা তাঁহারা একবারও মনে ভাবিয়া দেখেন না। ভাবিয়া দেখিবেন কি সেই মূল বিশ্বাসকে তাঁহারা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য কি না তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

তবে মনের উৎপত্তি বিষয়ক প্রস্তাব কখনই নিষ্ফল নহে। মন, দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহা দেহ-বিনাশের সহিত যে লয় প্রাপ্ত হইবে ইহাও নিশ্চয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কারণ দেহ-রূপ জড়পদার্থের সম্মিলন ও পরিণতিতে যাহার উৎপত্তি সেই সম্মিলন ও পরিণতি ভঙ্গে তাহার বিনাশ অনিবার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে কারণে মন সম্ভূত হইল সে কারণ বিরহে যে মন বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে।

তথাপি মানবের বড় ইচ্ছা মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। তাঁহার কল্পনা ও আশা পরলোকের বৈকুণ্ঠধামকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। তিনি ইহলোকের শোক

সন্তাপ পরলোকে গিয়া দূরীকরণ করিবেন বলিয়া কতই সহিষ্ণুতার সহিত পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অকাতরে বহন করিতেছেন। কেহ বা পরলোকের কাল্পনিক সুখে এত প্রমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন যে ইহ লোকের কোন সুখই তাঁহার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সমুদায় পার্থিব সুখকে অবহেলা করিয়া পরকালের কাল্পনিক সুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। পূর্ব্বকালের যোগী ও ঋষিগণ এই জন্য সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সুখ তাঁহাদিগের নিকট কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরলোকের আশা-রঞ্জিত মনোহর সুখময় দেশ তাঁহাদিগের কল্পনার চক্ষে এত উজ্জ্বলবর্ণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাঁহারা সংসারের সকল বাস্তবিক সুখকে হেয় জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কিছু মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু সেই অলীক মহত্ত্বের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া তাঁহাদিগেরই অনুসারী হইতে প্রবৃত্ত হইতে গিয়াছেন। তাহাতে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। যে দিন হইতে এই সাংসারিক ঔদাসীন্যের ভাব পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইআছে, সেই দিন অবধি পৃথিবীর অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ, যে মানব পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, যে মানব পৃথিবীকেই বৈকুণ্ঠধাম ও ইন্দ্রালয় করিতে পারেন, সেই মানব সেই পৃথিবীর প্রতি উদাসীন! ভারতে এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যের উপদেশে ইহার কতই না সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! আমরা ধার্ম্মিক ও সাধুজনের সহিষ্ণুতার মহত্ত্ব ভাবিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু তাহার বৈরাগ্যভাবকে আমরা কিছুমাত্র প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি সে বৈরাগ্য লইয়া বনবাসী হউন। তিনি সংসারে থাকিবার উপযুক্ত নহেন। তিনি যেমন সংসার ধামকে হেয় জ্ঞান করিয়াছেন, সংসারও তাহাকে হেয় জ্ঞান করিয়া বনবাসে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার দ্বারা সংসারের কিছুই মঙ্গল সাধিত হইবে না। বরং তাঁহার উপদেশে অনেক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

তথাপি মানবের বড় ইচ্ছা মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। তাঁহার এই ইচ্ছা এত বলবতী, যে তিনি তজ্জন্য সকল যুক্তিপথও পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার এই ইচ্ছা এত বলবতী যে ইহার প্রতিকূলে যত কেন তর্ক উত্থাপিত কর না, সে সমুদায় তিনি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি কহিবেন তুমি তোমার তর্ক লইয়া থাক, আমি আমার অন্ধ বিশ্বাস লইয়া স্বর্গে যাইতে চাহি; অতএব আমি তোমার মত গ্রহণ করিব না। তুমি কি আমাকে নীচ পশুপক্ষীর পদবীতে অবনত করিতে

চাহ; তবে আর আমি শ্রেষ্ঠতম জীব বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিব? জান না, আমি পৃথিবীর প্রভু, বুদ্ধিশীল জীব, আমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন জীবাত্মার কখন পৃথিবীতেই শেষ হইতে পারে না, ইহা পরমাত্মার ছায়া স্বরূপ, পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

মানবের এই রূপ ইচ্ছা, যে মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। মানব এত আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, এত আত্মাভিমানী, যে তাহার নিকট সমগ্র জীবমণ্ডলী পরলোকবাসী হইবার উপযুক্ত বোধ হয় না, তিনিই কেবল একাকী সেই অমূল্য অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত জীব। তিনি এই আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া অপর সকল প্রাণীকে নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করেন। জানেন না, তিনি যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকৌশলের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্ট ও নিযুক্ত আছেন, অপরাপর প্রাণিগণও তদ্রূপ। সৃষ্টির মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, কে নিকৃষ্ট কে বলিতে পারে? তিনিই একাকী পরলোকবাসী হইবেন, আর কোন প্রাণীই সে অধিকার লাভের উপযুক্ত নহে, এ বড় আশ্চর্য্য মত, এ বড় আশ্চর্য্য আত্মগৌরব।

তথাপি মানব সাধারণের সহিত, আমাদিগেরও ইচ্ছা, আমরা চিরকাল জীবিত থাকি। কে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কালকবলে পতিত হইয়া বিনষ্ট ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে চাহে? আমাদিগেরও ইচ্ছা হয়. আমরা পরলোক হইতে পরলোকে উত্থিত হই, ইহলোকের সুখসম্ভোগ করিয়া আবার পরলোকের সুখসম্ভোগ করি, এবং অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াই। কিন্তু হায়! ঐ যে আমাদিগের আত্মঘাতী বুদ্ধি ও তর্কজাল উপস্থিত হইয়া সকল স্বপ্ন বিনষ্ট করিতে চাহে। ঐ যে তর্কজালের কুজ্ঝটিকা উদিত হইয়া আত্মার গগনদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কে এমন বন্ধু আছে, আমাদিগকে এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেন, আমরা সুবর্ণময় উজ্জ্বল পরলোক ধামকে একবার আনন্দ নয়নে অবলোকন করি। তিনিই আমাদিগের পরম বন্ধু, যিনি আমাদিগকে পরলোক সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার সহিত সমযাত্রী হইয়া আমরা মৃত্যুর ভয়ঙ্কর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইতে চাহি। হায়, আমরা এমত বন্ধু কি লাভ করিব? যদি লাভ করিতে পারি, তাঁহাকে আমরা নমস্য বন্ধু বলিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়া চিরসুখী হইব।

শ্রীপূ—

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

অবতারণিকা।

খ্রীষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে ভারতবক্ষঃ যেরূপ ভয়াবহ শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়, তাহা অতীত-সাক্ষী ইতিহাস-হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। স্মৃতি সেই লোমহর্ষণ ঘটনা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অদ্যাপি সহৃদয়গণের সমক্ষে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। অনন্তকালের এই শোণিতময়ী ঘটনা শোণিতাক্ষরে ইতিহাস-পটে বিরাজমান থাকিবে এবং স্মৃতিও অনন্তকালে ইহা লইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিবে। ভারতক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজত্বের অবসান হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দীর অদম্য ব্রিটীষ সিংহের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়াও যেরূপ ভয়ঙ্কর অভিনয়ের বিলাস-ভূমি হইয়াছিল, সেরূপ ভীষণ অভিনয়ের শোণিত-রঞ্জিত যবনিকা উক্ত ত্রিবিধ রাজত্বে কখনও উত্তোলিত হয় নাই। আমরা অদ্য বঙ্গীয় ভাষায় সেই লোমহর্ষণ ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে যাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমরা তদনুসারেই স্বীয় মত উপন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব, বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ঘটনা-চিত্রকে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত করিয়া পাঠকবর্গের বিরাগ উৎপাদন করিব না।

কোন ঘটনা-বিশেষের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে আদৌ তদুদ্ভব-কারণ-নিচয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই চিরাভ্যস্ত রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক প্রথমে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য সামরিক ঘটনার অবতারণিকা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১১৫ শুঃ অব্দ

উষ্ণকোটী বঙ্গের প্রখর মার্ত্তণ্ডের কিরণ তলে আট বৎসর কাল সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের দুর্ব্বহভার বহন করিয়া লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৬ অব্দে ইংলণ্ডের শীতল-সমীর-সেবী হয়েন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যুগান্তর পরিবর্ত্তিত হয়। লর্ড ওয়েলেস্লির শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই ভারতবর্ষ ব্যবস্থা-চক্রে এত ঘূর্ণায়মান হয় নাই। রণক্ষেত্রের করাল সংহারমূর্ত্তি ও শান্তির অমৃত-রস-বর্ষিণী বিমল ছবি উভয়ই এই সময়ে ভারতবর্ষকে শঙ্কা ও আনন্দের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল। এক দিকে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহকে যেরূপ পরস্পরের ক্রোড়স্থ করিয়া তুলিতেছিল, অপর দিকে সেইরূপ কুটিল রাজনীতি হস্ত প্রসারণ করিয়া

ভারতীয় মানচিত্রে স্বাধীন রাজ্য সমূহের অবস্থান সন্নিবেশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেছিল। লর্ড ডেলহৌসীর সময়ে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যে ব্রিটীষ-সিংহলাঞ্ছিত পতাকা উড্‌ডীন হয়। তন্মধ্যে প্রথম বিজিত পঞ্জাব ও অযোধ্যার সহিত বর্ণনীয় বিদ্রোহ ঘটনার কতিপয় কারণ অনুস্যূত করিয়াছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া লর্ড ডেলহৌসী এই দুই রাজ্য পররাষ্ট্র-শ্রেণীতে নিবেশিত দেখেন, এবং ভারত পরিত্যাগের সময় উহা স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া গমন করেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দ মুদকি ও ফিরোজ সা প্রভৃতি সমরক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদিগের পরাজয় সাধন করেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের সাম্রাজ্য স্বাধীনতার বহিশ্চর হয় নাই। হার্ডিঞ্জ শিখ-প্রধান দিগকে একটী সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ রণজিৎ-বিজিত রাজ্য স্বাধীন অবস্থায় রাখেন। ৯ই মার্চ্চ মিয়নমির-ক্ষেত্রে এই সন্ধি নির্দ্ধারিত হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট সৎলজের দক্ষিণবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব গ্রহণ করেন। যে সমস্ত খালসা সৈন্য ব্রিটিষ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা ন্যূনতর করিয়া ২০,০০০ পদাতিক ও ১২০০০ অশ্বারোহীতে পরিণত করা হয়। এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড়কোটী টাকা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব-বিচক্ষণতা নিবন্ধন তদীয় কোষাগারে ১২ কোটী টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে অমাত্যদিগের পাপাচার বশতঃ উহা ব্যয়িত হইয়া অর্দ্ধকোটী মাত্র অবশিষ্ট থাকে। হার্ডিঞ্জ এই অর্দ্ধকোটী গ্রহণ করিয়া অপর কোটীর নিমিত্ত কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র রাজা গোলাপ সিংহ এই সময়ে জম্মুর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কোটী মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কাশ্মীর প্রদেশ হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই সন্ধির সময়ে দলীপ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজ্যশাসনোপযোগী বয়ঃক্রমের অধিকারী হইতে তাঁহার আরও আট বৎসর বাকি ছিল, এই আট বৎসর কাল প্রতিনিধি প্রণালী দ্বারা পঞ্জাব শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, এবং উক্ত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত প্রতিনিধি-সমিতিতে হেনরী লরেন্স, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট নিয়োজিত হয়েন।

রাজনীতি-প্রয়োগ-কুশল অমাত্যব্যূহে সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রতিনিধি-সমিতি সংগঠিত হয় নাই। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে পঞ্জাবে একজন দ্বিতীয় রণজিৎ সিংহের বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু জগতের নিয়তি অনুসারে পঞ্জাব-ক্ষেত্রে আর তাদৃশ মহামনস্বী ব্যক্তি

প্রস্তুত হয় নাই। এক্ষণে পঞ্জাবে কেহই রাজনীতি-প্রয়োগ কুশল ছিলেন না, কেহই সুশাসন-ক্ষম বলিয়া অপরের নিকট প্রশংসা লাভ করেন নাই। ভীষণ ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেরূপ শান্ত-ভাব ধারণ করে, পঞ্জাবও সেই রূপ বর্ত্তমান সময়ে আপাতরমণীয় শান্তির ক্রোড়ে লালিত হইতেছিল। দলীপ-জননী ঝিন্দন * এই সময়ে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। ভারতবর্ষ নারী-জাতির শাসন-ঘটনার বহিশ্চর নহে। ইতিহাস-পট উদ্ঘাটন করিলে ভারতীয় মহিলাতেও প্রগাঢ় রাজ-নীতিজ্ঞোচিত গুণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু রণজিৎ-রমণী ঝিন্দন এই উপাদানে নির্ম্মিত হয়েন নাই। ঝিন্দন নারী--জাতি-সুলভ স্নেহ কোমলতা প্রভৃতি ধর্ম্মে সমলঙ্কৃত থাকিলেও মানসিক উচ্চতায় নিতান্ত খর্ব্ব ছিলেন। নারী চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী, বাল্য হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নারী-হৃদয় নিয়তই প্রীতিরসে পরিপ্লুত থাকে। তরুণ- রাগ-বিভাষিত প্রাভাতিক লক্ষ্মী এবং দিবস-পরিণাম-সম্ভূত সায়ন্তন শ্রী উভয়ই চিরদিন রমণী-প্রকৃতির শোভা বিধান করে, ঈদৃশ প্রীতিময় রমণী-হৃদয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিলাস-ভূমি। ঝিন্দনের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিলাস-ভূমিতে নারী-জাতি-সুলভ সহজবশ্যতা-বীজ দিন দিন অঙ্কুরিত হইতেছিল। এতন্নিবন্ধন এক জন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার অসামান্য প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। অধিক কি, ঝিন্দন পরিশেষে এই প্রিয়পাত্রকেই রাজ্যের প্রধান অমাত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন।

রাজা লাল সিংহ কোনও অমাত্যোচিত গুণেরঅধিকারী ছিলেন না। তিনি দরবার গৃহে যেরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন ছিলেন, রাজ্যের প্রকৃতি-সমষ্টির মধ্যেও সেইরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। নীচ এবং অপ্রথিত বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া লাল সিংহ উচ্চতম সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্য তাঁহাকে মানবস্পৃহণীয় গুণ-সমূহে সমলঙ্কৃত করিতে পারে নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহ-যষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইল চিত্তের উদারতা সাধন করিতে পারে নাই, সুশাসন-ক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসৃত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই। রণ নিপুণতা কেবল স্বীয় তোষামোদ প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই অভিব্যক্ত হইত, উহা সমরক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যগণের উৎসাহ-পোষিণী হয় নাই। ফলে লাল সিংহ শিখ-সমিতিতে উৎপাত-কেতু স্বরূপ ছিলেন। তিনি কেবল স্বীয় ক্ষণ-বিধ্বংসি দেহ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া চঞ্চলমতি ঝিন্দনের হৃদয় আকর্ষণ

* পুস্তক বিশেষে ইঁহার নাম চন্দ্রা বলিয়াও লিখিত আছে।

করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি-হৃদয় আকর্ষণ করিতে তাঁহার কোনও গুণ ছিল না। এই রূপ ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণমনা ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তির হস্তে প্রথম শিখ যুদ্ধের পর পঞ্জাব রাজ্যের শাসন ভার সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল এই অন্তঃসার-শূন্য ব্যক্তির ক্রীড়ণক হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির নিয়মানুসারে গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, এই সময়ে সেখ ইমাম উদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান-শ্রেষ্ঠের হস্তে কাশ্মীরের শাসন-ভার সমর্পিত ছিল। লাল সিংহ ইমাম উদ্দীনের সহিত ইংরেজ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাশ্মীর প্রদেশে গোলাপ সিংহের গতিরোধ করেন। ইমাম উদ্দীন লাল সিংহের কর-ধৃত সূত্রে ক্রীড়া-পুত্তলবৎ চালিত হইয়া গোলাপ সিংহকে কাশ্মীরের শাসন-ভার দিতে অসম্মত হইলেও অধিক কাল উহার সহিত রণজিৎ রাজ্যের সংস্রব রহিল না। হেন্‌রী লরেনস্‌ কোন কার্য্যই অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ইমাম উদ্দীনের অসম্মতি দেখিয়া দশ সহস্র শিখ ও কতিপয় ব্রিটীশ সৈন্য সমভিব্যাহারে শিশির-সঞ্চিত বরফ-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। অবাধ্য ইমাম উদ্দীন ইংরেজ সেনাপতির বিক্রম দর্শনে বিনম্র হইলেন, এবং আত্মরক্ষার, নিমিত্ত প্রধান অমাত্য, গোলাপ সিংহের গতি রোধের নিমিত্ত যে অনুজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হেন্‌রি লরেন্‌সের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। লালসিংহের এই শাত্রব ভাব ব্রিটীষ রেসিডেণ্টের সহনীয় হইল না। অচিরাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতার বিচারার্থ ইউরোপীয় রাজপুরুষ ও শিখ সর্দ্দার হইতে সুদক্ষ লোক নির্ব্বাচিত হইয়া একটী মিশ্র কমিশর্ন সংস্থাপিত হইল। বিচারে লাল সিংহ পেন্‌সন্‌গ্রাহী হইয়া আগ্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন। রাণী ঝিন্দনের অনর্গল অশ্রুধারা কিছুতেই এই নির্ব্বাসন-দণ্ডাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। লাল সিংহ ডিসেম্বর মাসে আগ্রায় প্রেরিত হইয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন। আর তাঁহার সহিত পঞ্জাব বা প্রিয় পাত্রী ঝিন্দনের কোনও সংস্রব রহিল না। এইরূপে লাল সিংহের অধঃপতন হইল, এবং এই রূপেই ব্রিটীষ সিংহের প্রতি তাঁহার আশা-বারি-সিঞ্চিত প্রথম ও শেষ বিশ্বাসঘাতকতা-তরু অঙ্কুরাবস্থায় বিলয় পাইল।

রাজা লাল সিংহের অধঃপতন হইলে রাজ্য রক্ষার্থ পুনর্ব্বার অমাত্য-সমিতি সংগঠিত হইল। ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট এই শাসন-সম্বন্ধিনী সভার শীর্ষস্থানীয় হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাহুবল-জিত বিস্তৃত রাজ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে, এই নিমিত্তই হার্ডিঞ্জ বর্ত্তমান নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন। হার্ডিঞ্জ শিখ জাতির অদম্য চঞ্চল হৃদয় অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এক জন দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ রাজনীতিকুশল ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসন ভার অর্পিত না হইলে উত্তর কাল কখনও শুভাবহ হইবে না। এতন্নিবন্ধনই প্রধান অমাত্যের পরিবর্ত্তে এই রূপ শাসন-পদ্ধতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। সুতরাং এক্ষণে হেনরি লরেন্সই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পঞ্জাবের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোগ্য পাত্রে এই গুরুতর ভার সমর্পণ করেন নাই। যোদ্ধৃজনোচিত বীরতা ও রাজনীতি-জ্ঞোচিত দক্ষতা উভয়বিধ গুণই লরেন্সকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল। যে তেজস্বিতা নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে আশ্রয় করিয়া আপনার বিশ্বগ্রাসিনী লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক জগতের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল, সে সর্ব্বসংহারিণী তেজস্বিতা হেনরী লরেন্সে উপগত হয়-নাই, তথাপি তাঁহার তেজ সকলের অনভিভবনীয় ও অসহনীয় ছিল। শত্রুগণ রণস্থলে তাঁহার সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ বিত্রস্ত হইত, অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে বালস্বভাবসুলভ কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতি-বিমুগ্ধ হইত। ফলে হেনরি লরেন্স তেজস্বিতা ও কোমলতা উভয়েরই বিলাসভূমি ছিলেন, উভয়েই পটীয়সী নর্ম্মসখীর ন্যায় তাঁহার জীবন-সহচরী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৪৭ খৃঃঅব্দ সৌভাগ্য ক্রমে ঈদৃশ অনলস প্রকৃতি কার্য্যপ্রবণ ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসন-ভার সমর্পিত হয়। হেনরী লরেন্স নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া এই গুরুতর কার্য্য-ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শাসন-শৃঙ্খলায় পঞ্জাব পুনর্ব্বার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে নবীন-নীরদ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গগন-তল পরিব্যাপ্ত করিতেছিল, ভীম প্রভঞ্জন বলে তাহা সমূলে বিধ্বংস্ত হইল। বসন্ত সমাগমে বাসন্তী লক্ষ্মীর ন্যায় পঞ্জাবহৃদয় পুনর্ব্বার প্রীতি ও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া উঠিল। পঞ্জাব এইরূপ সুখ ও শান্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া ১৮৪৭ অব্দের বসন্তকাল অতিবাহন করে। যে সমস্ত চঞ্চল-প্রকৃতি খাল্‌সা সৈন্য এক সময়ে ভীষণ রণোন্মাদে মত্ত হইয়া পঞ্জাব ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলেই ব্রিটীষ সিংহের অদম্য তেজ ও শাসন-শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া জীবনের শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। জুন মাসে রেসিডেণ্ট রিপোর্ট করিলেন, নিরস্ত্র খাল্‌সা সৈন্যের অধিকাংশ ভাগ শান্তভাবে ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের ভীতি-স্থল ছিল, কৃষাণ-জনোচিত-সরলতা ও নিরীহতা এক্ষণে উত্তরোত্তর তাহাদিগকে বিভূষিত করিতেছে। যদিও রেসিডেণ্ট এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পঞ্জাবের তথাবিধ আপাতরমণীয়তা দেখিয়া একবারে

বিমুগ্ধ ও কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও পঞ্জাব এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তথাপি নির্ব্বাণাবশেষ দুই একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী রেসিডেণ্ট এই ক্ষীণপ্রাণ স্ফুলিঙ্গের পরিণাম-দাহকতা বুঝিতে পারিলেন, এবং কাল বিলম্ব না করিয়া একবারে তাহার নির্ব্বাণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

রাণী ঝিন্দন তেজোবত্তা বিষয়ে মহিলাগণের গৌরবস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পর-পদানত হইয়াছে, পর-জাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। ঝিন্দন বুঝিতে পারিলেন, ব্রিটীষ সিংহ ইহার মধ্যেই যেরূপ বর্দ্ধিত-বিক্রম হইয়া পঞ্জাবের প্রতি ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে সমস্ত পঞ্জাব অচিরাৎ তাহার উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা। বুঝিলেন, ব্রিটীষ জাতি ইহার মধ্যেই এই সম্ভাবনা অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার প্রিয় পাত্রকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছে—প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে করসূত্র-ধৃত ক্রীড়া পুত্তলবৎ যথেচ্ছ নর্ত্তিত করিতেছে; বিদেশীয় এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকার-প্রিয়তা তেজস্বিনীর হৃদয় প্রতিহত করিতে লাগিল। ঝিন্দন আর ধীরতার সীমা অক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না। দুর্নিবার দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া অতঃপর ঝিন্দন ইংরেজদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এই অপমান-বিষে কালীময় হইতে উঠিল।

রেসিডেণ্ট এই তেজস্বিনী অঙ্গনার মর্ম্মগত তেজ নিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে অগ্নি অস্থিতে অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসৃত হইয়া হৃদয়কে সুর্ম্মূল দহনে দগ্ধ করে দুই এক বিন্দু বারি প্রক্ষেপে সে অগ্নির গতি রোধ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, সুখ দুঃখের সহচর আত্মীয় জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে নির্জ্জন গৃহে সে অগ্নির আধার সংরক্ষণই ভবিষ্য অমঙ্গল নিবারণের অমোঘ উপায়। রেসিডেণ্ট অবশেষে এই উপায় অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বিনা আইনে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া ঝিন্দনের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইল। তদীয় ভ্রাতা এই দণ্ডাজ্ঞা বহন করিয়া রাজ-বিলাস-ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঝিন্দন অবনত মস্তকে এই গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিলেন, দুঃসহ মনোযাতনা-প্রকাশক কোনও স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না। অটলভাবে অটলচিত্তে এই তেজস্বিনী বীরজায়া স্বীয় ভবিষ্য জীবনের অতিবাহন ভূমি কারা-গৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমান অধিবাসিপরিবেষ্টিত সেথপুর নামক নির্জ্জন স্থানে ঝিন্দনের আবাস-গৃহ নিরূপিত হইয়াছিল। ঝিন্দন

অতঃপর রাজলক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই কদর্য্য স্থানে কদর্য্য গৃহে কারারুদ্ধ হইলেন। বিধাতা যদিও ঝিন্দনকে অঙ্গনা-জনোচিত কোমল উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনোগত স্থিরতা নিরবচ্ছিন্ন কোমলতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। ঝিন্দন লাবণ্যলীলাময়ী ললনা হইয়াও দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীমগুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। যে বিকার ক্লিওপেত্রাতে সংক্রান্ত হইয়া হৃদয়গ্রন্থি-শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল, সে বিকার ঝিন্দনে উপগত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হয় নাই। ঝিন্দনের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ অটলতায় পূর্ণ ছিল; এই গুরুতর বিপৎপাতে তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটলতা স্খলিত হইল না, হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়. ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বৈদেশিক নেত্রে তাঁহার চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার চরিত্র চিত্র যতই কালি-ময় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই অটলতার ও স্থির-হৃদয়তার জন্য নারীসমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

এইরূপে ঝিন্দন রাজপদ ও রাজসম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মের মত কারাবাসিনী হইলেন। রাজবনিতা ও রাজমাতার ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম ইতিহাস-হৃদয় কালীময় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা হেন্‌রী লরেনসের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত পরিচিত আছেন, ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন-বিধি তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্মিত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় ইতিহাস-রচয়িতৃগণ লিখিয়াছেন, ঝিন্দন রেসিডেণ্টের জীবন সংহারের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ মিশ্র কমিশনে রাজা লালসিংহের বিষয় বিচারিত হইয়া দণ্ড প্রয়োজিত হইয়াছিল, ঝিন্দনের অপরাধ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন বিচার-কার্য্য যথাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসলেখকগণ ভবিষ্য জগৎকে জানাইতে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই তুষ্ণীম্ভাব জগৎকে জানাইতেছে, ব্রিটীষ্‌ রেসিডেণ্ট্‌ বিনাবিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দলীপজননী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এস্থলে সন্দেহই মন্ত্রী ও সন্দেহই শাস্তা হইয়াছিল। যে কল্পনা এইরূপ সন্দেহের ক্রোড়ে লালিত হইয়া গরলময় ফল প্রসব করে, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত কি না, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এস্থলে কেবল ইহাই

বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি, সূক্ষ্ম বিচারে দোষ সপ্রমাণ করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধানই সভ্য জগতের রীতি। হেন্‌রি লরেন্স সভ্য-দেশ-প্রসূত হইয়া এই সভ্য রীতির বহিশ্চর হওয়াতে যে ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

১৮৪৮ খৃঃঅব্দ

রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সহিত পঞ্জাবের সমুদয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। এইরূপে বিনা গোলযোগে, বিনা উদ্বেগে শরৎকাল পঞ্জাবে উপস্থিত ও বিগত হয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবে শাসন-সমিতির অধিনায়কেরও পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে। হেন্‌রি লরেন্স কয়েক বৎসর কাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিবাস করিয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে তিনি সিমলা-শৈল-বিহারী হয়েন। স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু ভিষক্‌গণ তাঁহাকে এদেশে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের শীতল-সমীর-সেবী হইতে পরামর্শ দেন। হেন্‌রি লরেন্স এই পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হয়েন। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড ডেল্‌হৌসীর হস্তে ভারত-সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশাভিমুখ হয়েন, এদিকে হেন্‌রি লরেন্সও সার্ হেন্‌রি কারি নামক এক জন উচ্চতর সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের হস্তে পঞ্জাবের শাসন ভার অর্পণ করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। সুতরাং যুগপৎ, ভারত সাম্রাজ্য লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিবর্ত্তে লর্ড ডেলহৌসীর এবং পঞ্জাবরাজ্য সার হেন্‌রি লরেন্সের পরিবর্ত্তে সার্ হেন্‌রি কারির বশ্যতা স্বীকার করে।

এই রূপে অধিনায়কের পরিবর্ত্ত হওয়াতেও আপাততঃ কোন গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। নূতন বর্ষ প্রসন্ন ভাবে পঞ্জাবকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দশা-বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পঞ্জাবে কোন গোলযোগ না থাকিলেও সমীরণভরে প্রদেশান্তর হইতে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া বিষম স্থূল স্থূল ব্যাপার সংঘটিত করিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ মুলতান জয় করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য দৃঢ়তর করেন। তদানীন্তন সময় হইতে এক এক জন দেওয়ান লাহোর দরবারের অধীন হইয়া মুলতানের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৪ অব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা সোয়ানমল্ল এক জন ঘাতকের হস্তে নিহত হয়েন। পিতৃহত্যার পর তদীয় পুত্র মুলরাজ মুলতানের দেওয়ান-পদ অধিকার করেন। লাহোর দরবারের তদানীন্তন মন্ত্রী লাল সিংহ মুলরাজের কোষাগার পূর্ণ মনে ভাবিয়া তাঁহার নিকট দেওয়ানী পদ গ্রহণের নজরানা স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রা-

র্থনা করেন। মুলরাজ প্রথমে এই টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ প্রদানের প্রস্তাব হয়। মুলরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ নিবন্ধন লাহোর দরবার বিব্রত হইয়া পড়াতে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হয় নাই।

মিয়নমিয়রের সন্ধির পর শিখরাজ্য শান্তি-প্রবণ হইলে লাহোর দরবার মুলরাজের নিকট পূর্ব্ব প্রাপ্য কয় লক্ষ টাকা ও বকেয়া স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু অংশ প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার পূরণ না হইলে মুলরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে ইহাও বলিয়া পাঠান হয়। মুলরাজ লাহোর দরবারের দাবি পূরণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। মুলরাজ শঙ্কান্বিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়গ্রাহী হয়েন, এবং রেসিডেণ্ট দ্বারা প্রস্তাবিত গোলযোগের মীমাংসা করিতে ১৮৪৬ অব্দের শরৎকালে লাহোর গমন করেন। লাহোরের মীমাংসায় মুলরাজ নির্দ্দিষ্ট নজরানা দিতে বাধ্য হয়েন, ইহার নিমিত্ত তাঁহার স্বত্ব ভুক্ত ভূমির কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া অবশেষ নির্দ্দিষ্ট হারে ইজারা দেওয়া হয়। মুলরাজ উপস্থিত সময়ে এই মীমাংসার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন না, প্রত্যুত সন্তোষ সহকারে মুলতান প্রতিগমন করিলেন।

মুলতানে প্রত্যাগত হইয়া মুলরাজ এক বৎসরকাল শান্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। দুঃসহ মনোবিকার সম্ভূত কোন গূঢ় চক্র তাঁহা হইতে উদ্ভাবিত হইল না। এই আপাত শান্তিপ্রিয়তা দর্শনে বোধ হইল, লাহোর ও মুলতানঘটিত অন্তর্নিগূঢ় বিবাদ বহ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, ইহা হইতে আর কোন স্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া ভবিষ্য শান্তির উন্মূলন করিবে না। কিন্তু মুলরাজ যে সন্তোষের ক্রোড়ে লালিত হইতেছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না। একবৎসরকাল মধ্যেই লাহোর দরবারকৃত মীমাংসা তাঁহার নিতান্ত মর্ম্মপীড়ক হইয়া উঠিল। এই অসহনীয় যাতনা হইতে মুক্ত লাভের আশয়ে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগের বাসনা করিয়া ১৮৪৭ অব্দে পুনর্ব্বার লাহোর গমন করিলেন, কিন্তু তথায় অভীষ্ট লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিলেন না; সুতরাং মুলতানে প্রত্যাগত হইয়া একখানি পদত্যাগ পত্র লাহের দরবারে যথা রীতি প্রেরণ করিলেন, দরবার মুলরাজের পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সর্দ্দার খান সিংহ নামক এক জন সুদক্ষ যুদ্ধবীর ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে দেওয়ানী পদে নিযোজিত করিয়া মুলতানে পাঠাইলেন। সর্দ্দার খানকে রাজ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভান্‌স আগ্‌নু নামক জনৈক সিভিল কর্ম্মচারী এবং বোম্বাই সৈন্য দলের লেফ্‌নেণ্ট অণ্ডারসন পাঁচ শত সৈন্য সহিত

তৎ-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

সর্দ্দার খান এই দলবল লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে মুলরাজ কোন বিরাগের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না, প্রত্যুত ধীরভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, দুইদল গুরুখা সৈন্য ও কিয়ৎসংখ্যক অশ্বারোহী দুর্গের অন্যতম দ্বার রক্ষা করিতেছিল, মুলরাজ যথানিয়মে নবনিয়োজিত দেওয়ানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ইহার পর সর্দ্দারখান ও তৎসমভিব্যাহারিগণ যখন দুর্গ হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ ব্রিটীষ কর্ম্মকারিগণ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। মুলরাজ এই আক্রমণ নিবারণে যত্নবান্ হইলেন না, প্রত্যুত অশ্বারোহণে দ্রুত গতিতে তাঁহার উদ্যান বিলাস ভবনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে সর্দ্দার খান ও অধীনস্থ গুরুখা সৈন্যগণ আহত ব্রিটীষ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের বাসভবনে আনয়ন করিলেন।

পরদিন সমস্ত মুলতান প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইল। মুলরাজ এক্ষণে আর আত্ম-সংগোপন না করিয়া প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ফিরিঙ্গী বিনাশ ও ফিরীঙ্গী রাজ্য ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাত্রির প্রাক্কালে বিদ্রোহিগণ দলবদ্ধ হইয়া আহত আগ্নু ও আণ্ডার্সনের আবাস গৃহ অবরোধ করিল। নিরাশ্রয় নিঃসহায় কর্ম্মচারিদ্বয় অটল ভাবে স্বীয় দশা-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন—আহত হইয়া অটল ভাবে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় জীবনের শেষ সীমা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে বিদ্রোহিদিগের সংখ্যার আধিক্য নিবন্ধন তাঁহাদিগের বীর্য্য বিলুপ্ত হইল, বিদ্রোহিগণ দলে দলে আসিয়া ক্ষতদেহ আগ্নু ও আণ্ডার্সনকে বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল, ব্রিটীষ-কর্ম্মচারি-যুগল আর আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া শান্তভাবে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেন। এইরূপে ব্রিটীষ শোণিত মুলতান হৃদয় উক্ষিত করিল, এবং এইরূপে মুলতানবাসী বিদ্রোহিদিগের ক্রোধানল উপশান্ত হইল।

এই ঘটনার পর মুলরাজ স্বীয় পলায়িত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। প্রকৃতবীর্য্যবত্তা ও রণোন্মাদ তাঁহাকে এক্ষণে অধীর-প্রকৃতি করিয়া তুলিল। তিনি ব্যূহ-রচনা-কুশল সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত হইলেন, কিরূপে রণবিশারদ ব্রিটীষ সৈন্যের সম্মুখীন হইবেন—কিরূপে তাহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এই চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন। বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা তাঁহাকে ভীরুতার বিনিময়ে সাহসিকতায়, ধীরতার বিনিময়ে রণদক্ষতায় এবং নিরীহতার বিনিময়ে যত্নপরতায় সমলঙ্কৃত করিল।

এক্ষণে তিনি স্বীয় অদৃষ্টের নিকট মস্তক নত করিলেন, এবং বৈদেশিক সেনার অধিনায়ক হইয়া প্রকৃত বন্দীবের পদে সমাসীন হইলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। আদৌ ইহা স্থানীয় ঘটনা হইতে সমুদ্ভূত হয়। লাহোর-দরবার বা সংসৃষ্ট শিখ অধিনায়কদিগের সহিত প্রথমে ইহার কোনও সম্বন্ধ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে সংক্রামক রোগের ন্যায় এই বিবাদ বহ্নি সমস্ত পঞ্জাবে প্রসৃত হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুলরাজের অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এই বিবাদ হইতে কিরূপ ফল প্রসূত হইয়া পঞ্জাব ক্ষেত্রে রণজিৎ-রাজবংশের অবসান হয়, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

ক্রমশঃ শ্রীর।

কপালকুণ্ডলা।

মালতীমাধবের পাঠক মাত্রেরই নিকট কপালকুণ্ডলার নাম অপরিচিত নাই। কিন্তু মালতীমাধব পাঠকের কপালকুণ্ডলার স্মৃতি অত্যল্পই হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে। আজি কালি কপালকুণ্ডলা বলিলে আর মালতী মাধবের ভৈরবীকে মনে পড়ে না। সে কপালকুণ্ডলাকে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে আর এক কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনোমন্দির অধিকার করিয়াছে। তাহা বঙ্কিমবাবুর সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখন কপালকুণ্ডলার নাম করিবামাত্র এক বনবাসিনী, বন্য, আলুলায়িত-কুণ্ডলা, প্রকৃতি-মধুরা, সরলা ষোড়শীকে মনে পড়ে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উদাত্ত ভাব মনে সঞ্চারিত হয়। প্রকাণ্ড বন, সমুদ্রতট, ভীষণ কাপালিক, স্থির সংকল্প নবকুমার সকলই একে একে মনে সমুদিত হইতে থাকে। মনে মনে এখন যে সমস্ত উদাত্ত ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহারই পর্য্যালোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ প্রস্তাবে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের ঠিক সমালোচনা করিতে চাহি না, কিন্তু সেই গ্রন্থ মধ্যে তিনি যে বিশাল ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত রমণীয় এবং ভীষণ সুন্দর দৃশ্যে তাহা পরিশোভিত করিয়াছেন, তাহারই সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ক্ষেত্রকে এরূপ বিদূর-শোভনীয় প্রকাণ্ড দৃশ্যনিচয়ে শোভিত করিতে গিয়া কবি যেমন তাহাদিগের গাম্ভীর্য্য এবং উদাত্তভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন,

তাহাদিগের প্রকাণ্ডতার গৌরব, দূর শোভনীয় সৌন্দর্য্য, এবং সমুদায়ের সমষ্টিভূত বিভীষণ ও ললামভূত সুষমা প্রকটন করিতে গিয়া তাহাদিগের সামান্য অমসৃণতা ও সন্নিকর্ষের পরিস্ফুটতা উপেক্ষা করিয়াছেন আমরা তদ্বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করিব না, কারণ তাহা এ প্রকার দৃশ্যের আনুষঙ্গিক, অপরিহার্য্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। যাহা প্রয়োজনীয় তাহা দোষ নহে, তাহা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উপকরণ। যিনি ইহা না বুঝেন, তিনি কবিত্ব বুঝেন না, তিনি চিত্রবিদ্যার কিছুই বুঝেন না। আমরা এ বিষয় কথঞ্চিৎ বিশদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কবি, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কাপালিকের বনাশ্রম ও কপালকুণ্ডলার বনবাস বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এ বর্ণনায় কিছুই পরিস্ফুট নাই। বনস্থলীর বিশেষ বিবরণ নাই; কেবল এখানে একটি পর্ণকুটীর, এখানে বৃক্ষলতা, সেখানে বৃক্ষতলে নবকুমারের বন্য ফল ভক্ষণ, চারিদিকে নির্জ্জনতা, নবকুমারের সর্ব্বদাই পথভ্রান্তি, কপালকুণ্ডলার স্বাধীনভাবে বনমধ্যে ভ্রমণ, সহসা তটভূমে উপস্থিতি, সহসা বৃক্ষান্তরালে তিরোধান, সহসা বনপ্রান্তে, সহসা কুটীরে, সহসা শ্মশানে এবং সহসা নবকুমারের পশ্চাৎ ভাগে পরিদৃশ্য এবং অদৃশ্য হওয়াতে বনস্থলীর জটিলতা, বিস্তীর্ণতা, এবং বিশৃঙ্খলতা একদা মনোমধ্যে উদিত হয়। আমাদিগের মনে বনের ভাব বিলক্ষণ অঙ্কিত হয়, আমরাও যেন নবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ফিরিতেছি, অথচ কোন দিক্ দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেছি না, বনপথের কিছুই অনুসন্ধান পাইতেছি না, সুতরাং কাপালিকের বীভৎস কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াও অগত্যা বনমধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি। এই রূপ কৌশলে কবি আমাদিগের মনে বনের ভাব অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বনের সম্পূর্ণ বিবরণ কিছুই দেন নাই, অথচ মনে তাহার প্রকৃষ্ট ভাব সমুদিত হয়। নিকটে গিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর, দৃশ্যের অঙ্কপাত অসম্পূর্ণ, অর্দ্ধ-প্রসারিত, কিন্তু দূরদেশ হইতে দেখ, কল্পনা মনোমধ্যে বনের ভাব প্রকৃষ্ট রূপে অঙ্কিত করিয়াছে।

[যে ভূমির উপরে কপালকুণ্ডলার মহান্ চিত্রসকল অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী অনুরূপ মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। বাত্যান্দোলিত মহানদের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তরণী ভাসিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতটে নবকুমার একাকী নির্জ্জনদেশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিকতাময় পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বনস্থলী, বনপ্রান্তে শ্মশান ভূমে কাপালিকের ভয়ঙ্করী তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ, বনমধ্যে পর্ণকুটীর, ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় অমানুষী সুন্দরীর সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব, যেন মেঘমালার মধ্যে সৌদামিনীর আশ্চর্য্য বিকাশ হইতেছে, এবং বনপ্রান্তে নির্জ্জন দেশে পুরাতন দেবমন্দিরের দর্শন এ সমস্ত

দৃশ্যই মনকে উদাত্ত ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ করে।) আবার পথিমধ্যে মতিবিবির ঐশ্বর্য্য, আগ্রার সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, নবকুমারের গৃহপ্রান্তে বনস্থলী, এবং সেই বন স্থলীর মধ্যে গভীর রজনীতে, কাপালিক, মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার ভীষণ মন্ত্রণার জন্য একত্রে সম্মিলন—একবার মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিলে তাহা কি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হয় না? প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু উদাত্ত ও মহান্, পার্থিব মানব ঐশ্বর্য্যের দৃশ্যে যত গৌরব থাকিতে পারে, তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে যে গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে, তাহা এই পুস্তকের চিত্রাবলির ক্ষেত্রমধ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখা যায়। এ প্রকার গভীর দৃশ্যপূর্ণ গ্রন্থ দর্শন করা সচরাচর পাঠকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু আর এক প্রকার উদাত্ত ভাবের বিষয় আমরা এখনও উল্লেখ করি নাই—যে উদাত্তভাবে মানবীয় হৃদয়ের মহত্ত্ব, বীরত্ব অথবা ঔদার্য্যের পরিচয় হয়। যেমন প্রকৃতির দৃশ্য বিশালতায় হৃদয় প্রসারিত হয়, তেমনি মানবের এই ঔদার্য্যের এবং মহত্ত্বের পরিচয়েও চিত্ত বিস্ফারিত হইতে থাকে। মানব তখন সেই মহত্ত্বের প্রশংসা ও সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন মানবের মন উচ্চ ভাব পূর্ণ হয় এবং তাহার নীচ ভাব সমুদায় তিরোহিত হয়। কপালকুণ্ডলার পাঠকেরও মন একেবারে এই প্রকার ভাবে পূর্ণ হইতে থাকে। যখন তিনি পান্থনিবাসে "সুন্দরী-সন্দর্শনে" দেখিলেন মতিবিবি নিজ মহার্ঘ্য অলঙ্কার রাশি আত্ম-শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন, তখন কি মতিবিবির ঔদার্য্য গুণে একদা চমকিত হয়েন নাই? যখন কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে—

——————খুলিয়া সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।

অকপট হৃদয়ে ভিক্ষুকের হস্তে সমুদায় সমর্পণ করিলেন, তখন কি ভিক্ষুক আশাতীত ফল লাভ করাতে ক্ষণিক বিহ্বল হইল না। যখন পাঠক দেখেন লুৎফ-উন্নিসা এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন, যখন তিনি দেখেন সেই অনুতাপিতা রমণী নবকুমারের পদতলে বাহুলতায় চরণ যুগল বদ্ধ করিয়া কহিতেছেন :—

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না!"

তখন কি তাঁহার মন একবার মতিবিবির জন্য কাতর হয় নাই? একবার মতিবিবির ত্যাগস্বীকার ভাবিয়া তাঁহার উদারতা গুণে কি তিনি মোহিত হন নাই? আবার যখন নবকুমার বীরের ন্যায় নিজ স্থির সংকল্প রক্ষা করিয়া কহিলেন,

"যবনী! তুমি আবার আগ্রাতে

ফিরিয়া যাও; আমার আশা ত্যাগ কর।" তখন কি পাঠক একবার নবকুমারের মানসিক শক্তির প্রাবল্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হয়েন নাই? এরূপস্থলে নবকুমারের ন্যায় মানসিক শক্তির পরিচয় কি সচরাচর ঘটিয়া থাকে? গ্রন্থকার এই প্রকার মানসিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থকে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিয়াছেন। যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ, তাহা এই প্রকার ধর্ম্মনৈতিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে পরিসমাপ্ত হওয়াতে গ্রন্থের সমধিক গৌরব পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। সে দৃষ্টান্তে কপালকুণ্ডলার মহত্ত্ব ও হৃদয়ভাব দেখুন:—

"লু। আমার প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেক ক্ষণের পর কহিলেন, 'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?'

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব,—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অন্তঃকরণ-মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায়ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন:—

'তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম আবার বনচর হইব?'"

লুৎফ উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন। এতদূর উদারতায় কে না চমৎকৃত হয়? কপালকুণ্ডলার এই বাক্য কেবল কথাতেই শেষ হয় নাই, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। কপালকুণ্ডলা পর-সুখের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। মানবের উদারতার এই পরাকাষ্ঠা। এই চিত্তৌদার্য্যের দৃষ্টান্তে উপন্যাস পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরিসমাপ্তিটি কিরূপ মধুর তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কপালকুণ্ডলা পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তিনি পাঠক মাত্রকেই সন্তাপিত করিয়া গেলেন। তিনি ত নদীতরঙ্গে মিশিয়া যান নাই, পাঠকের হৃদয়ে নিমজ্জিত হইয়াছেন। পাঠকের মনে চিরকালের জন্য আত্মগুণের একটি সুবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। সে রেখা কখন অপনীত হইবার নহে। তিনি যেন কোন দেবতার ন্যায় নবকুমারের নিকট তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আবার দেবতার ন্যায় পরকে

সুখিনী করিবার জন্য মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার পবিত্রতা তাঁহার রূপরাশিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তাঁহার প্রকৃতিকে রমণীয়া করিয়াছিল এবং এক্ষণে তাঁহার স্মৃতিকে পরম মধুরা করিয়াছে। তিনি আজি ও আমাদিগের কল্পনার উচ্চদেশে পরম রমণীয় বেশে জীবিতা আছেন। এরূপ একটি রমণীকে সৃষ্টি করাই প্রকৃত কবির সৃষ্টি। কবির সৃষ্টি কল্পনাধামে সুবর্ণ সিংহাসনে চিরকাল জাজ্জ্বল্যমান থাকে। কপালকুণ্ডলা কবির সৃষ্টি, আমরা তাঁহাকে চিরকাল হৃদয়াসনে প্রত্যক্ষ দেখিব। অথবা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তিনি সেই বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, নবকুমারের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া বনদেবীর ন্যায় ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। পথে শিবিকারোহণে ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সরলা বালা সমুদায় দেহাভরণ সমর্পণ করিতেছেন। শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ একাকিনী নির্ভীকমনে নৈশকাননে প্রবেশ করিতেছেন এবং সর্ব্বশেষে পদ্মাবতীর চিরাভিলষিত সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নবকুমারকে চিরকালের জন্য কাঁদাইয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলায় যে কএক খানি প্রধান চিত্রের আলেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। কপালকুণ্ডলায় আমরা চারিটি মাত্র প্রধান চিত্রের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছি।—ভয়ানক তন্ত্রোপাসক কাপালিক, সম্রাড়ীশ্বরী চতুরা লুৎফউন্নিসা, বনবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা, এবং সচ্চরিত্র অমায়িক নবকুমার। এই চিত্রকতিপয়ের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সমুদয়ও অতি গভীর ও মনোহর। ভয়ানক কাপালিক, সমুদ্রতীরস্থ শ্মশানভূমে বনবেষ্টিত এবং শবারোহিত হইয়া যোগ-সিদ্ধি করিতেছেন। রূপরাশি, কুন্তলশোভিতা, সংসার ভূষণ, সরলা, পরহিতার্থিনী কপালকুণ্ডলা,—বনে, পর্ণ কুটীরে, ভয়ানক কঠোর-হৃদয় কাপালিকের আশ্রমে প্রতিপালিতা ও প্রবৃদ্ধা হইতেছেন। বাঙ্গালিনী, হিন্দু, পতিপরায়ণা পদ্মাবতী, আগ্রার বিলাসধামে যবনসম্রাটের এবং ওমারাহগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। সংসারী নবকুমার, বনে কাপালিকের আশ্রমে, সংসারে বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে এবং কাপালিকের মন্ত্রণায় নীয়মান হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমার, সম্রাড়ীশ্বরী যবনী সুন্দরী লুৎফউন্নিসার পার্শ্বে তৎপ্রার্থিত ও পদসেবিত হইয়া আছেন। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে চিত্রগুলিকে বড় চমৎকার শোভায় স্থাপন করিয়াছে। যখন আবার এই চিত্রগুলির পরস্পর-বৈপরীত্য ভাব মনে উদয় হয়, তখন আরও চমৎকৃত হইতে হয়, তখন উপন্যাসের কবিত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন ভাবিতে থাকি, কেমন চৎকার কৌশলে কপালকুণ্ডলায় উপা-

খ্যান বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়াছে! এই কৌশল হেতু কি কপালকুণ্ডলার সরল উপাখ্যান এত বৃহৎ বোধ হয় এবং সমুদায় হৃদয়-ধামকে পরিপূর্ণ করে? ইহার উপাখ্যান সরল বটে, কিন্তু ইহার ব্যক্তি গুলি ক্ষুদ্র নহে। ইহার বৃহৎ চিত্রগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে সংস্থিত থাকাতে হৃদয়ে দ্বিগুণতর আয়তনে প্রতীত হইতে থাকে। বৈপরীত্যের ফলই এই। বন-বেষ্টিত সমুদ্রতীরস্থ নির্দ্দয় কাপালিক, নগরাশ্রয়ী অমায়িক নবকুমারের বিপরীত দিকে সংস্থাপিত রহিয়াছে, সুতরাং উভয়েরই চিত্র দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিতা চতুরা লুৎফ-উন্নিসা, নিরলঙ্কৃতা সরলা কপালকুণ্ডলার অপর পার্শ্বে উজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ও চারুতায় মন স্তম্ভিত ও বিমোহিত হয়। কপালকুণ্ডলা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার চিত্র গুলি ক্ষুদ্র নহে; তজ্জন্যই তাহার চিত্রফলক আমাদিগের হৃদয়ে গভীরতররূপে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই বঙ্কিমবাবু আজি পর্য্যন্ত এ চিত্রগুলি সম্পূর্ণ করিলেন না। এই চিত্রগুলি যে অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা তাহাদিগের কেবল ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ছায়াতেই আমরা তাহাদিগের পূর্ণ অবয়ব ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিলক্ষণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। কারণ বাল্যাবস্থায় শরীরের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহার যৌবন-গৌরব অনেক দূর অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমবাবুর চিত্রগুলি সকলই বাল্যাবস্থায় স্থাপিত। তাহার প্রত্যেক চিত্রপুত্তলি বিলক্ষণ বর্দ্ধনশীল। বাল্যাবস্থায় চিত্রগুলিকে নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা এত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় যে আমরা তাহাদিগের যৌবনের পূর্ণগৌরব না দেখিতে পাইলে কিছুতেই মনের সন্তোষ পাই না। বাল্যাবস্থার পুত্তলিগণ মনের অসন্তোষের কারণ হইতে থাকে। সুতরাং মনে হয় তাহারা অসম্পূর্ণ রহিল। বঙ্কিমবাবু আমাদিগের মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন না করিলেই ভাল করিতেন। এখন কল্পনা দেখিতে চায় কপালকুণ্ডলাকে নবকুমার কিরূপে পুনর্লাভ করিবেন; পুনরায় সংসারবাসিনী হইয়া কপালকুণ্ডলার বন্য প্রকৃতি কিরূপে ক্রমশঃ প্রশমিত হইবে; প্রশমিত হইলে কপালকুণ্ডলা কত সহস্র গুণে অধিকতর রমণীয়তা ধারণ করিবেন। কল্পনা দেখিতে চায় কাপালিকের মন্ত্রণাজাল কতদূর প্রসারিত হইতে পারে এবং সেই মন্ত্রণা মধ্যে কাপালিকের অন্তঃপ্রকৃতি কতদূর উন্মেষিত হইতে পারে। কল্পনা দেখিতে চায় বাঙ্গালিনী পদ্মাবতীর প্রেমবেগ কোথায় প্রশান্তিলাভ করে, তাহার বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার কতদূর প্রসারণ হইতে পারে অথবা আগ্রার রাজপ্রাসাদের চতুরা রমণী সপ্তগ্রামের

বাঙ্গালিনী হইয়া কতদূর প্রকৃতিমধুরা হইতে পারে। আমাদিগের কল্পনার আকাঙ্ক্ষা অনেক। আমাদিগের কল্পনা যেরূপ যাঁহাকে দেখিতে চাহে বাস্তবিক তিনি বঙ্কিমবাবুর হস্তে সেইরূপ প্রবর্দ্ধিত ও উন্মেষিত হইয়া দাঁড়াইতেন কি না তাহা আমরা জানি না, এবং জানি না বলিয়া আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হয়। মনে করি বঙ্কিমবাবু হয়তো তাহাদিগকে অন্যবিধরূপে আরও কত সুন্দরতর, কত মহত্তর করিতে পারিতেন। এইজন্য বঙ্কিমবাবুর এই কল্পনাগুলির সম্পূর্ণতা না দেখিয়া আমাদিগের কিছুতেই ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না, সে যাহা হউক, কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমবাবু এই চিত্রপুত্তলিগণকে কোথায় রাখিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহারই পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাহারই চরিত্র, তাহারই প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য যাবতীয় ঘটনার আয়োজন ও গ্রন্থীয় ব্যাপার কল্পনার সৃষ্টি। আমরা ঋষিকুমারী শকুন্তলাকে দেখিয়াছি—তিনিও জনসমাজ-বিদূরে বনবাসে চিরকাল প্রতিপালিতা। কিন্তু তাঁহার সেই বনবাসেই গৃহস্থের সমস্তই ছিল। অতি উচ্চকুলে শকুন্তলার সম্ভব হয়। পুরসুন্দরী মেনকা তাঁহার জননী; মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার জন্মদাতা। মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে তাঁহার আবাস। তাপসগণ তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয়, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তাঁহার সহচরী। মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে লালন পালন করিতেন, সদাই সদুপদেশ দিতেন এবং সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিয়া রাখিতেন। ঋষি ও তপস্বিগণের পবিত্র চরিত্র, দয়া ধর্ম্ম, স্নেহ মমতা, সকলই শকুন্তলা দর্শন ও শিক্ষা করিতেন। গৌতমী তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও স্নেহ করিতেন। সুতরাং শকুন্তলার বনবাস, বনবাসই নহে। সুতরাং শকুন্তলার প্রকৃতি যে অতি মধুরা হইবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র এই, কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এত মধুরা হইল কেন? তাঁহারই যথার্থ বনবাস ছিল—নির্জ্জন, নির্ম্মম বনবাস। তিনি শকুন্তলার ন্যায় সৎকুলোদ্ভবা নহেন। তিনি শকুন্তলার ন্যায় পবিত্র-মহর্ষি-হস্তে প্রতিপালিতা নহেন। তিনি একজন নৃশংস তান্ত্রিকের হস্তে প্রতিপালিতা। তান্ত্রিকের নির্দ্দয় ক্রিয়াকলাপই তাঁহার আদর্শ-স্থানীয়। তথাপি নারীহৃদয় নির্দ্দয়-সহবাসেও নিতান্ত কঠোর হইতে পারে নাই। তথাপি কপালকুণ্ডলার হৃদয় কুসুমসুকুমার ছিল। তাঁহার কোমল দয়াপূর্ণ হৃদয় নবকুমারের জন্য ব্যথিত হইল। তিনি সপত্নীর হিতার্থ পৃথিবীর সকল সুখই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই দয়ার ব্যবহার কোথায় শিখিলেন? তাঁহার এই হৃদয়-সৌকুমার্য্য তাপসকুমারী শকুন্তলার হৃদয়-

সৌকুমার্য্য অপেক্ষাও গরীয়ান্। কবি, বোধ হয়, স্বীয় নায়িকার এইরূপ প্রকৃতি-গৌরব সম্বর্দ্ধনার্থই তাঁহাকে কাপালিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্জ্জন বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঠিক তাহাই নহে। একটি অপূর্ব্ব বনবাসিনী রমণীর সৃষ্টি করিবার জন্যই, কবি তাঁহাকে আশৈশব প্রকৃত বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত বনবাসিনী বালিকার মনে মনে কেবল কল্পনা করিতে পারি। বঙ্কিমবাবু সেই কল্পনাকে জীবিত করিয়াছেন—তাহাকে জীবনের বিষম কার্য্যক্ষেত্রে অবতারণ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সেই কল্পনার অবয়ব। আমরা কপালকুণ্ডলাতে দেখিতে পাই, সেই অবয়বী কল্পনা সংসারক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্যশীল হয়। আমরা অনেক তাপসকুমারী বনবাসিনীর বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকৃত বনবাসিনী বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি শকুন্তলা বনবাসে কেমন সংসারিণী ছিলেন। তাঁহার বনবাসের সহিত কপালকুণ্ডলার বনবাসের কত প্রভেদ! অপরাপর তাপসকুমারীর বনবাসের সহিত ও কপালকুণ্ডলার বনবাসের বিস্তর প্রভেদ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কপালকুণ্ডলা কখন সংসারাশ্রমিণী হয়েন নাই। চিরকাল নির্জ্জন বনবাসেই প্রতিপালিতা। তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতিকে প্রকৃত বন্য প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সেই বন্য প্রকৃতি সংসারে প্রবেশ করিয়া কিরূপে ক্রমশঃ প্রশমিত ও পরিণত হইতেছিল, বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার কল্পনায় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বনত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বন্য প্রকৃতির প্রশান্তির সর্ব্বপ্রকার অবস্থা কপালকুণ্ডলার ক্ষুদ্র উপাখ্যানে সমুদায় কল্পিত হয় নাই। সেই প্রশান্তির প্রারম্ভ মাত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থার কল্পনা প্রদর্শন করিতে হইলে কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয়ভাগ রচনা করিতে হয়। কপালকুণ্ডলার প্রথমভাগে দেখি তাঁহার হৃদয় আজিও সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় নাই, সেই হৃদয় বহুকালে সংসারাশ্রমে কি প্রকার ভাব ধারণ করিবে তাহা আমরা আজিও সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই নাই। কপালকুণ্ডলায় প্রকাশিত উপাখ্যান ভাগে কেবল দেখিতে পাই, তাঁহার স্বাধীন ও বন্য প্রকৃতি আজিও সম্যক্ প্রদমিত হয় নাই। তাঁহার সংসারানভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। বনত্যাগ করিয়া শিবিকারোহণে নবকুমারের স্বদেশাভিমুখে যাইতেছেন এমত সময়ে কপালকুণ্ডলা "অকপট হৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলিন ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিনও খুলিয়া দিলেন।" সংসার ধামে প্রবেশ করিবামাত্র এই তাঁহার প্রথম কার্য্য—বনবাসিনী বালিকার প্রথম পরিচয়।

তাহার বন্য প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিচয় সপ্তগ্রামের অবরোধে শ্যামাসুন্দরীর সহিত সম্ভাষণ সময়ে। সেই দৃশ্যটি কি সুন্দর! কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি-পরিচয়ের কি সুস্পষ্ট উদাহরণ! অবরোধে শ্যামাসুন্দরীর পার্শ্বে কপালকুণ্ডলাকে স্থাপিতা করিয়া বঙ্কিমবাবু কপালকুণ্ডলার বন্য-প্রকৃতিকে অধিকতর উজ্জলিত করিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরী সংসারাশ্রম বাসিনীর প্রধান আদর্শস্থানীয় ষোড়শী প্রমোদিনী—বঙ্কিমবাবু একটী মাত্র দৃশ্যে তাঁহার সহিত কপালকুণ্ডলার বৈলক্ষণ্য পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার বিপরীত চিত্রেই বৈলক্ষণ্যের উজ্জ্বলতা বিলক্ষণ প্রভাসিত হয়। আমরা এই দৃশ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া দেখাইতে পারি না, বঙ্কিমবাবু কেমন নিপুণতম চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার ছবি সকল অঙ্কিত করেন; কেমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সকল কল্পনা করিয়া এরূপ ভাবে কল্পিত চিত্র সকলকে সংস্থিত করেন, যদ্দ্বার তাহাদিগের প্রকৃতি ও দ্রষ্টব্য গুণাদি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়। এই প্রকার সংস্থান সকল * কল্পনা করিয়া বঙ্কিমবাবু উপন্যাস রচনায় এত গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার সংস্থান রচনায় তাঁহার উপাখ্যান সকলকে জীবিত করিয়া তুলে। তিনি সংস্থান রচনায় বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কবি, বাঙ্গালায় কেন, অন্যান্য ভাষারও অল্প লেখকেরই এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুল্য মূল্য হয়। সে যাহা হউক, নিম্নে সপ্তগ্রামের অবরোধের দৃশ্যটি উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠকগণ কপালকুণ্ডলার প্রথম অবরোধ চিত্র অবলোকন করুন।

"শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশ-তরঙ্গ-মালা তুলিয়া কহিল, 'তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?'

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল আমার সাধটী পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?'

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না!

শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন "না"।

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়ে মানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

* Situations.

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস।

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোপায় ফুল দিলাম; সিঁথিতে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দিলাম, চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?'

শ্যা। তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন 'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃত হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন 'এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?'

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া কহিলেন 'যে আজ্ঞা ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?'

মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে?'

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল কেন?

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'শুন। যে দিন স্বামির সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলেম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে আশঙ্কা হইতে লাগিল, ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলেম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।'

মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীপূ।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

জাতীয় অভ্যুত্থান ও ইহার পতন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দিন হইতে কার্ব্বোন্যারোগণ ইতালীর উদ্ধার সাধনের জন্য একজন রাজার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের পতন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন।

রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপর যে কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশেষ আস্থা ছিল এরূপ নহে; কারণ তাঁহারা আপনা পনির মধ্যে রাজতন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও ত্রুটী করিতেন না। তত্রাপি তাঁহারা যে এত আদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ ও এত উৎসাহের সহিত ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহাদিগের বল প্রাপ্তির প্রধান কারণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রজামণ্ডলীকে তাঁহারা অতিশয় ভয় করিতেন; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল তাহাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিলে—তাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে—বিপ্লবের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, নির্ম্মুক্ত বৃষের ন্যায় তাহাদিগকে শেষে আয়ত্ত করা দুরূহ হইবে; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল রাজতন্ত্রের আশ্রয় লইলে তাঁহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে না অথচ তাঁহাদিগের অভীষ্ট কিয়ৎ-পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই অভ্যুত্থানের সহিত কোন রাজনাম সংশ্লিষ্ট করিলে তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার ক্রোধানল কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করিতে পারিবেন এবং—ইংলণ্ড কি ফ্রান্স—কোন না কোন রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই জন্যই তাঁহাদিগের নেত্র পীড্‌মণ্টের চার্লস আল্‌বার্ট এবং নেপল্‌সের প্রিন্স ফ্রান্সেস্‌কোর উপর পতিত হইল। চার্লসের প্রকৃতি স্বভাবতই যথেচ্ছচারপ্রবণ ছিল; এবং তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী সত্ত্বেও মহত্ত্ব অভাবে তাহা কখনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়—ফ্রান্সেস্‌কো—জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কার্ব্বোন্যারোগণ এবম্ভূত দুই অযোগ্য রাজপুরুষের হস্তে ইতালীর ভাবী আশা ন্যস্ত করিলেন—ইতালী উদ্ধারের সমস্ত আয়োজন ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই দুই রাজপুরুষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং মতও স্বতন্ত্র।

জানিয়াও তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় এরূপ পরস্পর-বিসম্বাদী উদ্দেশ্য ও মতের সামঞ্জস্যের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজনামে—রাজপ্রতাপে—তাঁহাদিগের দলে লোক-সংখ্যা অধিক হইবে, কার্ব্বোন্যারোগণ এই আশাতেই রাজ-চরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে শুদ্ধ লোকের সংখ্যায় কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে সেই কার্য্যের প্রতি আসক্তিই কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান মূল। বিপ্লবের অধিনায়কদিগের উচ্চ লক্ষ্যের অসদ্ভাবের অনিবার্য্য পরিণাম কি, উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহাও বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল।

কার্ব্বন্যারোদিগের প্রথম উদ্যম কৃতকার্য্য হইল। তাঁহাদিগের পথে কোন গুরুতর বিঘ্নপরম্পরা অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এই কৃতকার্য্যতা অনতিবিলম্বেই ঘোরতর অন্তর্ব্বিদ্রোহে পরাভূত হইল। প্রলয়-কার্য্য মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে—এমন সময় প্রত্যেক কার্ব্বোন্যারো আপন আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত মতামত লইয়া পরস্পরের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয় কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। কিন্তু সৃষ্টি কার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। কতকগুলির মত যে,—সমস্ত ইতালী এক রাজতন্ত্রের অধীন হয়, অনেকের ইচ্ছা যে ইতালী ফ্রান্স বা স্পেনের সহিত মিলিত হয়; কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে ইতালীতে একমাত্র সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত হয়; আবার অনেকের ইচ্ছা যে ইহা বহু সাধারণ তন্ত্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু কাহারও ইচ্ছা সফল হইল না—সুতরাং সকলেই আপনাদিগকে প্রতারিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তৎকালে ইতালীতে কএকটী প্রোভিসনল্ বা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়। কার্য্যপ্রারম্ভেই সভ্যদিগের পরস্পর-বিবাদে তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত ব্যাহত হয়। কেহ কেহ কিছুই করিব না বলিয়া বসিয়া রহিলেন, আবার অনেকে শুদ্ধ কিছু না করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, অপরে কিছু করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই জন্যই সেই সকল গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অব্যবস্থিততা ও অনিশ্চিততা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। যাহাহউক এই সকল কারণে ইতালীর যুবকবৃন্দ ও প্রজা সাধারণ অচিরকাল মধ্যেই নিরুৎসাহ, ছিন্ন ভিন্ন, এবং লক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়িল।

রাজতন্ত্রতা বিপ্লবের অধিনায়ক হওয়ায়, কার্য্যের সাধক মনোনীত করণে কার্বো-নারোদিগের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। রাজতন্ত্রতার সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যাবলী ও অসংখ্য বিশ্বাস, বিদ্রোহ-জীবনের নির্ভীক পরিণতি হইতে দিল না। কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। বিদ্রোহের অধিনায়কেরা অসন্দিগ্ধরূপে খ্যাপন করিলেন যে প্রজা-সাধারণ আত্মোদ্ধারে বা আত্ম-শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এই জন্য তাঁহারা প্রজাসাধারণকে আত্মোদ্ধার-সাধক অস্ত্র প্রদান দ্বারা বিদ্রোহের অধিনয়ন কার্য্যে কোনও অংশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রজারূপ বলের স্থানে অন্য বলের বিনিযোজনা করিতে হইয়াছিল—এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? তাঁহারা শরণাগত হইলেন—আপনাদিগের অধিকার, আপনাদিগের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেন—আপনাদিগেরমান সম্বন্ধে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কি পাইলেন? মিথ্যা আশা! মিথ্যা প্রতিজ্ঞা! তাঁহারা রাজপুরুষদ্বয়ের হস্তে মন্ত্রী ও সেনাপতি মনোনীত করণের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারই বা ফল কি হইল? দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ইতালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্পিত হইল—ইতালীর দুর্দ্দশা—যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা—অধিকতর হইল। তাঁহাদিগের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল যে—তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ভরসার স্থল সেই রাজপুরুষদ্বয়ই শত্রুশিবিরে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া, যে বিদ্রোহ তাঁহারা আপনারাই উত্তেজিত করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন।

প্রিন্‌স্ অ্যালবার্ট ও প্রিন্‌স্ ফ্রানসেস্‌কোর পলায়নের পরেই ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের পতন আরম্ভ হয়। নিয়াপলিটান্ অভ্যুত্থানের সর্ব্ব প্রথমেই পতন হয়। নিয়াপলিসের পতনের প্রথম লক্ষণ বেনেভেণ্টো এবং পণ্টিকর্ভো নামক চির-সংশ্লিষ্ট নগরীদ্বয়ের পরিত্যাগ। দ্বিতীয় লক্ষণ নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষণা হয় যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহারা রণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৃতীয় লক্ষণ যৎকালে অষ্ট্রীয় সৈন্য ইতালীর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত, তখনও নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্ঘোষণ হয় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয় সেনা নিয়াপলিটান্ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাতে পদার্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

পীড্‌মণ্টিস্ অভ্যুত্থান ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ইহার অধিনায়কেরা নিয়াপলিসের দৃষ্টান্তে আপনাদিগকে

অনায়াসেই ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন—একইরূপ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না, সেইরূপ ভ্রমেই তাঁহাদিগেরও পতন হইল। যৎকালে লম্বার্ডীর সমস্ত লোক অভ্যুত্থানোন্মুখ হইয়াছিল, যৎকালে কেবলমাত্র ২৫০০০ পঁচিশ হাজার পীডমণ্টিস্ সৈন্য লম্বার্ডদিগের সহিত মিলিত হইলে লম্বার্ডের বিপ্লব সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিত—কারণ তৎকালে লম্বার্ডীতে যে অষ্ট্রিয় সৈন্য ছিল তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান কখনই নিবারণ করিতে পারিত না—তখনও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রেরণ করা হইল না, এই সাহায্য তাঁহারা অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ মধ্যে অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে একে একে নিয়াপলিস্, পীড্‌মণ্ট্ ও লম্বার্ডী পতিত হইল। ইহাদিগের পতনে ইতালীর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। ইতালীর উদ্ধার সাধন দূর-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

চার্লস্ আল্‌বার্ট—যিনি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন—বিজ্ঞাপন জারি করিলেন যে, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, বিদ্রোহিদলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। বিদ্রোহী সমাজ রুসীয়দূত মসিনিগোর শরণাপন্ন হইলেন। রুসীর দূত স্বীকার করিলেন যে অষ্ট্রিয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করাইবেন এবং এরূপ আশাও দিলেন যে তিনি ইতালীতে কোনপ্রকার নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই বিদ্রোহী সমাজের অধিকাংশ সভ্যেরই নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রতিবাদাসাহ। সকলেই দীক্ষিত কার্ব্বোন্যারো। তাঁহারা যে কোন স্বার্থ সাধন মানসে বিপ্লব হইতে নিরস্ত হইলেন তাহা নহে। একদিকে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের মনে পড়িল, অন্য দিকে রাজ্য-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মনে পড়িল। উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অগত্যা শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যে লোককে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; যে ব্যক্তি—তাঁহাদিগের মনে ভয় ছিল—এক দিন তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিলেও করিতে পারে; তাঁহারা অগত্যা তাহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোন্‌টী ন্যায়-সঙ্গত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না এরূপ নহে; কিন্তু বুঝিয়াও ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতন সেনাপতিগণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া রাজ্যের পূর্ণ সংস্কারে—আমূল পরিবর্ত্তনে—কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহা-

দিগের সকল্প সুতরাং বিফল হইল। তাঁহারা লোভারার গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লাটুরের হস্তে এবং সেভয়ের গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট ডাণ্ডিজেনির হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে ইহাঁরা দুই জনেই বিপ্লবের প্রখ্যাত শত্রু।

সমরের অনিবার্য্যতা ও আবশ্যকতা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াও ছিলেন। তথাপি রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিত হইয়াও প্রজাসাধারণকে শস্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইলেক্‌টরাল্ সমাজ আহ্বান করিতে অপরিমিত বিলম্ব করিলেন; প্রত্যুতঃ যে কোন কার্য্য দ্বারা বিপ্লব বিষয়ে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি সমুদ্ভূত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা তৎসমস্তেই অবহেলা প্রদর্শন করিলেন; অধিক কি জেনোয়ায় লবণের মূল্য কমানোর জন্য যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় তাহা পর্য্যন্তও তাঁহারা রদ করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য ভ্রমে ও অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যেই কার্ব্বোন্যারোদিগের পতন হইল। যদি তাঁহারা প্রবলতর শত্রুসেনা দ্বারা পরাভূত হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিতার দোষে—আপনাদিগের বৈপ্লবিক কার্য্যপ্রণালীর পরস্পর-বিসম্বাদেই—বাহ্য অন্তরায় বিনাও পতিত হইলেন। তাঁহারা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিবেন, অথচ প্রজা-সাধারণকে স্বাধীনতা দিবেন না—তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবেন না! তাঁহারা স্বদেশকে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, অথচ বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার অষ্ট্রিয়ার দাস কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন! তাঁহারা প্রচলিত শাসনপ্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবেন, অথচ প্রচলিত শাসনপ্রণালীর প্রধান সমর্থক পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত রাখিবেন! কিন্তু অসম্ভব কে সম্ভবপর করিতে পারে?

কার্ব্বোন্যারোগণ ম্যাট্‌সিনির নিকট এইরূপ চিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন—মস্তকশূন্য এক প্রকাণ্ড ও সবল দেহ—এক সম্প্রদায়, যাহাতে উদার ইচ্ছার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য ও উপায়ের কোনও সামঞ্জস্য নাই, এবং অন্তর্নিগূহিত জাতীয় ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে পরিমাণ যুক্তি ও যে পরিমাণ বহুদর্শন থাকা আবশ্যক তাহার অস্তিত্বের অভাব আছে।

কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশ্বনাগরিকতায় (Cosmopolitanism) তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি অতিশয় ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের মঙ্গলসাধন তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য হওয়ায়, তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন দেশেরই

মঙ্গলসাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কার্ব্বোন্যারোগণ একটী গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা যে বীরোচিত অবিচলিততার ভাব শিক্ষা দ্বারা লোকের মনে চির-অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে নির্ভীকতার সহিত তাঁহারা স্বদেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিতেন,—সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সহস্র দৃষ্টান্ত ইতালীয় জাতির অন্তরে এমন একটী জাতীয় একতার ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা হইতেই ইতালীর ভাবী জাতীয় মিলন ও মহতী ভবিষ্য অবদান-পরম্পরার পথ উন্মুক্ত হয়; তাহা দ্বারাই কি সম্ভ্রান্ত কি অসম্ভ্রান্ত, কি ধর্ম্মব্যবসায়ী কি সাহিত্যোপজীবী, কি সিবিল্‌ কি সৈনিক—ইতালীর সকল শ্রেণীর লোকই এক লক্ষ্যে দীক্ষিত হন।

এই সময় ইতালীতে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যে অমানুষ সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্ব্বোনারো দণ্ডিতগণ আপনাদিগের দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, এবং কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রতি পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। ইতালীয় অভ্যুত্থান নিবারিত হইলে অসংখ্য কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অধিক কি ধর্ম্মোপজীবীরাও এই দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণ ইতালীতে অসংখ্য, এবং মডেনায় দুই জন মাত্র ধর্ম্মোপজীবী এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। কার্ব্বোন্যারোগণ কিরূপ নির্ভীকতাও বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন, তাহা একটী মাত্র উদাহরণে বিশদীকৃত হইতে পারে। ইঁহাদিগের অন্যতম অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক গুইসেপী আণ্ড্রিয়োলী যৎকালে শুনিয়াছিলেন যে তিনি ও তৎসহচর কারাবাসিগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না এবং তিনি এই করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কারাবাসিদিগের নিজ নিজ মুখ হইতে তাহাদিগের বিদ্রোহিতাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নৃশংস রাজতন্ত্রীয়েরা ভীষণ উপায় সকল উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কারাবাসিদিগের পানীয়ের সহিত ইন্‌ ফিউসন অব আট্রোপোস্‌ বেলাডোনা (*Infusion of atropos belladonna*) নামক ঔষধি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বেই মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কারাবাসিদিগকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত, তাঁহারা ভয়ে ও আত্মসংযমাভাবে তাহাই স্বীকার করিতেন। দণ্ড্যেরা স্বমুখে আপনাদিগের অপরাধ

স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইত না, সুতরাং বিনা আয়োজনে তাঁহারা বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতেন। এইরূপে অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল। ক্ষুদ্র মডেনা রাজ্যে ১৪০, পীড্‌মণ্টে শতাধিক এবং লম্বার্ডী নেপল্‌স ও সিসিলিতে অগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ বধ হইল।

বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বদেশের কার্য্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সক্ষম হন, কার্ব্বোনারোদিগের সে সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা এই গুরুতর অনুষ্ঠানে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন? এ দুরূহ প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এই অভ্যুত্থান-সমকালিক কার্ব্বোনারোদিগের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনাকে তাঁহাদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি:—প্রথমতঃ কি প্রণালীতে প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এবং প্রলয়কার্য্য সমাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অথবা প্রজাসাধারণকে তাহার কোনও তালিকা প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের বোঝা উচিত ছিল যে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া শেষেই বা কি কি কার্য্য করিতে হইবে, এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে না পারিলে, যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কার্য্যে সবিশেষ উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কার্ব্বোন্যারোগণ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরই তাঁহাদিগের জয়াশা অধিক পরিমাণে সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে—আপনারা সক্ষম না হইলে কখনই পরসাহায্যে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ইতালীয় অধিবাসী বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কার্ব্বোন্যারোগণ তাঁহাদিগেরই হস্তে বিদ্রোহের অধিনীতি ও পরিণতির ভার সমর্পন করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে বিদ্রোহের সৃষ্টির সহিত যাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না, বিদ্রোহের ফলাফলের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি থাকিতে পারেনা।

যাহা হউক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিদ্রোহিদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির একটী স্পষ্ট লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণী ও সৈনিক দলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিদ্রোহে কৃতকার্য্যতা লাভ অসম্ভব—এই অন্ধ বিশ্বাস এই দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে বিদ্রোহিদিগের মন হইতে চলিয়া যায়। ইতালীর বক্ষেই কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়।

প্যারিসের ত্রৈদিবসিক বিদ্রোহের পর দিন, বলোনার ডাকঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্যারিসের সংবাদ পত্র সকল বলোনার যুবক-বৃন্দের হস্তে আসিয়া পড়িল। যুবকবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ-মঞ্চকে দণ্ডায়মান হইয়া পরিবেষ্টনকারী শ্রোতৃবৃন্দকে প্যারিসের ঘটনা সকল পড়িয়া শুনাইলেন। উৎসাহ স্রোত যুবক হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হইয়া প্রবলবেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্লাবিত করিল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল; দলে দলে ইচ্ছা-সৈনিকের* সংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বেই সেনানায়ক সকল মনোনীত হইল। এই সংক্রামক উৎসাহ বলোনার রাজসেনাদলের চিত্ত পর্য্যন্তও অধিকার করিল। বলোনার সেনাপতি গবর্ণরকে জানাইলেন যে তাঁহার সৈনিকেরা নগরবাসিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অস্বীকৃত। সুতরাং এই বিদ্রোহ-স্রোত অপ্রতিহত বেগে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল।

এই অগ্নি অন্যান্য নগরেও জ্বলিয়া উঠিল। ২রা ফেব্রুয়ারী মডেনার নাগরিকেরা সাইরো মিনোতির গৃহের উপর যে কামান-গোলক বর্ষণ করিল, তাহাই জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্কেত-চিহ্ন স্বরূপ পরিগৃহীত হইল। বলোনা ৩ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বলোনার অধিবাসিগণ তাহাদিগের ডিউক ও তদীয় পারিষদবর্গকে নগরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। ইমোলা ফেয়েন্সা, ফর্লী, কাসেনা এবং রাভেন্না একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিল। ৭ই তারিখে ফেরারাও তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অষ্ট্রিয় সৈন্য পলায়ন করিল। ৮ই তারিখে পেসারো, ফসোম্ব্রোণ, ফেনো এবং অর্বীণো আপনাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিল। ১৩ই তারিখে বিদ্রোহাগ্নি প্রথমে পার্ম্মায়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে কামেরিণো, আস্কোলি, পেরুজিয়া, তার্ণী, নার্ণী এবং অন্যান্য নগরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণ বেগ ও সমবেত উৎসাহোন্মাদের এতদূর শক্তি যে—যে কার্য্য এক যুগে সম্পন্ন হওয়া কঠিন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিকবেগে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিল। এই উৎসাহ ও বেগ এত বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল যে বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণও ইহা দ্বারা উন্মাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বলসাধ্য যুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হন নাই বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া পতাকা, ককেড্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য বিদ্রোহের সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। এদিকে রণবৃদ্ধ বীর পুরুষগণ যুবকবৃন্দের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেছে দেখিলে অমনি তাঁহাদিগের দেহ বস্ত্রোন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া বলিতেন "দেখ, স্বদেশের রক্ষার জন্য আমাদিগের শরীর কত ক্ষত ধারণ করিয়াছে!"

* Volunteers.

এইরূপে ৫এ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ ইতালীয় অধিবাসী জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্বজাতির উদ্ধার সাধনে প্রাণ সঙ্কল্প করিল। তাহারা যে শুদ্ধ আত্মরক্ষণপর* সমরের জন্য উদ্যুক্ত হইল এরূপ নহে, পরধর্ষণা† সমরের জন্যও প্রস্তুত হইল।

ক্রমে এই অভ্যুত্থান ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় আকার ধারণ করিল। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক ককেড্ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে বলোনার যুবকবৃন্দ টস্কানীর আক্রমণে চেষ্টমান হন; মডেনা ও রেজ্জিওর যুবকবৃন্দ মাসানগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; এবং অবশেষে জাতীয় সেনা ফর্লোর মধ্য দিয়া নেপাল্স রাজ্য আক্রমণে নীত হইবার জন্য অধিনায়কদিগকে গুরুতর উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিনায়কেরা ঈদৃশ—মূলতঃ লক্ষ্যতঃ ও উপাদানতঃ—জাতীয় বিপ্লবকে প্রাদেশিক অভ্যুত্থানে পারিণত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃতি ও পরিণতি জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম, বিপ্লবের অস্তিত্বের মূলসূত্র। বিপ্লবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে ক্রমেই ইহার পরিধির বিস্তার সাধন করা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিপ্লবের অধিনায়কেরা ইহার ক্রমিক বিস্তৃতি সাধন না করিয়া ক্রমেই ইহাকে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিধি দ্বারা নিষেধ করিলেন অতঃপর কেহই বক্তৃতা, রচনা বা কথোপকথন দ্বারা বিদ্রোহ-সূত্রের প্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাগত বিঘ্নরাশি বিদূরিত না করিয়া বরং বিদ্রোহমার্গে নব নব বিঘ্নরাশি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বব্যাপিনী জাতীয়তাই* এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত জীবন। ইতালীয় জাতিই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র জনক। কিন্তু তাঁহারা সেই ইতালীয়জাতির উপর নির্ভর না করিয়া ইতালীর বহিশ্চর জাতিদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; যেরূপ উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী সমরে জয় লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখাইলেন না; বরং এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে শান্তির পরিরক্ষণ ও পুনঃসংস্থাপনের উপরেই বিপ্লবের জয় প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে, এবং শান্তি যে শুদ্ধ সম্ভবপর এরূপ নহে—ইহা অনায়াস-রক্ষ্য ও অনায়াস-লভ্য; সুতরাং যে কোন কার্য্য দ্বারা শান্তিভঙ্গ বা শান্তির ব্যাঘাত সম্পাদন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্রোহের উপাদান সামগ্রীর প্রকৃতি এবং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলের অবস্থান-বৈষম্য

* Defensive. † Offensive.

* Nationality.

জন্য—এই বিদ্রোহ সুতরাং সাধারণতন্ত্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল; এরূপ স্থলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের সহানুভূতি লাভ অসম্ভব; এই প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি সমাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অধিনায়কদিগের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রধান উপায়, তাহাদিগের নিকট অকপটভাবে আপনাদিগের সমস্ত মনোগত ভাব খুলিয়া বলা; কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া রাজবৃন্দের অনুগ্রহ-ভিখারী হইলেন, এবং সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকে রাজসভার জটিল মন্ত্রণাজালে পর্য্যুদস্ত করিলেন।

অপরকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইলে, আপনাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; অপরের কার্য্যকরী শক্তি উদ্দীপিত করিতে হইলে, আপনাদিগের কার্য্যকরী শক্তি দেখাইতে হইবে; অপরের মনে বিশ্বাসের ভাব অঙ্কুরিত করিতে হইলে, আপনাদিগকে বিশ্বাসী হইতে হইবে; কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা-জনিত ভীতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গভীর হতাশতার ভাব ইতালীর সমস্ত প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদ্রোহীদের গবর্ণমেণ্টের উপর ইতালী উদ্ধারের জন্য নির্ভর করার বিষময় ফল কার্বোনারোগণ ক্রমেই উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স অসন্দিগ্ধরূপে ঘোষণা করেন যে তিনি কোন প্রকারেই বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবেন না। এই ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীয় অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতালীর প্রভাবশালী লোকগণ লাটুর মবুর্গ নামক লেপ্‌লসস্থিত ইতালীয় দূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে—"যদি ইতালীতে একটী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ইতালীয়েরা অষ্ট্রিয়ার ভয়ঙ্কর কোপানলে পতিত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন।" দূত স্বহস্তে সেই পত্রেরই পার্শ্বদেশে লিখিয়া দেন, যে "যদি এই নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনসমিতি বিশৃঙ্খল আকার ধারণ না করেন, যদি তাঁহারা ইউরোপ-প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অবশ্যই এই বিপ্লবের সমর্থন করিবেন।" কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাসী দূত অম্লানবদনে এই স্বহস্ত-লিখিত প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার সভাপতি লাফিট, সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক গিজো, পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী, এবং ডিউক্ অব্ ডাল্‌মেসিয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ফ্রান্স বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতোর

অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রজাসাধারণের শান্তি হরণ করিবেন না বটে, কিন্তু বহিশ্চর রাজ্য সকলের প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ফ্রান্স তাহাদিগকে অনুকূল হস্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না; স্বাধীনতার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন সাধনই ফ্রান্সের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য; উদাসীন থাকিয়াই হউক আর লিপ্ত হইয়াই হউক, ফ্রান্স তৎসাধনে কখনই ভীত বা বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এই সকল আশ্বাস বাক্য *সময়ে কোনও ফল প্রসব করিল না।*

এই সকল আশ্বাস বাক্যে বিপ্লবের অধিনায়কদিগের স্বভাবতঃই এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে বিপদ্‌কালে ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ্‌ কখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত সঙ্গত হইলেও তাঁহাদিগের অন্য কোটি (Extreme) কল্পনা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

কার্ব্বোন্যারোগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে লুই নিতান্ত ধর্ম্ম-ভীরু ও একান্ত প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর হইলেও আত্মরাজবংশের ধ্বংস সম্ভাবনায় কখনই ইতালী উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। মনে কর এই সময় ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সমস্ত ইউরোপ এই যুদ্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাঁহারা উন্নতিশীল তাঁহারা ফ্রান্সের সহিত যোগ দিলেন, যাঁহারা স্থিতি-শীল তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় দুর্ব্বল এবং প্রকৃতি-সহানুভূতি-বিরহিত ছিল। এদিকে সাধারণ তন্ত্রের ভাব প্রজাদিগের মনে অদ্যাপি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল; সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলেই—লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকারে শিথিলিত ও পর্য্যুদস্ত হইলেই—ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সতত অভ্যুদ্যত। অষ্ট্রিয়ার সহিত সমরে ফ্রান্স জয় লাভ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষে লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত; সুতরাং ফ্রান্সে প্রজাদিগের নবীন উৎসাহে একটী নবীন সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারিত। এরূপ আত্মবিধ্বংসকারি কার্য্যে লুই কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ইতালীয় উদ্ধার সাধন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিনাশে তিনি তাহা করিবেন কেন? কার্ব্বোনারোদিগের এই বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

কিন্তু ফরাশি গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার দুইটী সহজ উপায় ছিল—প্রথমতঃ যদি কার্ব্বোনারোগণ ইতালীয় বিদ্রোহ দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের মনে ইহার প্রতি নিশ্চয়ই গভীর সহানুভূতি সমুদ্ভূত হইত; সুতরাং সাধারণ মত ইতালীর পক্ষ সমর্থন করিলে, ফরাশী গবর্ণমেণ্ট আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন না

করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—দ্বিতীয়তঃ প্রুসিয়ার সসৈন্য বেলজিয়মে আসার ন্যায়, অষ্ট্রিয়ার সসৈন্য পীড্‌মণ্টে আসা ফ্রান্সের চিরকালই অরুন্তুদ; বিদ্রোহ ইতালীর সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ পীড্‌মণ্টে—পরিব্যাপ্ত হইলে অষ্ট্রিয়া নিশ্চয়ই সসৈন্য পীড্‌মেণ্টে আসিয়া উপস্থিত হইত; ফ্রান্স ইহা কখনই সহ্য করিত না ; অগত্যা ফ্রান্সকে ইতালীয় বিদ্রোহের সাহায্য করিতে হইত।

অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া লুই ফিলিপের দয়া ও সমানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা উন্মত্ততা প্রকাশ বই আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গনিবারণী সন্ধির অনুরোধে অষ্ট্রিয়া বিদ্রোহী ইতালীর আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে, এরূপ আশা অধিকতর উন্মত্ততার কার্য্য সন্দেহ নাই। অষ্ট্রিয়া বরং আপনাকে সমর-সাগরে প্রক্ষিপ্ত করিবে, তথাপি স্বসন্নিকৃষ্ট লম্বার্ডো-ভিনিসীয় প্রদেশে স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইতে দিবে না।

তথাপি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কোন ও আয়োজন করিলেন না। এদিকে অষ্ট্রিয়া সময় পাইয়া ফ্রান্সের সহিত মনোরাগের যে সকল কারণ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইল, এবং ইতালী আক্রমণের জন্য সসজ্জিত হইতে লাগিল। তখনও বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট এই অমূলক বিশ্বাস ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে অষ্ট্রিয়া ইতালী আক্রমণ করিবে না এবং বিদ্রোহকে নির্ব্বিবাদে ইতালীর বক্ষঃস্থলে বদ্ধমূল হইতে দিবে ; এই জন্য বিদ্রোহিদিগের বিদ্রোহ-প্রণালীর এইটী প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল যে অষ্ট্রিয়া যেন ইতালী আক্রমণের কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ না পায়।

এই জন্য জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের প্রকৃত ঈশ্বর এবং জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের অধিকার সকলের এক মাত্র অধিকারী তাহা তাঁহারা কোন প্রকাশ্য বিধি দ্বারা খ্যাপন করিলেন না ; প্রজা-সাধারণকে যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইবার নিমিত্ত কোন ঘোষণা করা হইল না ; প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত হইল না ; ইতালীর সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকলকে ইতালীর সাহায্যার্থে অভ্যুদ্যত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার অনুরোধ পত্র প্রচারিত হইল না।

কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রত্যেক বিধিতে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। স্পষ্ট বোধ হইল যে বিদ্রোহ সকলেই অন্তরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্য রূপে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে বা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্ম্মা ও মডেনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদিগের রাজবংশ দেশ পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কোনও প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত না করায় তাঁহারা অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলোনাও ইহঁাদিগের অনুকরণে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন, যে তাঁহাদিগের গবর্ণর মসো ক্লারেলী রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করায় তাঁহারা অরাজকতা নিবারণের জন্য অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। যখন কৃতকার্য্যতা ও অন্তঃসারবত্তা নির্ভীক তর ভাষা অবলম্বন করিতে বলিল তখনও বলোনার গবর্ণমেণ্ট কাপুরুষোচিত ভাষা অবলম্বন করিলেন এবং প্রজা সাধারণের অনন্ত অধিকার সকলের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা না করিয়া ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকলাসের সহিত বলোনার যে সন্ধি হয়, তাহাই তাঁহারা বলোনার স্বাধীনতার মূল বলিয়া খ্যাপন করিলেন।

পার্ম্মার জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব ফেডিলি নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হয়। ফেডিলি রাণীর * নিকট অনুমতি না লইয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন; এবং তাঁহাদিগের মূর্খতার প্রতিফল স্বরূপ ফেডিলি কর্তৃক প্রতারিত হইলেন। ফেডিলি রাণীর সহযোগে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল ষড়যন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। বিদ্রোহের চরম সীমায় যখন তাঁহাদিগের কোষ শূন্য-প্রায় হইয়া পড়িল, তখনও হুকুম জারি হইল যে নির্ব্বাসিত রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণের যেন রীতি মত বেতন প্রদান করা হয়।

যৎকালে নেপল্‌স, এবং পীড্‌মণ্ট প্রভৃতি ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-শিখা প্রজ্বলিত হইতেছিল, বিদ্রোহকেন্দ্র বলিয়া যৎকালে বলোনার দিকে সকলেরই নেত্র নিপতিত ছিল, সেই সময়েই ১১ই ফেব্রুয়ারী—বলোনা লজ্জা ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আইন জারি করিল যে "বলোনা অন্যান্য রাজ্যের সহিত সখ্যভাব নষ্ট করিতে চায় না—বলোনা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কোন প্রকারেই শান্তি ভঙ্গ করিবে না; এবং ইহার পরিবর্ত্তে বলোনা আশা করে যে অন্যান্য রাজ্যও বলোনার বিরুদ্ধে স্বতঃ পরতঃ কোন প্রকারে শত্রুতাচরণ করিবে না; এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই বলোনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না।" এই কার্য্যে বিদ্রোহের কেন্দ্রীভূত বলোনা তাহার মৌলিকতা † পরিত্যাগ করিল; এবং ইতালীর জাতীয় লক্ষ্য হইতে তাহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিল। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না, যাহারা বিদ্রোহের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, তাহারা বলোনার ব্যবহারে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়ার বিশেষ কারণ পাইল; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিল যে বিদ্রোহ কোনমতেই কৃতকার্য্য হইবে না।

* Duchess of Parma.

† Initiative.

প্রাচীন ষড়যন্ত্রীরা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যখন বলোনা বিদ্রোহ হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ়তম কারণ নিগূহিত আছে। এই কাপুরুষদিগের সন্দেহ-উদ্দীপনায় বিদ্রোহিদিগের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহাদিগের হৃদয় অর্দ্ধভগ্ন হইল। উৎসাহ, অধ্যবসায়, ও যুগপৎ কার্য্যানুষ্ঠান বিপ্লব সাধনের নিদানীভূত; এই তিনের সমবায়ের উপর তাঁহাদিগেব অবিচলিত বিশ্বাস টলিয়া গেল। তাঁহারা এখন হইতে ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন; ঘটনাস্রোত যে দিকে যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন—তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য, তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম বিদ্রোহের পতন।

লম্বার্ড়ীর প্রতিনিধিগণ বলোনায় অতি হতাদরে গৃহীত হইলেন; লম্বার্ডেরা ইহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; এবং কার্য্যানুষ্ঠানের আশা তাঁহারা মন হইতে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অবিচলিত অধ্যবসায় ও বীরোচিত সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন।

বলোনার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় রাজ্যের সাহায্য প্রত্যাশায় আত্মরক্ষক ও পরধর্ষণ উভয়প্রকার যুদ্ধের আয়োজনে বিরত রহিলেন। মিলিসিয়া সংগঠন করার প্রস্তাব হইল—গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখান করিলেন। আঙ্কোনার দুর্গের পুনঃসংস্কার করা হইল না। সেনাপতি ঝুচি যে ছয় রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন তাহা অনুমোদিত হইল না। সার্কগ্‌নেনী রোমের বিদ্রোহোন্মুখতা দর্শন করিয়া রোম আক্রমণ করার যে প্রস্তাব করেন তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। রোমের ক্যাপিটল্‌ হইতে বিদ্রোহ-পতাকা উড্‌ডীন হইলে ইতালীয় জাতির অন্তরে যে কি অনিবার্য্য বল প্রদীপ্ত হইত, বলোনার মন্ত্রিসভা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন নাই।

পুনঃ পুনরাবৃত্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইতালীয় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কুরিত অসন্তোষের ভাব প্রশমিত করা হইল বটে; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোনবারই কার্য্যে পরিণত করা হইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারীর কঠোর বিধি দ্বারা প্রতিকূল সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করা হইল। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে বিধি বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই—যে কোন লেখা দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত বলোনার বর্ত্তমান সখ্যভাব বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কোন বিক্রেতা তাদৃশ সংবাদপত্র পত্রিকা বা পুস্তকাদি বিক্রয় করিতে

পারিবে না; এই বিধি সত্ত্বেও বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে হয় অর্থদণ্ড নয় কারাবাস সহ্য করিতে হইবে।

ঈদৃশ কাপুরুষতার অনিবার্য্য প্রতিফল স্বরূপ বলোনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সকল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রতারিত ও পরিত্যক্ত হইল। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট বলোনার পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও দিল না। ফরাশী দূত রোম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় বলোনার পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিলেন; বলোনার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সংস্রবে না আসাই তাঁহার এরূপ বক্র গতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইত্যবসরে রুসিয়া—পার্ম্মা, মডেনা এবং রীজিয়ো আক্রমণ করিল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে বলোনা যদি অষ্ট্রীয়ার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া বলোনার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। বলোনা এই লুব্ধ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে "মডেনা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত বলোনার কোনও সংস্রব নাই; সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকল ও পররাষ্ট্র সকলের কার্য্যস্রোতের প্রতিঘাত না করা বলোনার অব্যভিচারী নিয়ম; আমাদিগের একান্ত অনুরোধ যেন কোন বলোনীজ্ পার্শ্বচর বা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত কোনও সংস্রবে না আইসেন"। তাঁহারা আরও আদেশ করিলেন যে "বিদেশীয়েরা সশস্ত্র বলোনার অন্তঃসীমায় পদার্পণ করিলেই তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরিত করা হইবে"। এই আদেশানুসারে সেনাপতি ঝুচি কর্ত্তৃক অধিনীত সপ্তশত মডেনীস্ সৈন্যকে ধৃত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হয়।

পার্ম্মা, মডেনা ও রীজীয়ো আক্রমণের পর অষ্ট্রিয়া ফেরারা আক্রমণ করিল? ফেরারায় পোপের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অবশেষে ২০এ তারিখে বলোনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সেনার হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া আঙ্কোনায় পলায়ন করিলেন। তথায় পঞ্চদিবস অবস্থিতির পর ২৫এ মার্চ্চ বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট কার্ডিন্যাল্ বেনভেনুটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আত্মসমর্পণের বিনিময় স্বরূপ তাঁহার নিকট কেবল ক্ষমা দান প্রার্থনা করিলেন। এই লজ্জাকর আবেদন পত্রে বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল সভ্যই স্বাক্ষরিত করেন।

যে নিয়মে বলোনা আত্মসমর্পণ করেন, অষ্ট্রিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা ভঙ্গ করিল এবং ৫ই এপ্রিল পোপও ইহার অনুমোদন করিলেন। ১৪ই ও ৩০এ তারিখের আদেশ অনুসারে—বিদ্রোহের কি অধিনায়ক, কি সাহায্যকারী, কি অনুমোদনকারী সকলেরই প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। ইহার সহিত বলোনার বিদ্রোহের অবসান হইল এবং বলোনার পতনে ইতালীয় অভ্যুত্থানেরও পতন হইল।

সেনাপতি ঝুচি ৭০ জন বিদ্রোহী সমভিব্যাহারে জলযানে দেশান্তরে পলা-

য়ন করিতেছেন, এমন সময় দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রিয় রণতরি তাঁহার জাহাজ ধৃত করিল এবং বন্দীভাবে তাঁহাদিগকে বিনিসে আনয়ন করিল। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল অষ্ট্রিয়ার আদেশানুসারে মডেনার ডিউক এই ভীষণ আইন জারি করিলেন যে "যখনই কোনও গুপ্ত প্রমাণ দ্বারা (প্রমাণাহরণকারীর সহিত বাদীর মোকাবিলা হইবার আশা নাই) নৈতিক নিশ্চয়তার সহিত জানা যাইবে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই প্রমাণদাতার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য যতই কেন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা যাউক না, তাহার সহিত সততই নির্ব্বাসন দণ্ড সংযোজিত হইবে"।

এই কঠোর বিধি ইতালীর কণামাত্রাবিশিষ্ট স্বাধীনতাও হরণ করিল—ইতালীর ভাবী অভ্যুত্থানের আশা সুদূর-পরাহত করিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ।

সজল প্রতীমা।

(১)

নিরখিনু প্রভাতের তরল কিরণে,
ঝরিত নীহার-বিন্দু গোলাপের দলে,
উষার অনিলে ফুল্ল পঙ্কজ বদনে,
দেখিনু চঞ্চল চারু মুকুতা বিমলে।

(২)

যেই প্রবেশিনু মম শয়ন-মন্দিরে,
আবরি বদন-পদ্ম সুনীল বসনে—
দেখিনু, বিষাদে মরি নয়নের নীরে,
ভাসিছে নয়ন-তারা, নিরানন্দ মনে।

(৩)

পাগলিনী বেশে বসি পর্য্যঙ্ক উপরে,
নীরবে কাঁদিছে বালা—চপলা হরিণী—
নিন্দিয়া নয়ন-পদ্ম নীল সরোবরে
মলিন সন্ধ্যায় যথা সরঃসোহাগিনী।

(৪)

নাহি সে মোহিনী মূর্ত্তি নয়ন-নন্দন,
পূর্ণিমা-রজত বিধু যথা নীলাম্বরে!
বিশ্ব-বিলাসিনী বেশ খুলিয়া এখন,
ভাসিছে বিরাগে আহা দুঃখের সাগরে!

(৫)

কুঞ্চিত চিকুরজাল বঙ্কিম খোঁপায়,
নহেক রঞ্জিত মরি! চুম্বিছে মেদিনী,
বেষ্টিয়া বদন খানি, যেন বরিষায়
চারু শশধরে ঘেরি নীল কাদম্বিনী।

(৬)

নিরখিয়া সেই মূর্ত্তি—বিষণ্ণ সজল!
অনন্ত সোহাগে মাখা সজল বদনে,
শিশির-সম্পাতে সিক্ত সুনীল উৎপল!
কহিনু আদর করে, ব্যথিত মরমে।

(৭)

"বদন সরোজ ফুল্ল আবরি বসনে,
কেন আজি ম্লানমুখী মানিনী আমার!
তোল দেখি ইন্দুমুখ, ইন্দুনিভাননে,
যুড়াও জীবন বর্ষি অমৃত আসার" ?

(৮)

শুনিল নীরবে বালা, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
দূরে গেল ম্লান মুখ শুকাল নয়নে
ঝরিত সলিল, যথা শিশির নিকরে
নব পঙ্কজিনী পত্রে দিনেশ কিরণে।

(৯)

পুনঃ বিকাশিল হাসি গোলাপী অধরে,
ফুটিল মল্লিকা কলি অমল ধবল!
সেই হাসি সুধাময় পশিল অন্তরে,
মোহিল নয়ন, যেন বিজলী চঞ্চল!

(১০)

চঞ্চল হইল মন, চঞ্চল যেমতি
তরল পারদ রেখা স্থির বায়ুমানে—
যবে দেব প্রভঞ্জন ভীষণ মুরতি
ধরি মাতে রুদ্র তেজে প্রচণ্ড সংগ্রামে।

(১১)

প্রশান্ত নীলাম্বুনাথ অনন্ত তুফানে
উচ্ছাসিয়া তরঙ্গিত হইল সত্বরে!
যেন অন্ধকারময়ী নিশি অবসানে
দেখা দিল ঊষা স্নানি সুবর্ণ নির্ঝরে।

(১২)

উন্মত্ত হইল প্রেম উচ্ছাসিত প্রাণ,
চুম্বিনু আবেশ-মত্তা-রমণী-অধরে!
অপার্থিব স্বর্গ-সুখ হল মূর্ত্তিমান্,
নিশ্চল নিষ্পন্দ তনু মুহূর্ত্তেক তরে।

(১৩)

রমণীর সুকোমল হৃদয়-আসন,
বিরচিত নন্দনের পারিজাত দলে!
রমণীর সুমধুর প্রণয়-মিলন,
ভ্রমর-চুম্বন চারু বসন্ত-কমলে!

(১৪)

সেই সম্মিলন-সুখে মোহিত হৃদয়,
পলকে ধমনীচয় বহিছে চঞ্চল,
বদনে বাক্যের স্রোত আর নাহি বয়,
মুদিত স্বর্গীয় সুখে নয়ন-যুগল।

(১৫)

পরিপূর্ণ প্রেম-সুখে হৃদয় যখন,
কে করে তখন আর বাক্যের কামনা,
হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শে ঘুচে অনুক্ষণ—
প্রণয়-বিদ্যুৎ-বলে সেই বিড়ম্বনা।

(১৬)

অধর অমৃত পানে, সুখের ভাণ্ডার
রমণীর বক্ষঃস্থলে তনু অচেতন!
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ চেতনা সঞ্চার,
পোহাল সুখের নিশি ভাঙিল স্বপন।

(১৭)

ভাঙিল সুখের স্বপ্ন দেখিনু আবার,
দরিদ্র-কুটীরে মরি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী!
বিচরে নয়ন-পথে, প্রেয়সী আমার,
ধরিয়া সুরম্য কান্তি বিশ্ব-বিনোদিনী।

শ্রীহঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন কাব্য।—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এখানি কবিতা গ্রন্থ। গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম না। ইহাতে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বা অলৌকিক সৃষ্টির কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না বটে, তথাপি গভীর হৃদয়-ভাব ও সুললিত ছন্দোবন্ধের কোনও অভাব দৃষ্ট হইল না। গ্রন্থকার সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা সংসারে জ্বালাতন তাহাদের ইহা ভাল লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই পথের অনুসরণ করা সকলেরই প্রার্থনীয় হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। সংসারীর এক সুখ—সন্ন্যাসীর আর এক সুখ। সংসারীর সুখ ভাবাত্মক, সন্ন্যাসীর সুখ অভাবাত্মক। সন্ন্যাসীর সুখকে প্রকৃত পক্ষে সুখ বলা যাইতে পারে না। ইহা দুঃখাভাবজনিত মানসিক শান্তি মাত্র। লোকে যতক্ষণ সংসার-সুখে সুখী থাকে, ততক্ষণ কখনই বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে চায় না। যে হতভাগ্যের সংসার-সুখের পথে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেই বিরাগী হইতে চায়; সুখে হতাশ হইয়া শান্তি মাত্রের অনুসরণ করে; কিন্তু সুখের বিন্দুমাত্র আশা থাকিলেও সে কখনই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে চায় না। বিশেষতঃ ভারতে বৈরাগ্যের ভাব এত প্রবল হইয়া আসিয়াছে, আর বৈরাগ্যে ভারতের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, যে যাঁহারা এখনও ভারতে বৈরাগ্য-সঙ্গীত গাইতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা ঘোর ভারতশত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। যাঁহারা মানব-জাতিকে ইহলোকের কর্ত্তব্যসাধনে বিরত করিয়া পারলৌকিক কর্ত্তব্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা পরলোক-বন্ধু হইলেও, ইহলোকের পরমশত্রু বলিয়া অভিহিত হইবেন।

নিসর্গসুন্দরী। শ্রীশারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এখানিও এক খানি কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "এখন উৎসাহ, লজ্জা, ক্ষোভ, তিরস্কার—কি যে আমার ভাগ্যের উপরি অলক্ষিত ভাবে বিরাজ করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" আমরা গ্রন্থকারের এতদূর হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। "নিসর্গসুন্দরী" অতিশয় সমাদরে গৃহীত না হউক, নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্রী হইবে না। তাঁহার এই প্রথম উদ্যম নিতান্ত বিফল হয় নাই। উদ্যম ভগ্ন না হইলে ভবিষ্যতে তিনি আরও ভাল কবিতা লিখিতে পারিবেন।

কুসুম-হার—নগেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা ওয়েলিংটন প্রেসে মুদ্রিত। এখানি যুবরাজ সাহিত্যের অন্তর্গত। যুবরাজের আগমনে যখন পলিতকেশ ব্যক্তিরাও খেপিয়া উঠিয়াছিলেন তখন নগেন্দ্রের ন্যায় বালক যে খেপিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বালকের লেখনী হইতে 'করুণা করিয়া পদধূলি দাও' ইত্যাদি বাক্য নিঃসৃত হইলে আমরা ততদূর বিস্ময়ান্বিত হইতে পারি না।

ভারতে যুবরাজ কাব্য।—শ্রীমধুসূদন সরকার প্রণীত। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা। এ খানিও যুবরাজ-সাহিত্যের অন্তর্গত। লেখক ইহাতে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির অনেক পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার শ্রম বিফল হইয়াছে। যুবরাজের নিকট তাঁহার ক্রন্দন অরণ্যে রোদন তুল্য হইয়াছে। তাঁহার জানা উচিত ছিল "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।"

তারকবধ কাব্য।—শ্রীশ্রীনাথ কুণ্ডী প্রণীত। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহোদয়ের দ্বারা পরিশোধিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহার রচনা মন্দ নহে। ইহার বিষয়টী আরও হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য অতি জঘন্য রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

হোমিওপেথিক সচিত্র পুস্তকাবলী।—শ্রীবসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ছয় আনা মাত্র। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপেথিক চিকিৎসক বাবু রাজেন্দ্র দত্তের উৎসাহে ও পরামর্শে প্রকাশক এই পুস্তকাবলীর প্রকটনে সাহসী হইয়াছেন। উক্ত চিকিৎসক মহাশয় ইহার পাণ্ডুলিপির সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং আবশ্যক মতে তাহাতে নূতন বিষয়েরও সংযোজন করিয়া দিয়া থাকেন। আর অমৃতবাবুও অনেক দিন হইতে হোমিওপেথিক চিকিৎসায় ব্রতী আছেন। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে এই পুস্তকাবলী ক্রয় করিয়া পাঠ করিলে পাঠকদিগের অর্থ ও সময় বৃথা ব্যয়িত হইবে না।

জাতিমিত্র।—প্রথমভাগ। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণ আহরণ পূর্ব্বক কোন কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। সংপ্রতি কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়-জাতি ও বল্লালবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং তাহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কায়স্থকৌস্তুভ, কায়স্থকৌমুদী, কায়স্থদর্পণ, কায়স্থনৃপ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থেরও প্রচার করিয়াছেন। জাতিমিত্র সেই সকল গ্রন্থের প্রতিবাদ। ইহা পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরিপূর্ণ। ইহা সম্পূর্ণ হইলে আমরা ইহার স্বতন্ত্র সমালোচনা করিব এবং এ বিষয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিব।

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বঙ্কিমবাবু এক বৎসর কাল কপালকুণ্ডলাকে গৃহিণী করিয়া রাখিলেন। এই এক বৎসরে কপালকুণ্ডলার বন্য প্রকৃতির কিরূপ প্রশমন হইয়াছিল তাহারই চিত্র উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরী সখী—বয়সের সমতা ও প্রকৃতির মধুরতা থাকাতে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার সহিত একপ্রাণ, একমন। মনুষ্য সামাজিক জীব। কপালকুণ্ডলা আশৈশব বনবাসিনী থাকিলেও গৃহধামে দুই দিন পদার্পণ করিয়াই শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া এখন আর সে কপালকুণ্ডলা নাই। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে; "স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে; এইক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জল, ভুজঙ্গের বৃহতুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনারও শিল্প-পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কেশের যে ভাগ বেণী মধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তরঙ্গলেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে। দুই কর্ণে হেম-কর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে।" এখন আর সমুদ্রতীরস্থ আলুলায়িত-কুন্তলা ভূষণহীনা কপালকুণ্ডলা নাই। গৃহধামে তাঁহার এই সমস্ত পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে শ্যামাসুন্দরী কেশ বাঁধিতে চাহিলে কপালকুণ্ডলা তাঁহার হাত হইতে কেশ গুলিন টানিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সকল কথায় 'ইহাতে কি সুখ' 'উহাতে কি হইবে' এইরূপ উত্তর করিয়া সংসারের অনভিজ্ঞতার কেমন স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন আর ততদূর অনভিজ্ঞতা নাই, ততদূর বন্য ভাব নাই। কিন্তু যে কপালকুণ্ডলা চিরকাল বনবাসিনী থাকিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে নির্ভীকমনে বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহার সেই বন্য প্রকৃতি কি এক বৎসরের অল্প কাল মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে পারে? আজিও সম্মুখস্থ নিবিড় কানন দেখিলে তাঁহার সেই সমুদ্রতীরস্থ বনাশ্রম সমুদয় মনে পড়িতে থাকে। আর এক একবার ইচ্ছা হয় সেইরূপ স্বাধীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কাপালিকের নিকট স্বাধীন ও নিঃশঙ্কভাবে

থাকিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে কেমন এক প্রকার নিবঙ্কুশ সাহসিকতা জন্মিয়াছিল, যাহা তাঁহার গর্ব্বিত বচনে ও নির্ভীক ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইত। তিনি শ্যামাসুন্দরীর নিকট বলিতেন :—

"যদি আমি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার সহিত রজনীতে বনে অনুগামী হইতে চাহিলেন কপালকুণ্ডলা অমনি গর্ব্বিত বচনে বলিলেন "আইস আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও" নবকুমার তাঁহার এই গর্ব্বে পরাজিত হইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আর একবার তাঁহার বন্য প্রকৃতি প্রবলা হইয়া উঠিল। তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে একাকিনী বনদেবীর ন্যায় নির্ভয়ে রজনীযোগে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র জ্যোৎস্নালোকে বনমধ্যে পূর্ব্বকার স্মৃতি সমুদায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি আর একবার সেই সমুদ্রতীরস্থ স্বাধীন বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা বলিয়া আপনাকে ভাবিতে লাগিলেন। বনমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলেন। সংসার সমুদায় ভুলিয়া গেলেন, শ্যামাসুন্দরীকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার ঔষধি উন্মূলিত হইল না। সম্মুখে অগ্নিবিভা দেখিয়া পূর্ব্বকার বনাশ্রম মনে পড়িল। কৌতূহল-পরায়ণা কপালকুণ্ডলা সেই আলোকের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। দেখিলেন বনমধ্যে কুটীর। তন্মধ্যে কাপালিকের ন্যায় কে যেন কাহার সহিত গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছে। কপালকুণ্ডলা আর একবার প্রকৃষ্টরূপে বনবাসিনী হইয়া গেলেন। তিনি নবকুমারের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিয়াও আর সংসারিণী হইতে পারিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াও শ্যামাসুন্দরীকে ভুলিলেন, নবকুমারকে ভুলিলেন। তিনি সমুদ্র, কানন, কাপালিক, ও কালীমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন "যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগর-হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত-রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয় গীত গাইতেছে। পশ্চিম গগণ হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে। আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণ বৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘ সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে স্থিরতা পায় না। বাতাস উঠিল; বৃক্ষ-প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে এক জন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে

তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল।” কপালকুণ্ডলা এই স্বপ্ন মধ্যে ভক্তবৎসলা ভবানীর আবির্ভাব দেখিলেন। গৃহে আছেন, বনেরই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন। রজনী হইলেই বনে যান, আবার আসেন। এখন কে তাঁহাকে গৃহস্থ-কন্যা বলিবে? এক বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছি এক বৎসর পরেও আবার সেই কপালকুণ্ডলাকে দেখিলাম। গৃহধামে এক বৎসরে তাঁহার অল্পই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু এই কপালকুণ্ডলাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি এই বনদেবীর চিত্র এই খানে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আর এ চিত্র ধরেন নাই, বোধ হয় ধরিতে পারিবেন না।

ধরিতে পারিবেন না, না, ধরিলে ভাল দেখায় না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে আর অধিক ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত নহে। কপালকুণ্ডলার জীবনে যতদিন ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত ছিল, ততদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে ঔপন্যাসিক পাত্রী রূপে চিত্রিত করিয়াগিয়াছেন। ইহার পর কপালকুণ্ডলা ক্রমশঃ গৃহিণী হইতে থাকিবেন। ঔপন্যাসিক ঘটনায় তাঁহার জীবন-স্রোত আর অধিক তরঙ্গিত হইতে পারিবে না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে যে অত্যল্প ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইতে পারে, সে ভাবের সহিত তদীয় পূর্ব্বকার জীবনের গাম্ভীর্য্য সমতুল্য হইবে না। এজন্য বঙ্কিম বাবু আর এ চিত্র ধরিতে সাহসী হন নাই। বঙ্কিম বাবুর সে কার্য্য নহে। স্থির বাস্তবিক ভাব চিত্রিত করা বঙ্কিম বাবুর কার্য্য নহে। ঔপন্যাসিকভাব বিরহিত হইলে, জীবনস্রোত যেরূপ স্থিরভাবে প্রবাহিত ও মন্দ মন্দ হিল্লোলিত হইতে থাকে সে জীবন-স্রোত চিত্রিত করা বঙ্কিম বাবুর কার্য্য নহে। বঙ্কিম বাবু কখন স্থির জীবনের চিত্র ধরিতে যাইবেন না, যাইলে তাঁহাকে তরঙ্গ-মালায় বিক্ষোভিত করিয়া ঔপন্যাসিকভাবে পূর্ণ করিয়া লইবেন। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ জীবন প্রবাহে ভীষণ তরঙ্গ লীলা আর সম্ভাবিত নহে বলিয়া, পরের কার্য্য পরের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী। তাঁহার কল্পনায় যতদূর ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইয়াছে কোন গৃহস্থ নারীর কল্পনায় ততদূর সম্ভাবিত নহে। তাঁহার বন্য প্রকৃতি সংসারানভিজ্ঞতার উপযোগিনী এবং তাঁহার স্বাধীনতা বন্যপ্রকৃতির উপযোগিনী। এই স্বাধীনতা, বন্যভাব ও একান্ত সংসারানভিজ্ঞতা হেতু তাঁহার প্রকৃতিকে উপন্যাসের প্রকৃত উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কোন বনবাসিনী ঋষিকুমারীর প্রকৃতিতেও এসমস্ত ভাবের একদা একাধারে সম্মিলন দেখিনা। কারণ ঋষিকুমারীর প্রকৃতি আশ্রমনিবাসে

কথঞ্চিৎ প্রদমিত, প্রশান্ত, ও পরিনিয়মিত হইয়া আইসে। ঋষির আশ্রমনিবাসেও সংসারের অনেক ভাব বিদ্যমান থাকে। সেখানে স্বাধীন প্রকৃতি উদ্দমিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না; ক্রমশঃ অধীনতায় নীয়মান ও বিনম্র হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদিগের কপালকুণ্ডলার আশ্রমে সেরূপ শিক্ষা ও বিনিয়ম কিছুই বিদ্যমান ছিল না। কাপালিকের আশ্রম ঋষির আশ্রম নহে। তাহা একজন তান্ত্রিকের যোগসাধনের ও বীভৎস ব্যাপার সম্পন্ন করিবার নিভৃত বনালয় মাত্র। কাপালিক ঋষি ছিলেন না, তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যানির্ব্বিশেষে ঋষির মত প্রতিপালন করেন নাই। তাঁহার যে প্রকার ভয়ানক উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে কপালকুণ্ডলা কেবল বনমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধা হইতে থাকিবেন এই পর্য্যন্তই আবশ্যক ছিল। সেই প্রয়োজনমত কপালকুণ্ডলাও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বনমধ্যে প্রবৃদ্ধ হইতে ছিলেন। কোন শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করে নাই, কোন সাধু এবং সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে তাঁহার প্রকৃতি উন্নত হয় নাই, সংসার ধামের কোন স্নেহময় ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃতি বিনম্র হয় নাই। তিনি প্রকৃতির হস্তে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে স্বভাবতঃই যে কোমলতা ও সরলতা ছিল তাহাই ক্রমশঃ স্বতঃই প্রস্ফুরিত হইতে ছিল। সেই কোমলতা হেতু তিনি নবকুমারের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। নহিলে তাঁহার প্রকৃতির স্বাধীনতা ও বন্যভাব দমন করিবার কিছুই ছিলনা। তিনি সংসারধামের কোন আদর্শই কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই প্রকার রমণীর কল্পনা নিশ্চয় উপন্যাস-উপযোগী। এ প্রকার রমণীকে উপন্যাস যে প্রকার ইচ্ছা কাল্পনিক কার্য্যক্ষেত্রে আনীত করিতে পারেন ও বিচলিত হইলে কল্পনার অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই কপালকুণ্ডলা এক বৎসর কাল সংসারিণী হইয়াও যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই উপলব্ধি হয়। অথচ তাহাতে উপন্যাস-সুলভ যেরূপ স্বাধীন ও সরলভাব বিদ্যমান আছে তাহা সংসারিণী কোন নারীরই উপযোগী হইত না। শ্যামাসুন্দরী সেরূপ স্বাধীন ও সরলভাবে কার্য্য করিতে কেন সাহসিনী হন নাই? শ্যামাসুন্দরীরই স্বার্থ, তাঁহারই ইষ্টসিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত বিব্রত হইয়া বনে গেলেন। অথচ শ্যামাসুন্দরী গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই জন্য বলি কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী।

আর এক কারণে কপালকুণ্ডলা আমাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য। শৈশবেই তিনি অনাথিনী রূপে বনালয়ে পরিত্যক্তা হয়েন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কাপালিকের আশ্রমে দর্শন করি। দর্শন করিয়া

যখন তাঁহাকে বনদেবীর ন্যায় নবকুমারের উদ্ধার সাধনে সচেষ্টিতা দেখি তখন বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের সে আনন্দ পরক্ষণেই নিরানন্দে পরিণত হইল। যখন শুনিলাম তিনি কাপালিকের কি দুরভিলষিত সিদ্ধির জন্য বনবাসে আবদ্ধা আছেন তখন আমাদিগের হৃদয় অমনি কপালকুণ্ডলার দুরদৃষ্টের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। শুদ্ধ নবকুমারের উদ্ধার সাধন নয়, কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন জন্যও আমরা ব্যাকুল হইলাম। অধিকারীকে শতবার ধন্যবাদ দিলাম তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে বিক্রীত হইলাম। নবকুমার আমাদিগের সাধন হইলেন। কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমারের সহিত পলায়ন করিতেছি, আর শতবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিতেছি পাছে কাপালিক অনুগামী হইয়া থাকে। আশঙ্কায় ও আনন্দে হৃদয় যুগপৎ উদ্বেলিত হইতেছিল। একবার কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের গৃহে আনিতে পারিলে হয়। আনিয়া সুখী হইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সুখ তিরোহিত হইল। কপালকুণ্ডলা ম্রিয়মাণা, কপালকুণ্ডলা সুখিনী নহেন, কাহার জন্য তবে সুখী হইব? ভক্তবৎসলা ভবানী কপালকুণ্ডলার ত্রিপত্র ধারণ করেন নাই। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিয়া সেই জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত শঙ্কিত থাকেন। আমরাও ভাবি কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। কাপালিক কি কুচক্র করিয়া কখন তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করে এই ভাবনায় অনুদিন চিন্তাকুল থাকি। সেই কাপালিক দেখি সপ্তগ্রামে উপস্থিত। আমরা অমনি ভয়ে অস্থির হইলাম। তাঁহার কুচক্রে নবকুমার পতিত হইলেন, নবকুমারের প্রতি রাগান্ধ হইলাম। কপালকুণ্ডলা প্রেতভূমে আনীত হইলেন। আমরা কপালকুণ্ডলার দুঃখে একবারে বিহ্বল হইলাম। জলোচ্ছাসে কপালকুণ্ডলা কোথায় অদৃশ্যা হইলেন। অমনি ইচ্ছা হইল জলে ঝম্প দিয়া পড়ি। কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন করিয়া আনন্দে কূলে উঠি।

মানবের জন্য মানবের হৃদয় এইরূপ কাঁদিয়া উঠে। যাহার জন্য হৃদয় কাঁদে, তাহাকে যেন আপনার বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য আপনার বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার দুঃখে আমাদিগের নয়ন অশ্রুধারায় পূর্ণ হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে নয়নাম্বু বিগলিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে নিতান্ত আপনার ও প্রিয় জ্ঞান করিয়াছি। দুঃখ-রাশির যতই বৃদ্ধি হইয়াছে ততই তাঁহাকে অধিকতর আপনার জ্ঞান হইয়াছে। তাঁহার দুঃখরাশি মোচন করিবার জন্য আমাদিগের যে কোন উপায় ছিল না, এই আমাদিগের দুঃখ, এই আমাদিগের একান্ত ক্ষোভের বিষয়। দুঃখ-পূর্ণ উপন্যাস পাঠের এই কুফল।

নায়িকার ইতিহাস দুঃখপূর্ণ না করিলে সে নায়িকা কখন পাঠকের হৃদয়গ্রাহিণী হয় না; পাঠকের অনুকম্পার ভাজন না হইলে, কেহ তাঁহার হৃদয় হরণ করিতে পারে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু যখন এক জনকে আপনার বলিয়া জ্ঞান হইল, তাহার সুখ দুঃখ আপন ভাগ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, এবং তাহার সুখ দুঃখে নিতান্ত অধীর হইতে লাগিলাম, তখন তাহাকে দুঃখে ও বিপদে নিপতিত দেখিলে কি স্থির থাকিতে পারা যায়? বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের অকল্যাণ বিমোচনের জন্য যেরূপ উদ্যোগী ও উন্মত্ত হইতে হয়, কাল্পনিক প্রিয়জনের অমঙ্গল দেখিলে কি তদ্রূপ হইতে ইচ্ছা হয় না? কল্পনা ও হৃদয় উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যথিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তবে প্রভেদ এই উপন্যাসে আমাদিগের চেষ্টা অগত্যা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদিগের কার্য্যশক্তি উত্তেজিত হইয়া আপনাপনি নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। উভয় পক্ষেই শোণিত সমভাবে উষ্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে সেই শোণিতের তেজ কার্য্যে পরিণত হয়—মানবজীবন সার্থক হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাল্পনিক ক্ষেত্রের দোষ এই, সেখানে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে পরের উপকারার্থ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিলেও কার্য্য করিবার কিছুই ক্ষমতা নাই। শতবার এইরূপ কার্য্যশক্তি অগত্যা নিবৃত্ত হইলে, তাহা আর উত্তেজিত হইতে চাহে না। হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। শোণিত উত্তপ্ত হইতে চাহে না; উত্তপ্ত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া পড়ে। কার্য্যশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আইসে। উদ্যোগ একেবারে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়। বৃথায় কল্পনাকে শতবার ব্যথিত করিবার এই দোষ। সর্ব্বদা দুঃখ-পূর্ণ উপন্যাস পাঠের এই বিষময় ফল। যিনি সর্ব্বদা এই প্রকার উপন্যাস পাঠ করেন তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ শীতল হইয়া আইসে; তিনি ক্রমশঃ উদ্যোগ-বিরহিত হইয়া পড়েন। প্রয়োজন কালে সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অনেক সময় নিরুদ্যোগী দেখা যায়।

কপালকুণ্ডলার দুঃখের জন্যই কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট এত প্রিয়তম হইয়াছেন। তিনি আমাদিগের হৃদয়ের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দুঃখ ভাবিয়া আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যাই, তাঁহার রূপ যৌবন সকলই ভুলিয়া যাই। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দুঃখের ছায়ায় পবিত্র জ্ঞান হয়। তাঁহার প্রতি চাহিলেই আমরা বিষণ্ণ হই। কোন অপবিত্র ভাব আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে না। হৃদয়ের বিষাদ মন্দিরে তাঁহার দেবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখি। তাঁহার বিমলিন মুখচন্দ্রমা যেন রাহুগ্রস্ত, ছায়াবিবর্ণিত, বিকম্পিত শশধরের ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহার শান্ত

মুখচ্ছবি, যেন কুজ্ঝটিকা অবগুণ্ঠনাবৃত প্রভাবিরহিত রক্তিম সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় ম্লান হইতে থাকে। তাঁহার দুঃখরাশি তাঁহার মুখমণ্ডলে ছায়া প্রদান করিয়াছে। সেই দুঃখ-রাশির মধ্য হইতে তিনি অতি পবিত্র শান্ত মূর্ত্তিতে আমাদিগের মনে গভীরভাবে সমুদিত হন। তাঁহাকে দেখিলে শান্তির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি মনে উদয় হয়। দেখিলে মনে অতি পবিত্র শান্ত ভাবের উদয় হয়।) অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না। নয়ন পৃথিবীর দিকে নীয়মান হয়। মনে কি যেন ভাবনার উদয় হইতে থাকে। যেন দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি। আবার সেই স্নিগ্ধমূর্ত্তির প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করি, নয়ন শীতল হয়। কারণ সে মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল বিভা কিছুই নাই। ঐ দেখ আলুলায়িত-কেশমণ্ডল-সমাবৃত বিমলিন মুখচন্দ্রমা অতি স্নিগ্ধভাবে একদা আমাদিগের প্রতি, একদা উর্দ্ধদিকে ভক্তবৎসলা ভবানীর প্রতি ছল্ ছল্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। উহার মুখমণ্ডলে যেন ভাবনা মূর্ত্তিমতী হইয়া আছে। কপালকুণ্ডলার এই শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে কি মনে গভীর রসের সঞ্চার হয় না? তাঁহার মুখচ্ছবি কি উদাত্তভাবে পূর্ণ নহে? (বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলাকে এইরূপ দুঃখসমাবৃতা করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিকে আরও বিমোহিনী করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলার ন্যায় গভীর-রস-সঞ্চারিত উপন্যাস-ক্ষেত্রে উপযোগী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ দুঃখ-সমাবৃতা থাকাতেই কপালকুণ্ডলাকে অতি উচ্চ ও উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ দেখায়।

অনেক বয়সে কপালকুণ্ডলা সংসারে প্রবেশ করিলেন। অনেক বয়সপর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবহস্তে নবীন ও হরিৎ রহিয়াছে। সংসারের সুখদুঃখ ও প্রমোদ কিছুই জানেন না। কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানেন না। পতি, ভার্য্যার কি অমূল্য পদার্থ তাহাও কিছুই জানেন না। কি রূপ ব্যবহারে লোকের সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপাদিত হয় তাহাও কিছুই জানেন না। কোন বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার কিছুই নাই। অরণ্যকুমারীর এপ্রকার জ্ঞান থাকিবার কথাও নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আছে, সরল হৃদয়—যাহা রমণীগণের প্রধান সম্পত্তি। সেই হৃদয় লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন। সেই হৃদয় লইয়া তিনি অপরিচিত নবকুমারের সহিত বিদেশে আসিলেন। 'প্রণয় কিরূপ তাহা তিনি জানিতেন না। হৃদয়ে অনুরাগ মাত্রের সঞ্চার হইতেছিল। নবকুমার সেই নবমুকুলিত অনুরাগের পাত্র হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রণয় জন্মিল,—সরল প্রণয়। এই প্রণয়ই কপালকুণ্ডলার একমাত্র ধন ও বন্ধনী। সে প্রণয়বেগ কখন কোন প্রতিরোধ পায় নাই। সরলতা বশতঃ তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে শ্যামাসুন্দরীর প্রতি, কিয়ৎ পরিমাণে নবকুমা-

বের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রণয়বেগ আজিও এত প্রবল হয় নাই, যে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারের আবেগ সকল প্রদমিত করিতে পারে। সে প্রণয় কেবল মাত্র স্ফুরিত হইতে ছিল। আজিও ভক্তিবৎসলা ভবানীর প্রতি কপাল কুণ্ডলার শৈশব-ভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। আজিও সাংসারিকতা এত প্রবল হয় নাই, যে পরদুঃখকাতরা কপালকুণ্ডলা পরহিতে নিরত হইবেন না। আজিও প্রণয় এত প্রবল হয় নাই, যে লুৎফ-উন্নিসার সুখের জন্য সে প্রণয় বিসর্জ্জন দিতে অসঙ্কুচিত হইবেন না। কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আশৈশব যে সমস্ত ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল সে সমস্ত ভাব এত দুর্ব্বল নহে, যে বৎসরেক সংসার বাসে তাহা নবোদিত প্রণয়ের আবেগে পরাভূত হইবে। কারণ সেই সমস্ত ভাবই কপালকুণ্ডলার একমাত্র সম্পত্তি ছিল। সেই কতিপয় ভাবেই কপালকুণ্ডলা জীবিত। কপালকুণ্ডলা পৃথিবীর আর কিছুই জানিতেন না, কেবল বালস্বভাবসুলভ ভক্তি, ভয়, ও পরদুঃখে কাতরতা জানিতেন। তিনি পূর্ব্বে যাহা কিছু করিতেন, ইহাদিগেরই অন্যতম ভাবে প্রণোদিত হইয়া করিতেন। এই ভাবত্রয় তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল। পৃথিবীর জ্ঞান-বিরহিত হওয়াতে অন্যভাবে তিনি কখন বিচলিত হয়েন নাই। সুতরাং এই ভাবত্রয়ই শনৈঃ শনৈঃ প্রবল হইয়াছিল। প্রণয় কি তাহাদিগকে সহসা বিদূরিত করিতে পারে?

এই সংসারানভিজ্ঞা সরলা নব-প্রণয়িণী কপালকুণ্ডলার সহিত, ঘোর-বিষয়িণী চতুরা প্রেমবৃদ্ধা লুৎফ উন্নিসার কেমন সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ভাব। কপালকুণ্ডলা সরলতায় গৌরবান্বিতা, লুৎফ উন্নিসা গৌরবের ভগ্নাবশেষ। কপালকুণ্ডলা নবোদিত পূর্ণ-চন্দ্রমা, লুৎফ উন্নিসা হ্রস্বতেজ অস্তগামী সূর্য্য। এক জন জীবন পথে হৃদয়ালোক সহ স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন, অন্য জন হৃদয়তেজ সঙ্কীর্ণ করিয়া এক প্রকার জীবন পথে অস্তগামী হইতেছেন। অস্তাচলে অধোগামী হইয়া মনে করিতেছেন আবার উদয়াচলে নববিভায় সমুজ্জ্বলিত হইবেন, চন্দ্রমাকে শীঘ্র বিদূরিত করিয়া দিবেন। কাপালিক এমত সময়ে সন্ধ্যাগগণে ঘটনাজালের মেঘ আনিয়া দিল; ঝড় উঠিল। মেঘমণ্ডলী গগণ দেশে ব্যাপ্ত হইল। চন্দ্র উঠিল সূর্য্যও অদৃশ্য হইল। সকলই মেঘময়, কিছুই দৃষ্ট হয় না; নবকুমার কেবল চন্দ্র সন্নিকট ঐ তারকা মাত্র রূপে একাকী মেঘপার্শ্বে অস্পষ্ট ঝল্ ঝল্ করিতেছেন। ইহাই কপালকুণ্ডলার সমাপ্তি——মহান্ সমাপ্তি। এই গগণদেশে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার মন না গভীর ভাবে পূর্ণ হয়? বাহ্য মেঘাড়ম্বর ও অন্ধকার কাহার মনে না প্রবেশ করে? কেনা চন্দ্রমালোকের অভাব জ্ঞান করেন? এই গম্ভীর সমাপ্তি —এই গম্ভীর দৃশ্য কপালকুণ্ডলার ন্যায় গম্ভীর উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। আমরা এ দৃশ্য কখনই ভুলিব না। আমাদিগের

মন এ দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কে আবার মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে! চন্দ্রমা কবে মেঘোন্মুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণে অমৃত বর্ষণ করিবেন! বোধ হয় সে চন্দ্রমাকে দেখা আর আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। সেই জন্যই আমরা চন্দ্রমার অভাবে এত বিহ্বল হইয়াছি। কেবল কল্পনাতে তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি এখনও প্রভাসিত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ। শ্রীপূঃ——

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে সমস্ত ইংলণ্ডীয় লেখক সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লেখনী অনেক স্থলেই অমৃতের বিনিময়ে গরল ধারা বর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা জাতীয় গৌরব ও জাতীয় মহত্ত্ব-বিস্তার-প্রয়াসী হইয়া প্রকৃত ঘটনা-চিত্রকে অতিরঞ্জিত বা স্থলবিশেষে অরঞ্জিত করতঃ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ভারত-বক্ষে শোণিতময়ী ঘটনার অভিনয়ে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। এক দিকে ভারতভূমির কৃষ্ণবর্ণ সিপাহি, অপরদিকে বারিধি-হৃদয়-বিলসিত ইংলণ্ডের গৌরবর্ণ ইংরেজ, এই বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বয়ের সংঘর্ষে ৫৭ অব্দের সমর সমুপস্থিত হয়। এক্ষণে ইংলণ্ডের গৌরবর্ণ সম্প্রদায়ই সেই অতীত সাময়িক চিত্র চিত্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং এই চিত্রকরগণ যে স্বজাতীয় কার্য্য-পদ্ধতির চিত্রকেই অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। অনুচিত জাতীয়গৌরব-প্রিয়তা যাঁহাদিগের হৃদয়ে সঙ্কুক্ষিত হইয়া ঘটনার যাথার্থ্য এইরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাঁহাদিগের নিকট স্থলবিশেষে প্রকৃত সহৃদয়তার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সহৃদয়তার অসদ্ভাবই অনেক স্থলের ঐতিহাসিক পট কালীময় করিয়া রাখিয়াছে। যে পঞ্জাবের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমরা সিপাহি যুদ্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতেও এই অসহৃদয়তা এবং অনুচিত জাতীয়গৌরব ও অনুচিত ক্ষমতা-প্রিয়তা পরিস্ফুট হইবে।

অদম্য ব্রিটীষ্ সিংহ শনৈঃ শনৈঃ পঞ্জাব-ক্ষেত্রে স্বীয় একাধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিল-বিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই রজ্জুবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তেজস্বী ব্যক্তি অদ্যাপি শিখ্-সমিতির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের

ন্যায় নিস্তেজ করিতে সমুদ্যত হইলেন। লোক-ললামভূত কমনীয় কামিনীজনও এই কঠোর শাসন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ও তেজস্বিতা অপ্রতিহত রাখিবার আশয়ে পুরুষ ও নারী উভয় জাতির উপরই সমভাবে কঠোর দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রকৃত-পুরুষ-জনোচিত অটলতা ও তেজস্বিতার আধার হওয়াতে ইতঃপূর্ব্বেই ব্রিটীষ্ সিংহের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। এই কোপবহ্নির আশু নির্ব্বাণ জন্য তাঁহাকে বিধর্ম্মী-মুসলমান-জাতি-পরিবেষ্টিত সেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঝিন্দনের এই শোচনীয় পরিণামেও ব্রিটীষ্ কেশরীর কোপাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই বহ্নি কিয়ৎকালের জন্য প্রধূমিতাবস্থায় ছিল, এক্ষণে ঘোরতর বিদ্বেষ-পবনে বিধুনিত হইয়া তাহা পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝিন্দন আবার অপরাধিনী হইয়া ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে বিচারার্থ সমানীত হইলেন।

ব্রিটীষ্ জাতির বিরুদ্ধে মুল্তানবাসিদিগের অভ্যুত্থান ও তন্নিবন্ধন অভিযান-নিয়োজিত ব্রিটীস্ সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনার সম্বাদ জুলাই মাসের প্রারম্ভে লাহোর রেসিডেন্সীতে সমুপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মে মাসে মহারাণী ঝিন্দনের অদৃষ্ট-নেমি পুনর্ব্বার নিম্নগামী হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। আমরা ইংলণ্ড-প্রসূত ইতিহাস-রচয়িতৃগণের নিকট অবগত হই, মুলতানঘটিত গোল যোগের পূর্ব্বে লাহোর দরবারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অন্য একটী রহস্য-চক্র আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। মহারাণীর কতিপয় প্রিয় পাত্র এই চক্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিপাহিদিগকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই এই চক্রান্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল নিঃশঙ্কেই চক্রের গতি সমাহিত হয় নাই। সপ্ত-গণিত সেনাদলের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদিগের অধিনায়ক দিগকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করে। অন্যতম শিখ-সেনাপতি খান সিংহ ও মহারাণীর জনৈক বিশ্বস্ত পাত্র গঙ্গারাম এবিষয়ের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। অবিলম্বে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে এই প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ব্রিটীষ্ জাতির সমুদ্যত বজ্র কেবল খানসিংহ ও গঙ্গারামের জীবন হরণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ঘটনাসংসৃষ্ট অন্যান্য ক্ষুদ্র দোষাই ব্যক্তিগণের প্রতিও এইসূত্রে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হয়। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ বিপ্লবকারিদিগের দণ্ড বিধান করিয়া ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট্ অতঃপর মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি স্বীয় রোষকষায়িত দৃষ্টি নিপাতিত করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যাবৎ এই তেজস্বিনী নারী লাহোর দরবারের

নিকটস্থ থাকিবেন, তাবৎ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের ভদ্রস্থতা নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে একবারে পঞ্জাব ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল; কিন্তু কারণ অভাবে এতদিন এই অভীপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে খান সিংহ ও গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র-ব্যপদেশে রেসিডেণ্টের চিরসঞ্চিত মনোগত বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। সেখপুরের নির্জ্জন গৃহ আর ঝিন্দনের লাবণ্য-লীলাতরঙ্গের বিলাস-ভূমি রহিল না, রেসিডেণ্টের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রণজিৎ শাসিত পঞ্চনদ রণজিৎ রমণীকে জন্মের মত হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমুদ্যত হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপসিংহ রেসিডেণ্টের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, সুতরাং সারফ্রেড্‌রিক কারির* অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইলনা। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন দণ্ড-লিপি দলীপ সিংহের নামাঙ্কিত মোহরে সুশোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচারী দুইজন ব্রিটীষ সৈনিক পুরুষের সমভিব্যাহারে এই লিপি বহন করিয়া সেখপুরের ঝিন্দনাধিষ্টিত গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটল ভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত মোহর-সুশোভিত নির্ব্বাসন-দণ্ড-লিপির নিকট মস্তক অবনত করিলেন। অটলভাবে স্বীয় অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া চির জীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এক সময়ে যে লাহোর দরবারের সিংহাসনভাগিনী করিয়া ঝিন্দনের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যে লোক-ললামভূত-কোহিনুর-রত্নসমুজ্জ্বল লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভু-শক্তির নিকট অবনত মস্তক ছিলেন, সেই সৌভাগ্য-লীলা-তরঙ্গায়িত সুখ-বল্লীর বিলাসভূমি লাহোর পরিত্যাগ কালে ঝিন্দনের যেরূপ অটলতা ও বিকারশূন্যতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেখপুর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবের সীমা অতিবাহন সময়েও সেই অটলতা ও বিকারশূন্যতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। প্রকৃত বীরতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া মহারাণী ঝিন্দন স্বীয় দশাবিপর্য্যয়ের সাক্ষীভূত সেখপুরের আবাস-গৃহের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। যে পঞ্জাব তাঁহাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এতদিনের পর সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। ঝিন্দন দুঃখ-সঙ্গিনী সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া ইহ জন্মের মত সেখপুর হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে ফিরোজপুরে আনয়ন করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্রে,

---

*গতবারে প্রমাদবশত সারহেনরি কারি মুদ্রিত হইয়াছে।

হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি এই কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মেজর জর্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামা জনৈক ব্রিটীষ্ সৈনিক পুরুষের গ্রহযিতায় (custody) পরিরক্ষিত হইলেন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন ব্যাপার সমাহিত হইল। পঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধীর ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটী মাত্রও বারি-বিন্দু তাহার নেত্র-বিগলিত হইয়া দেহ অভিষিক্ত করিল না, যে বহ্নি পুটপাকের ন্যায় শরীর বিদগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটী স্ফুলিঙ্গও হৃদয়-চুল্লি হইতে উদ্গত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না, পঞ্জাব যোগ-নিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্য দোষে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দলীপসিংহ সুখময়-বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর ঈদৃশ দশা-বিপর্য্যয় তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ সংক্ষুব্ধ করিতে পারিল না। ভবিষ্য-জীবন ভবিষ্য-সংসার-তত্ত্ব অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক রেসিডেণ্টের বাল-বশীকরণসূত্রে পরিচালিত হইয়া অম্লানবদনে অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর বিসর্জ্জন দেখিলেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রিয়তম স্বামীর অতুল রাজত্ব সম্পৎ—প্রাণাধিক তনয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় সহবাস সুখ হইতে জন্মের মত বিচ্যুত হইয়া কারাবন্দিনী হইলেন, ব্রিটীষ্ সিংহ স্বীয় দুর্নিবার ভোগ-লালসার পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য অবিচলিত হৃদয়ে অম্লানভাবে বিশ্বসংসারে এই শোচনীয় ঘটনার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা প্রকৃত সহৃদয়তার ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনতি সহকারে একবার এই সকরুণ দৃশ্য স্মৃতি-পটে চিত্রিত করিতে অনুরোধ করি। একবার এই ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের দুরবগাহ রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া ন্যায়ের পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত সদ্‌বিচারের সহিত তাহার তারতম্য করিতে অনুরোধ করি। নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে অতীত কার্য্যকারণ আলোচনা করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ব্রিটীষ জাতির মধ্যেও ভারতবর্ষের কনিক ও চাণক্যাচার্য্য অথবা ইউরোপের মেকিয়াভেলীর মন্ত্রশিষ্য আছেন। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টও স্বার্থসাধন উদ্দেশে কূট রাজনীতির ব্যপদেশ অবলম্বন করিয়া অপরের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকেন। আমরা ব্রিটীষ সিংহের অদম্য তেজের নিকট মস্তক অবনত করিতেছি, সভ্যতা ও উদারতার নিকট মস্তক অবনত করিয়েছি, কিন্তু স্বার্থসাধিনী কূট রাজনীতির নিকট কখনও নতশির হই না। ঈদৃশী নীতি স্বয়ং নিষ্কামত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরস্বাপহরণে রত, অনাসক্ত ভাবে পরিচিত হইয়াও ভোগ-লালসার আয়ত্ত এবং ন্যায়ের অনুচারিণী রূপে প্রতিভাত

হইয়াও অপরের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। ভবিষ্যবংশীয় মনীষিগণ এই গরলময়-ফল-প্রসবিত্রী নীতির মন্ত্র-শিষ্যদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু পঞ্জাব এই নীতির মন্ত্রনাতি-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল জড়ত্বাবস্থায় কালাতিপাত করে নাই, যে অগ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা চির কাল তুষানলের ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার অলৌকিক শক্তি বলে অচিরাৎ এই জড়ত্ব সজীবতায় এবং অন্তর্নিগূঢ় তুষানল উদ্গত, লোলশিখ প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত পঞ্জাব অদৃষ্টচর মন্ত্রশক্তিবলে অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমা-প্রসাদে পুনর্ব্বার এই সর্ব্বসংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া বিষম অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

যখন ভ্যান্স্ আগ্নু ও আণ্ডার্সন মুলতানে সঙ্কটাপন্নাবস্থায় পতিত হয়েন, সেই সময়ে লেফ্‌টেনেণ্ট এডওয়ার্ডিস্ নামক জনৈক তেজস্বী যুদ্ধবীর বন্নুর বন্দোবস্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ভ্যান্স্ আগ্নু মুলতান দুর্গে আহত হইয়াই দ্রুতগামী অশ্বারোহী ফসিদ দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে তাঁহার ও তদধীনস্থ জেনারেল কর্টলাণ্টের নামে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র জেনারেল কর্টন্যাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধারে সংরক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিল। ২২এ এপ্রেলের অপরাহ্ন-কালে এড্‌ওয়ার্ডিস দেরা ফতে খাঁর শিবিরে বসিয়া চৌর্য্যাপরাধের বিচার করিতেছিলেন এমন সময়ে ফসিদ দ্রুতগতিতে কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। এড্‌ওয়াডিস্ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অবগত হইয়া উহা স্বয়ং উন্মোচন পূর্ব্বক ভ্যান্স আগ্নুর স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন। আগ্নুর এই পত্রে তাঁহাদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এড্‌ওয়াডিস্ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, কিরূপে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে মুলতানে উপস্থিত হইবেন, কিরূপে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে শত্রু-সমষ্টির ভীষণ করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি যে কার্য্য সম্পাদন উদ্দেশে বন্নুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর তদীয় মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। এড্‌ওয়ার্ডিস্ অবিলম্বে রেসিডেণ্ট সার ফ্রেড্‌রিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখিয়া স্বল্পমাত্র সৈন্য ও কামান—যাহা পাইলেন, তৎ সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদী উত্তরণ পূর্ব্বক মুলতানের নিকটবর্ত্তী লিয়ানগরে সমুপস্থিত হয়েন। এই অভিযানের প্রাক্কালে এড্‌ওয়ার্ডিস আগ্নুর নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু

এই পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিপ্লব কারিদিগের অস্ত্রাঘাতে আগ্নু ও আণ্ডার্শনের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। এড ওয়ার্ডি স পথিমধ্যে স্বদেশীয়দিগের এই শোচনীয় পরিণামের সম্বাদ অবগত হয়েন। তিনি যাহাদিগকে রক্ষা করিতে স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মুলতানে গমন করিতেছিলেন, তাহারা যখন বিদেশে বিপাকে মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেন তখন এড্ওয়ার্ডিসের প্রতিহিংসা বৃত্তি নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিল, মুলতান জয় ও মুলরাজের সর্ব্বনাশ সাধনই তিনি বীজ মন্ত্র স্বরূপ গণনা করিতে লাগিলেন। মুলতানের ৫০ মাইল দক্ষিণে ভাওয়ালপুর নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, এই রাজ্যের অধিনায়ক ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশিষ্ট ঘনিষ্টতা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এড্ওয়ার্ডিস এতন্নিবন্ধন আশা-সন্ধুক্ষিত হৃদয়ে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের নামে ভাওয়ালপুরের নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, নবাব সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য এড্ওয়ার্ডিসের সহিত সম্মিলিত হইল। এতদ্ব্যতীত জেনারেল কর্টন্যাণ্ট্ ও লেফ্টেনেণ্ট লেক প্রভৃতি ব্রিটীষ্ যুদ্ধ বীরগণও এড্ওয়ার্ডিসের পৃষ্ঠ-পূরক হইলেন। তদীয় সৈন্যবল কেবল এই বিভিন্ন দলের সংযোগেই পরিপুষ্ট হয় নাই। লাহোর দরবারের রাজা সের সিংহের অধীনে এক দল যুদ্ধ-কুশল শিখ সৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল। এড্ওয়ার্ডিস এই সমস্ত পৃষ্ঠ-পূরক সৈন্য দল লইয়া মুল-রাজের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে সার ফ্রেডরিক কারি তাঁহার সাহায্যার্থ এক দল ব্রিটীষ্ সৈন্য পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনুজ্ঞা লাভের নিমিত্ত ২৭এ এপ্রেল প্রধান সেনাপতির নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। উষ্ণ কোটিবন্ধের এই উষ্ণপ্রধান নিদাঘ সময়ে সারহিউ লক্ সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তিনি বর্ত্তমান সময় যুদ্ধের অনুপযোগী বলিয়া সৈন্য প্রেরণ আপাততঃ স্থগিত রাখিতে আদেশ করিলেন। গবর্ণর জেনরেলও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানতম কর্তৃপক্ষের এই মীমাংসা রেসিডেণ্টের মনঃপূত হইল না। গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির সহিত সারফ্রেডরিককারির এইরূপ মত-বৈষম্য সজ্ঘটিত হওয়াতে হারবার্ট এড্ওয়ার্ডিসের হৃদয়ও সংক্ষুব্ধ হইল। মে ও জুন এইরূপে অতিবাহিত হয়। জুলাই মাসের প্রারম্ভে মুলতান দুর্গের দৃঢ়তা ও বল-বহুলতা দেখিয়া এড্ওয়ার্ডিস্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হয়েন। সার ফ্রেডরিক্ পুনর্ব্বার এই বিষয় প্রধান সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন। এবারেও লর্ড গফ্ পূর্ব্ব সঙ্কল্প হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ডেলহৌসী ও সার জন্ লিটলার নামা জনৈক সেনাপতি শ্রেষ্ঠেরও মস্তক সঞ্চালিত হইল। কিন্তু এবারে

সার ফেডরিক কারি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রিটীষ্ শাসন-সমিতির প্রধানতম অধিনায়ক ত্রয়ের যুগপৎ মস্তক সঞ্চালনে তাঁহার দৃঢ়তর সঙ্কল্প পর্য্যুদস্ত হইল না। তিনি কিনেরি ও সুদসাং সমরক্ষেত্রে বিজয়শ্রীকে এড্ওয়ার্ডিসের অঙ্কশায়িনী দেখিয়া সোৎসাহচিত্তে নিজের স্কন্ধে সমুদয় দায়িত্ব নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাম্প্সন্ লুইস নামক জনেক সেনাপতিকে ব্রিটীষ্ সৈন্যদল ও কামান লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং অবিলম্বে ব্রিটীষ্ তেজ মুলতান বিধ্বস্ত করিতে অভ্যুদিত হইল।

ক্রমশঃ

প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ।

Devotion wafts the mind above,
But heaven itself descends in love.

"ভক্তিতে মনকে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, কিন্তু প্রণয়ে স্বর্গই স্বয়ং নামিয়া আসে।" বাইরণের এই কথার অর্থ কি? সংসারে অতি অল্প লোকই ইহার অর্থ বুঝিয়াছেন; অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ইহ সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে; অতি অল্প লোকেরই স্বর্গ দর্শন বা স্বর্গ উপভোগ হইয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে এই বাক্য আকাশ কুসুমবৎ; তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইবার উপায় কি? সংসারকে সাধারণতঃ স্বর্গ সৃজনের উপায় কি? নশ্বর মানব জীবনের কয়েক দিনকে অমর করিবার উপায় কি?——স্বর্গ এবং অমরত্বের কথা আসিল, আমরা স্বর্গের এবং অমরত্বের তাৎপর্য্য কি ব্যাখ্যা করিব।

স্বর্গ আর কিছুই নয়, উহার যতই কেন আড়ম্বর বর্ণনা আমরা শুনি না, উহা ইহলৌকিক সুখের মনসিজ (Ideal) রচনা মাত্র; এই নিমিত্ত বিভিন্ন দেশীয় লোকের বিভিন্ন প্রকার সুখাভিলাষ ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতে তাহাদের স্বর্গের রচনা বিভিন্ন প্রকার। সৌন্দর্য্যের তারতম্য তাহার দুইটি গুণের দ্বারায় বিচার হইতে পারে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য যে পরিমাণ অন্তর-আকর্ষণ কারী, এবং যে পরিমাণে অন্তর অবরোধ কারী সেই পরিমাণে উহার তারতম্য বিচার হইয়া থাকে। কোন সৌন্দর্য্য অন্তঃকরণকে ঈষৎ আকর্ষণ করিল এবং এক মুহূর্ত্তমাত্র অবরোধ করিয়া রাখিল; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য অন্তঃকরণকে সকল বন্ধন কাটাইয়া উহার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে, এবং আজীবনকাল উহাতেই অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের

পরাকাষ্ঠা। উপভোগের তারতম্য বিচার, শরীর এবং অন্তর্ব্বৃত্তি সকলের শিথিলতার তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। একটি সুমিষ্ট ফল ভোজনে জিহ্বার সূক্ষ্মশির সকল এবং উহা সুঘ্রাণযুক্ত হইলে নাসার সূক্ষ্ম শিরা সকল মাত্র শিথিল হইবে, এবং তদনুসারেঅন্তর্ব্বৃত্তিরও কিয়ৎপরিমাণ শিথিলতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু যে উপভোগ সামগ্রী একবারে সমস্ত শরীর ও অন্তঃবৃর্ত্তি সকলকে শিথিল, বিগলিত ও অবশ করিয়া ফেলিতে পারে সেই উপভোগ সামগ্রীই উপভোগের পরাকাষ্ঠা। এবং উক্তরূপ পূর্ণ-সৌন্দর্য্য এবং উপভোগ ক্ষেত্রই স্বর্গের সারাৎসার স্বর্গ। অমরত্ব অর্থে জড়তা-শূন্য, সদা-চেতন, অস্বপন ভাব। স্বর্গীয় পূর্ণসৌন্দর্য্য উপভোগ মাঝে মন কখন মৃতবৎ জড় হইয়া থাকিতে পারেনা; মন নিত্য জীবন্ত সদা চেতন অর্থাৎ অস্বপন ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে, এই নিমিত্তই স্বর্গবাসীদিগের অস্বপন একটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে এইরূপ অন্তঃকরণের পূর্ণ-আকর্ষণকারী সুখময় সৌন্দর্য্য ও উপভোগবস্তু যাহাদ্বারা মৃতবৎজড় মানবজীবন অস্বপন, অমরভাব ধারণ করিতে পারে তাহার বীজ ইহ সংসারে আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহারি একাধিপত্য বিস্তার দ্বারা সংসারকে স্বর্গধাম করা হইতেছেনা কেন? তাহার প্রতিবন্ধক কি, এবং সেই বস্তুই বা কি?

সেই বস্তুর নাম প্রণয়, এবং তাহার প্রতিবন্ধক স্বার্থ। মানবহৃদয়ের সদসৎ অভিধেয় যাবতীয় বৃত্তি নিচয় এই দুই মূল হইতেই সমুৎপন্ন, তন্মধ্যে সৎগুলি প্রণয় এবং অসৎগুলি স্বার্থের অন্তর্গত। স্বার্থ প্রণয়ের প্রকৃতি-বিচ্ছেদক শত্রু প্রণয়ে স্বার্থের সংস্পর্শও সহ্য হয়না। বর্ত্তমান অবস্থার মানব সমাজের কার্য্যসাগরের তরঙ্গাবলি এই দুয়ের দ্বন্দোত্থিত মাত্র। যাবদীয় মঙ্গল ইহাদিগের স্বাতন্ত্রী প্রসাবিত ফল, এবং যাবদীয় অমঙ্গল ইহাদিগের সংপর্শের দ্বন্দোত্থিত ফল। আমরা বর্ত্তমান সমাজের সহিত—প্রণয় ও স্বার্থের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা ভাব কিরূপ তাহা দেখাইতেছি।

আজ্ কাল আমরা দেখিতে পাই স্বার্থের দ্বারাই প্রায় সংসারের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। যে অন্ন বস্ত্র আমরা নিত্য উপভোগ দ্বারা জীবন ও লজ্জা রক্ষা করিতেছি, যে অর্ণবযান, রেলওয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে বিবিধ সুখ স্বচ্ছন্দের দ্রব্য বিনিময় করিয়া ফিরিতেছে, স্বার্থই ইহাদিগের নেতা, এমন কি সংসারে স্বার্থ-বিরহিত সমুৎপন্ন ফল অতি বিরল। স্বার্থেই মানুষের আজ্ কাল যাহা কিছু অস্বপন জীবন্ত ভাব দেখিতে পাই; স্বার্থ সাধনেই মানুষ দিবারাত্রি খাটিতেছে, স্বার্থ রক্ষার্থে অপরের সহিত দ্বন্দ করিতেছে, স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্ত বল বিক্রমে দুঃসাহসিক কার্য্যে নিমগ্ন হইতেছে, স্বার্থের জন্য প্রাণ

হারাইতেছে, অতএব স্বার্থই মানুষের জীবনের জাগ্রত ভাব; স্বার্থই মানুষের এখন মনুষ্যত্ব। স্বার্থের গন্ধ-মাত্র-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষের যে কাজ তাহা অতি বিরল; এবং যাহা কিছু আছে তাহারও জীবন্ত জাগ্রত ভাব নাই, সুতরাং তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্বও অতি অল্প। মনুষ্যত্ব অর্থে আমরা মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের পরিস্ফুট ভাবকে কহিতেছি; হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি স্বার্থ-মূলক ভাব সকল যে হৃদয়ের বৃত্তি,—দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি প্রণয়-মূলক ভাব সকলও সেই হৃদয়ের বৃত্তি; অতএব তাহার যে গুলিই কেন বিস্তারিত হইয়া হৃদয়কে পরিস্ফুট করে আমরা ভাল মন্দ নৈতিক বিচার আগে রাখিয়া তাহাকেই মনুষ্যত্ব কহিব। ভাল মন্দ নৈতিক জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা স্বার্থ-মূলক জীবন্ত বৃত্তি সকলকে হেয়, ও প্রণয়-মূলক বৃত্তি সকলকে আরাধ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমরা ইহার কারণ দেখাইতেছি।——

যুগ যুগান্তরে মানুষের অবস্থা অনুসারে নীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে; মানুষের এক অবস্থায় যে সকল বিধান প্রয়োজনীয় বা উপযোগী হয় সেই অবস্থায় ঐ সকল বিধান সুনীতি, এবং তাহার পরিবর্ত্তনে ঐ সকল নিষ্প্রয়োজন ও অনুপযোগী হইলে, উহা দুর্নীতি রূপ ধারণ করে; এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী নূতন বিধান সকল তখন আবার সুনীতি রূপ ধারণ করিয়া থাকে। মানুষ অতি আদিম অসামাজিক অবস্থায় যখন পৃথক্ পৃথক্ বাস করিত তখন তাহার শুভাশুভ অপরের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল নিজের উপরই নির্ভর করিত; সুতরাং তৎকালে মানুষ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হেতুক নিজের ইষ্ট সাধন জন্য অপরের ইষ্ট ধ্বংস করা অন্যায় ভাবিতে পারিতনা; তৎকালে যে কোন উপায়ে নিজার্থ-পোষণ-দ্বারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা আয়ত্ত করিতে পারা যায় তাহাই সুনীতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা এখানে দেখিতে পাই, কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি যত চৌর্য্যবৃত্তি-নিপুণ বা জীবনে যত বেসী নরহত্যা করিয়া নর-শিরে আপন ভবন সুসজ্জিত করিতে পারে, সেই তত যশস্বী হইয়া থাকে। ঐ সকল অসভ্য জাতিরা যে সামাজিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অদ্যাপি অসামাজিক নীতির অনুসরণ করিতেছে, উহা কেবল তাহাদের সামাজিক নীতি-বিষয়ক অজ্ঞতা ও অসামাজিক জীবনের প্রকৃতি সামাজিক জীবনের উপযোগী করিতে না পারাতেই বলিতে হইবে। হারবার্ট স্পেন্সর ঠিক্ এই কথা বলিয়াছেন; তিনি কহেন, "মানব-কুল ক্রমে বহু-পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদিগকে একরূপ বাধ্য হইয়াই সমাজ-বদ্ধ হইতে হইয়াছে। এবং এক্ষণে মানব সমাজে যে সমস্ত অনিষ্ট বিদ্যমান, তাহা কেবল মানব-জীবন উক্ত সামাজিক জীবনের উপযোগী না হওয়াতেই

সমুদ্ভূত"। কিন্তু মানব জীবন সামাজিক জীবনের উপযোগী না হওয়ারি বা কারণ কি? ইহার কারণ তিনি এই কহেন, "মানব এখনো পূর্ব্বাবস্থার প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, আদিম অবস্থায় যে জীবন তাহার উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা উপযোগী হইতেছে না। আদিম অবস্থায় অন্যের স্বার্থ ধ্বংস পূর্ব্বক নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহা করিতে গেলে অনিষ্টোৎপত্তি হয়। মানুষের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি এই বলা যাইতে পারে, মানুষের পূর্ব্বজীবন-নীতি তাহার পূর্ব্ব অবস্থার উপযোগী হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান জীবন-নীতি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কিছু হওয়াই উচিত।"*

স্পেন্সর কহেন, মানুষের সেই রূপ ইচ্ছা সকলই পূর্ণ পরিতৃপ্ত হউক, যে রূপ ইচ্ছা সকলের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি অপরের ক্ষমতাকে দমন না করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।" †* তাঁহার মতে ইহারি উপযোগী বিধান সকলই বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের উপযোগী করিতে হইলে ইহাই কি সমযোগ্য হইবে? কোন ইচ্ছা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, অপরের উক্তরূপ ইচ্ছা পরিতৃপ্তির ক্ষমতাকে দমন না করিয়াই ভাল আমি

* "By the increase of population the state of existence we call social has been necessitated. Men living in this state suffer under numerous evils. By the hypothesis it follows that their characters are not completely adapted to such a state.—

But why is not man adapted to the social state? Simply because he yet partially retains the characteristics that adapted him for an antecedent state. The respects in which he is not fitted to society are the respects in which he is fitted for his original predatory life. His primitive circumstances required that he should sacrifice the welfare of other beings to his own; his present circumstances require that he should not do so; and in as far as his old attribute still cling to him, in so far is he unfit for the social state."

See Social *Statics, chap,* II Page 77, by Herbert Spencer.

* † It requires that each individual shall have such desires only, as may be fully satisfied without trenching upon the ability of other individuals to obtain like satisfaction.—Social Statics Page 77, by Herbert Spencer.

উহা পরিতৃপ্ত করিলাম, কিন্তু তাহাতেই কি হইল? মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ-ভাব ঘুচিল কৈ? মানুষের সহিত মানুষের যে পার্থক্য তাহাই রহিল, মানুষ আপন আপন চিন্তাতেই নিরত রহিল; কেবল একের ইচ্ছার বিরোধী অপরে হইল না মাত্র; কিন্তু একের সহিত অপরের সংযোগ হইল কৈ? সমস্ত মানবমণ্ডলী এক শরীর হইল কৈ? স্পেন্সরের উপরোক্ত অনুমান মানবকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক জীবনের উপযোগী করিবার ভাবে আসিয়াছে। ইংরাজ প্রকৃতির বলবৎ ভাব স্বার্থ ও স্বাধীনতা; ইংরাজ-নীতি-জ্ঞানও স্বার্থ ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যেরই প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ও ফরাসী সমাজনীতিজ্ঞান ইহার বিপরীত। ইহাদিগের মতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় স্বার্থজ্ঞানই তাহাদিগের সকল কার্য্যের নেতা হইয়া থাকে; স্বার্থজ্ঞান স্বাতন্ত্র্য অবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধ ভাব, অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিতে হইলে, স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবে, নচেৎ সামাজিক জীবন সংসাধিত হইতে পারে না। স্বার্থের সহিত মানুষ যে কোন্ অবস্থাতেই অপরের সহিত পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবে তাহার আশা নাই। সমাজের অর্থ একতা; অতএব একতা সম্পাদন করিতে হইলে তাহার বন্ধন মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সংস্থাপন। বংশবৃদ্ধিতে মানুষের যেমন বাধ্য হইয়াই সামাজিক জীবনের প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনি সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, সর্ব্ববিষয়ে একতাই তাহার মূল প্রয়োজন; এবং এই একতা আবার পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন বিনা কিরূপে হইতে পারে? এখন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত মানব-হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি আছে? উত্তর প্রণয়। স্বার্থ যেমন স্বাতন্ত্র্য জীবনের মূল বৃত্তি, প্রণয়ও তেমনি সামাজিক জীবনের মূল বৃত্তি হওয়া চাই। প্রণয়-অভ্যাস ভিন্ন মানুষের সামাজিক জীবন পাইবার আর কোন উপায় নাই। প্রণয় বৃদ্ধির দ্বারাই মানব সমস্ত মানব-মণ্ডলীর উপর আপন অধিকার বিস্তৃত দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক মানুষ সমস্বাধীন হইবে, নীতি বা নিয়ম সকল তীরোহিত হইয়া যাইবে, এক পরিবারের ভিতর নিয়মের প্রয়োজন কি? সকলের কার্য্যেই সকলে সন্তুষ্ট। এই সকল সুমহৎ মনসিজ (Ideal) সামাজিক ভাব, সুবিখ্যাত ফরাসিস পণ্ডিত কোঁমতের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের অন্তরে বিকসিত হয়, এবং উহা অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত লোভ-পরবশ জাতিদিগের আক্রমণে ভারতের এই সুমঙ্গলময় গতি রোধ হইয়া যায়; অদ্যাপি ভারতে পূর্ব্বাবশিষ্ট সামাজিক ভাবের যাহা কিছু বর্ত্তমান রহিয়াছে সভ্যতাভিমানী ইউরোপ ও আমেরিকার

সেই পদবী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে শতাব্দীর উপর শতাব্দী লাগিবে। ভারতে এই সামাজিক উন্নতি কতদূর এখনো কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, ভারতবর্ষে এই সামাজিকতা কত অন্তরে পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, তাহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া সেই ভাবটি দেখাইব। প্রণয়ভাব ভারতবাসীদিগের অন্তরে কতদূর ব্যাপ্ত ও উন্নত তাহা তাঁহাদিগের এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই বিদ্যমান আছে। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টিদ্বারা ভারতবাসীরা তাঁহাকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহার অভিপ্রায় মুক্তি। বাস্তবিক যদি মানুষ ঈশ্বরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ সাধনে সিদ্ধ হউক, তাহা হইলে মুক্তি লাভ হইবে। আমরা হয়ত এই শঙ্কট কথা বলিয়া বহুতর ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকের বিরক্তিভাজন হইলাম, আগামি প্রস্তাবে আমরা তাহার অপনোদনের চেষ্টা পাইব।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মেহের আলি।

নবম অধ্যায়।

রেঙ্গুন প্রদেশকে চট্টগ্রামীয়েরা রোসাঙ্গ কহে। ইংরাজেরা রেঙ্গুন অধিকার করিবার পূর্ব্বে, বাণিজ্য পোতে অথবা কখন ২ পদব্রজে কতিপয় চট্টগ্রামীয়েরা এই দেশে আসিত। রোসাঙ্গবাসী মগেরা চাষ করিতে অপটু, এজন্য এই সকল বিদেশীয়দের প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ আস্থা ছিল। যাহারা ক্লেশ করিয়া এত দূর আসিত, প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিত। কিন্তু দেশের যথেচ্ছাচার বিচার ভয়ে ও দূর বলিয়া অতি অল্প লোকেই তথায় যাইত।

যিনি একবার মগের মুল্লুকে পদার্পণ করেছেন, গৃহাদি ও লোকজনের আকার দেখিবামাত্র ভারত-সীমাতীতে আসিয়াছেন, জানিতে পারেন। ভারতের সে হর্ম্ম্য বা পর্ণকুটীর নাই। কাষ্ঠফলকময় দুই তিন হস্ত উচ্চ মেজের উপর কাষ্ঠ-ভিত্তি-পরিবৃত গৃহ-নিচয় বহুতর দোচালায় আচ্ছাদিত হইয়া গৃহ গুলির রমণীয় শোভা বিধান করিয়াছে। যাহার স্তরে স্তরে চাল সন্নিবেশিত হইয়া আকাশ মার্গে উঠিয়াছে, সেই অত্যুচ্চ গৃহ গুলিকে উপাসনা-মন্দির বলা যায়; মগেরা

তাহাকে "ক্যাং" ঘর কহে। অপেক্ষাকৃত নীচু অথচ সুন্দর পরিপাটী গৃহ পথিকের আবাস জন্য পথে পথে সন্নিবেশিত আছে, তাহাকে "চেরাং" অতিথিশালা কহে। পন্থা-পার্শ্বে যে সকল ছোট ছোট কুটীরে জলপূর্ণ কলস পথিকদিগের সৌকর্য্যার্থ থাকে সে সকল গৃহকে "রেফুংজা" কহে। অবশিষ্ট তাবৎ সাধারণ গৃহ অতি নিকট নিকট নিবেশিত। সাধারণ বস বাসের ঘরও ঐরূপ মাচাও দোচালাময়, কেবল তাহাতে বহুতর প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদিগকে "ইং" কহে। অধিকারী বুঝিয়া "ইং" গৃহের আয়তন, উচ্চতা সৌন্দর্য্য ও শোভার তারতম্য হয়। একটী অতি বিস্তীর্ণ সুশোভিত "ইং" ভবনের এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে এক বহু-মূল্য আস্তাবলে বসিয়া এক নব দম্পতি যুবক যুবতী কথোপকথন করিতেছেন।

যুবতীর বর্ণ অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ অথবা হংসডিম্বের ন্যায় ঈষদারক্ত শ্বেতবর্ণ বলিলেও বলা যায়। রমণীর রূপে সমগ্র গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, এবং সেই রূপের ছটায় মুখ-কমল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়াছে। এখন দেখিবা মাত্র চক্ষু ধাঁধিয়া যায়; একটু সুস্থির হইলে কৃষ্ণবর্ণ -কেশরাশি মস্তকে এবং রক্তবর্ণ "খাদি" অর্থাৎ অঙ্গাবরণ বক্ষঃস্থলে অতি শোভমান দেখা যায়। সুগোল মুখ-কমল, সুগোল গ্রীবাদেশ, ও বাহুদ্বয় অনাবৃত আছে, বক্ষঃস্থলের উচ্চ অর্দ্ধভাগও অনাবৃত। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও অঙ্গের পুষ্টতা ও কোমলতা দৃষ্টে সহসা মোমের পুত্তলিকার ন্যায় বোধ হয়। বিশেষ নিরীক্ষণ করিলে নাসিকা কিঞ্চিৎ নিম্ন, চক্ষু কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দেখা যায়। কিন্তু গণ্ডস্থল বদন ও চিবুক নির্দ্দোষ। সর্ব্বাঙ্গ সমগ্র ধরিলে উক্ত দোষ সকল বুঝা যায় না এবং রমণীকে পরমাসুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। বয়স অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণযৌবনা।

যুবার বয়স দ্বাবিংশ হইবে, বর্ণ মলিন বোধ হইতেছে। কিন্তু সুন্দরীর সমক্ষে ঐরূপ দেখা যায় নচেৎ তিনিও সম্পূর্ণ গৌরবর্ণ। যুবার লোচনদ্বয় বিস্তারিত— ঢল ঢল, নাসিকা সুপরিমিত, অঙ্গ সুদীর্ঘ ও বলবান্। যুবক যুবতীর দেহ তুলনা করিলে পরস্পর বিসদৃশ, কিন্তু উভয়ের জাতি-বৈশেষ্য মতে ঐ প্রভেদ রমণীয় হইয়াছে। যুবা সুন্দর পুরুষ, যুবতী সুন্দরী নারী; উভয়ের অতি উত্তম সম্মিলন হইয়াছে। উভয়ে নব-বিবাহিত দম্পতি। দেশ-রীত্যনুসারে আজ কয়েক দিন একত্র এক গৃহে বাস করিতেছেন। উভয়ে যেরূপ সুখী থাকা উচিত মুখের ভঙ্গীতে তাহার বিপরীত দেখা যায়। সুন্দরী যুবার মুখ পানে চাহিয়া অতি অমিয় ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন "প্রিয়তম! এ অধীনী এইরূপ অনাস্থার যোগ্যা হইবার জন্য কি অপরাধ করিয়াছে জানিতে না পারিয়া বড়ই ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছি। যদি মনে না ধরে থাকে, যখন

বিবাহ হইয়াছে তখন এরূপ হতশ্রদ্ধা করা কি ভাল দেখায়? ভাল আমিই যেন উপ-যাচিকা হইয়া তোমায় বরণ করেছি, কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ বিনা অলাভ কি হইয়াছে? আমি তোমার প্রভুকন্যা, তোমা অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহি, কেবল অপবাধের মধ্যে প্রণয় আমাকে তোমার দাসী করিয়াছে। সেই অকৃত্রিম অযাচিত প্রণয়ের প্রতিফল কি এই অনাস্থা, এই ঘৃণা? প্রথম রাত্রিতে মনে করেছিলাম অবস্থার বৈপরীত্যে সহসা মিলনে সঙ্কুচিত ও সলজ্জিত ছিলে। দ্বিতীয় রজনীতে মনে করিলাম অসম্ম-তিতে বিবাহ হইয়াছে বলে বিরক্ত হইয়াছ; সাধ্য সাধনায় জানিলাম তাহা নহে। জানিলাম তোমার এক প্রণয়িনী স্বদেশে আছেন, তদনুরোধে আমার সহবাসে কুণ্ঠিত, পিতাকে বলিয়া তোমার দেশগমনের অনুমতি লইলাম, তোমার সেই রমণীকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পাঠাইলাম তাহাতেও তোমার মন উঠে না। সুন্দর পুরুষ! আমি কি এতই হীনা এতই ঘৃণিতা, যে এক মুহূর্ত্ত জন্য আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ-পাত হইবে না? এই দেহ—যাহাকে পরিপোষণ করিতে শত শত দাসীর হস্ত ক্ষয় হইয়াছে—শত শত মুদ্রা পর্য্যবসিত হইয়াছে; এই রূপ—যাহার জন্য শত শত রসিক পুরুষ ক্ষিপ্ত হইয়া গি-য়াছে; এই ধন ঐশ্বর্য্য,—যাহার গৌরব দেশ দেশান্তরে প্রকাশিত আছে;—এবং এই বিমল প্রেমিক হৃদয়—যাহা লাভ করিলে উদাসীনেরও মনে স্নেহ-রস জন্মে; প্রিয়তম! এ সকলি বিধাতা তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছেন। অনায়াস-লব্ধ ব'লে কি এত অনাস্থা করিতে হয়? রমণীর কপোল অভিমানে আরক্ত হইল—অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইলেন। তাঁহার হস্ত যুবার হস্তে আবদ্ধ আছে।

যুবা বিস্ফারিত নয়নে সুন্দরীর অভি-মান-গম্ভীর বদনের প্রতি নিরীক্ষণ করি-লেন। তাঁহার আননে, লোচনে—ঘৃণা দেখা যায় না, তবে সাধুর ন্যায় অবঙ্কিত হৃদয়ে তিনি সকল কথা শুনিলেন। সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন, "সুন্দরী, যাহা বলিলে সকলি সত্য। তোমার রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য এবং প্রণয় যে সমাদর না করে সে পশু। কিন্তু আমি নিতান্ত অপাত্র ও হতভাগ্য। আমি অকপটভাবে তোমাকে বলিয়াছি, ভাগ্য সর্ব্বদাই আমার প্রতি বিমুখ। এক পরম শত্রুর হস্তে আমার পিতা মাতার জীবন, ধন, ঐশ্বর্য্য সকলি নিপাত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে আমার এক মাত্র হৃদয়ের বস্তু আছে, তাহারই জন্য এত দূর দেশে এসেছি। নরকেও আমার স্থান হইবে না যদি আমি সেই বস্তুকে উৎখাত করি। প্রণয় কি তুমি জানিয়াছ, অতএব আর কেন আমাকে লাঞ্ছনা কর? আমাকে পরিত্যাগ কর। আমা হইতে তোমার সুখ হইবে না।"

সুন্দরী বদন উত্তোলন করিয়া কহি-

লেন, "নির্দ্দয় পুরুষ! পুরুষ-হৃদয় কি এত সঙ্কীর্ণ যে দুইটীকে স্থান দিতে পারে না? তুমি মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া প্রণয়িনী সহবাস-সুখ লাভ করিবে তাহার উপায় করিয়া দিলাম। তুমি যে আপত্তি করিতেছ মিটাইতেছি, তাহাতেও তোমার আত্ম-গৌরব পর্য্যাপ্ত হয় না? আমি যদি তোমায় ছাড়িতে পারিতাম, এত অনুনয় করিতাম না। যখন তুমি হীন দাসভাবে এই ভবনে ছিলে তোমার রূপ গুণ দৃষ্টে আমি মনে মনে তোমার দাসী ছিলাম। যখন তুমি আমাকে পারস্য ভাষা শিখাইতে ও আমি তোমাকে মগ ভাষা শিখাইতাম, পরস্পর হৃদয়ের সম্মিলনই আমার অভিপ্রায় ছিল। তোমারই জন্য আমি তাবৎ নাগর-মণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যান করেছি;—তোমারই জন্য এতদিন অনূঢ়া ছিলাম। বিধাতা জানেন—আমি কত কষ্টে হৃদয়কে চেপে রেখেছি; কত কৌশলে তোমার পদোন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি পোষণ করিয়াছি। আহা! সেই সময়ই সুখের ছিল! যদি তুমি অধীনীর নয়নান্ত বালে না যাইতে, যদি পিতার জাহাজ লইয়া গালি বন্দরে না যাইতে, কদাপি আমি ভিতরের কথা প্রকাশ করিতাম না। মনে মনে সেই সুখ পাইতাম, যাহা হইতে মন প্রকাশে বঞ্চিত হইতেছে।

সুন্দরীর চক্ষে জল আসিল,—সমস্ত আনন আরক্ত হইল এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিতে না পারিয়া রুমাল মুখে দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। যুবা সহানুভূতিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না—আপন বস্ত্রে সুন্দরীর অশ্রুমোচন জন্য এক হস্তে তাঁহার গ্রীবা ধরিলেন ও এক হস্তে অশ্রু-মোচন করিতে করিতে কহিলেন; "মানিনি! তোমার সরল প্রেমিক হৃদয় কি আমি অশ্রদ্ধা করিতে পারি, না কখন করিয়াছি? তবে কি না——।" রমণী বিগলিত হইয়াছেন, নায়ক স্পর্শে আরও কাতরা হইয়া যুবার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া তাঁহার হস্তে বদন স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। যুবা কি বলিতেছিলেন মনোযোগ দেন নাই; পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া কহিলেন, "নির্দ্দয়! আমি তখন লজ্জা ভয় নিন্দা উপেক্ষা করিয়া প্রথমে মাতাকে, পরে পিতাকে মনের কথা বলিলাম। তাঁহারা তোমায় আস্থা করিতেন, অতএব পত্র লিখিয়া তোমাকে আনাইলেন; এবং যথারীতি আমাদের বিবাহ হইল। তোমার সমগ্র আপত্তি আমি খণ্ডন করিলাম, নির্দ্দয় পুরুষ! তথাপি তোমার দয়া হইল না। না হউক আমি তোমায় বড় ভাল বাসি, এজন্য তোমাকে বলিতে চাহি তুমি এই নির্দ্দয়তায় আপনার প্রতিও নিষ্ঠুর হইতেছ। পিতা কহিয়াছেন অদ্য রজনীতে আমায় পূর্ব্ববৎ অনাস্থা করিলে তোমার প্রাণ নাশ করিবেন, আর আমারও অনুরোধ মানিবেন না, তাঁহার বড়ই অপমান হইয়াছে।"

যুবার বদন পাংশুবর্ণ হইল। যে প্রণয়িনী-অনুরোধে এমন সুখ, ঐশ্বর্য্য,

প্রণয়ে পদাঘাত করিতেছেন, তাহাকে না দেখিয়া যে মর্ত্ত লীলা সম্বরণ করিবেন এ চিন্তা ধারণ করিতে অক্ষম। কোন্ কৌশলে পলায়ন করিতে পারেন ভাবিতে লাগিলেন। পরে সুন্দরীর হস্তদ্বয় নিজ হস্তদ্বয়ে ধরিয়া অনুনয় পূর্ব্বক বলিলেন "প্রেমময়ী! দাসের প্রতি যদি এত কৃপা, আর কয়েক ঘণ্টা ক্ষমা কর আমি মনের উদ্বেগ ফিরাই। এই অল্প বয়সে জীবন দিতে আমার ইচ্ছা হয় না।" সুন্দরী বুঝিলেন এই বারে সুফল হইয়াছে, অতএব স্নেহ বচনে বলিলেন "প্রিয়তম! আমার জীবন-দানে যদি তোমার হৃদয় স্রোত প্রত্যাবৃত্ত কি পরিবর্ত্তিত হইত, অকাতরে করিতাম। যদি আমি আত্মহত্যা করি নিশ্চয় তোমার মরণ; আর যদি কয়েক দিন তুমি এই-রূপ অবহেলা কর নিশ্চয় আমার মরণ। এজন্য উভয় শঙ্কটে পড়িয়া তোমায় অনুরোধ করিতেছি ইচ্ছা হউক বা না হউক, আমাকে গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং যদি আমি রমণী হই, আর তুমি পুরুষ হও, আমার মঙ্গল আমি করিয়া লইব।"

রজনীতে দম্পতি পুনর্ব্বার সেই কথোপকথনে পড়িলেন; কামিনী স্বামীর অঙ্ক-পার্শ্বে আসিয়া বাম হস্তে তাঁহার সম্মুখ চুল গুলি বিন্যস্ত করিতে করিতে কহিলেন, "প্রিয়তম! কি স্থির করিলে? মনের বেগ কি বাগ মানিয়াছে?" প্রিয়তম শঙ্কটে পড়িলেন; তাঁহার তাবৎ কৌশল ও উত্তর ফুরাইয়াছে। একটী মাত্র কৌশল বাকি আছে, তাহাই সমস্ত দিন ঠিক করে রেখেছেন নিষ্কৃতির শেষ উপায়। যুবা কহিলেন, "প্রিয়ে! ভাবিয়া দেখিলাম যে তোমার ন্যায় প্রেমিকা পরিত্যাগে আমার কোন লাভই নাই। তোমার প্রতি যে আমার মন যায় না তাহা নহে; আমিওত রক্তমাংস-ময় নব বটি। আমার দেশস্থ প্রণয়িনীর অনুরোধ যে এত দুর্দ্দান্ত হইতেছে তাহাও সব ঠিক নহে। অযাচিত প্রেম বলিয়া অনাস্থা করিতেছি, তাহাও নহে, আর আমি যত আপত্তি করিয়াছি সকল ঠিক নহে। অনেক আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আমার মস্তিষ্কের কিছু গোলোযোগ হইয়াছে। মন ও শরীর এমত জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে যে রমণী-রমণেচ্ছা দূরে যাক, আহারেচ্ছা, জীবনেচ্ছাও নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের কখন অভ্যাস নাই—একটী গৃহে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকি। আর তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত অবিচ্ছেদে এই গৃহে আছি। অনাবৃত আকাশ দর্শন, স্বাধীন বায়ুস্পর্শ ও অনাবদ্ধ ভূমি পরিচারণে বিমুখ হইয়াই বুঝি এমন দশা হইয়াছে। কতবার ইচ্ছা হয় তোমার তোষণ করি, কিন্তু শরীর ও মন বয় না। তাই বলি এক বার আমাকে মুক্তি দাও, আমি কারাগারলব্ধ জড়-বুদ্ধি মোচন করি; এবং তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সেবায় অনুরাগী হইব।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবা রমণীর গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতেছিলেন; অবস্থা ও ভাবে রমণীর বিশ্বাস হইল ঐ কথা প্রকৃত প্রস্তাবিত। অতএব তিনি সদয় হইয়া কহিলেন "স্বামিন্! আমাদের বিবাহের নিয়ম ৭ দিন ৭ রাত্রি একত্র বাস; যদি তাহাই তোমার বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে আমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে সম্মত আছি। কল্য প্রাতে তুমি যথা ইচ্ছা ভ্রমণ ক'র, কিন্তু আহারকাল মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে; আমি পুরবাসিদিগকে তোমার কথা বুঝাইয়া দিব, কেহ তোমায় নিবারণ করিতে পারিবে না। আর তোমার যাহাকে সঙ্গে লইতে হয় লইয়া যাইবে।"

যুবা হৃষ্ট হইয়া কহিলেন "এই কথাতেই আমার যেন স্ফূর্ত্তি হইতেছে, নিশ্চয়ই আমার বিকারের ঔষধ স্বাধীনতা। তবে লোক সঙ্গে শুনে, আবার কএদী কএদী বোধ হইতেছে, কি যেন কষ্ট হইতেছে।" রমণী অমনি প্রশস্ত হৃদয়ে কহিলেন, "প্রিয়তম! যথা ইচ্ছা একাকী যাও,—বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া পলাইয়া যাইও না। আর এরূপ বলেও প্রণয় হয় না; আমি জানি তোমাকে ধরে রেখে আমার কিছুই লাভ নাই। যদি প্রণয় জন্মে, পলাইতে পারিবে না; নচেৎ পলাইবে জানি। আর যদি আমার প্রণয় সত্য হয়, গভীর হয়,—পৃথিবীর যেখানে থাক আমি সন্ধান করিয়া লইব, নিশ্চয় জানিও।" যুবা মুখস্থভাবে বলিলেন "আমি একটু বেড়াইব মাত্র, পলাইবার কথা বলিতেছি না।"

পর দিবস প্রত্যূষে যুবা বহির্গত হইলেন, পৌর জন কেহ নিষেধ করিল না। যুবা সমুদ্র-তটাভিমুখে গেলেন; এবং দূর হইতে এক জাহাজ দেখিয়া উল্লসিত হইলেন—কোন মতে পলায়ন দ্বারা বিপদোত্তীর্ণ হইবেন। কিয়ৎদূর তট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক নৌকা লোক তীরস্থ পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জাহাজে উঠিল। আর এক খানি নৌকা কিনারায় সংলগ্ন আছে; তাহাতে আশান্বিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। পথে দেখিলেন এক জন মগ এক ছুরিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুষ্করিণী-জলে অবগাহনকারী এক জনকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিতেছে ও হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। মগেরা যে হত্যা-কাণ্ডে বড় পটু যুবা তাহা জানেন। আস্তে আস্তে পশ্চাৎভাগ হইতে মগের ছুরিকা লইয়া জলে নিঃক্ষেপ করিলেন। মগ বিরক্ত হইয়া যুবার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুবার শরীরে অল্প বল ছিল না; মগ পরাস্ত হইয়া গ্রামে লোক ডাকিতে গেল। তখন যুবা অবগাহনকারী এক ভদ্রাকার প্রাচীন মুসলমানকে গাত্রোত্থান করিতে সঙ্কেত করিয়া তীরাভিমুখে গেলেন। যুবারও মগী বেশ কিন্তু তাঁহার কথায় বৃদ্ধ জানিলেন তিনি হিন্দুস্থানবাসী মুসলমান। যুবা ও বৃদ্ধ নৌকায় উঠিলেন; মগের দলও তখন

তীরে আসিল এবং নৌকা-বাহিয়া জাহাজে উঠিল। মগেরা এদিক ওদিক দৌড়িল এবং আপন ভাষায় নৌকা আনিতে কহিল, যুবা তাহা জানিয়া শীঘ্র জাহাজ ছাড়িতে কহিল এবং নঙ্গর তোলা হইতে না হইতে প্রায় বিংশতি খানি নৌকা জাহাজাভিমুখে দৌড়িল। সুবাতাস পাইয়া পালভরে জাহাজ সমুদ্রে চলিয়া গেল।

একটু দূরে গিয়া যুবা জানিলেন এই জাহাজ চট্টগ্রামীয়। সওদাগর একজন শ্রীহট্টবাসী ভদ্র মুসলমান। রোসাঙ্গে বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিলেন, পথে জলাহরণ জন্য ঐ থানে তাঁহার জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল এবং তিনিই পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিলেন। ঐ মগ ছুরী লইয়া তাড়া করিলে—তাঁহার দুই রক্ষক খালাসী নৌকায় পলাইয়া আইসে। এক্ষণে যুবা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সওদাগর যুবার বড়ই সমাদর ও স্নেহ করিলেন। সওদাগর ভয়ে আর রোসাঙ্গে না গিয়া গালিবন্দরাভিমুখে চলিলেন।

যুবাকে আপন কক্ষে লইয়া বৃদ্ধ তদ্বিবরণ এবং সহসা মগী দেশ পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবা কহিলেন—"মহাশয়! আমার কাহিনী অতি বিস্তীর্ণ এবং শোকোদ্দীপক, ক্ষমা করুন।" বৃদ্ধ ছাড়িলেন না এবং যুবা বৃদ্ধকর্ত্তৃক বিপদোত্তীর্ণ জানিয়া আপনাকে বাধ্য বোধ করিলেন ও কহিলেন।—

"মহাশয়! আমার বাস চট্টগ্রাম, আমার পিতা অতি সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। তিনি একদা পথ হইতে একটী রাখাল বালককে আনিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দিলেন। কার্য্যক্ষম হইলে সেই ব্যক্তির উপর আপন মোকদ্দমার ভার দিয়া রাখিলেন। পরে সেই ব্যক্তি স্বাক্ষীগণের প্রতি অত্যাচার করায় আমার পিতা তাহাকে তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কারে বিরক্ত হইয়া পাষণ্ড পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইল এবং জানিতে পারিয়া পিতা তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। তখন সে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া পিতার যথা সর্ব্বস্ব লইল এবং বাসভবনে দীর্ঘিকা খনন করিয়া পিতার কীর্ত্তি লোপ করিল। আমি সেই হতভাগ্য পিতার একমাত্র হতভাগ্য সন্তান। আমি তখন পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়স্ক। পিতা মাতা ও আমি মসজিদে থাকিতাম। একদা মাতুলের উৎকট পীড়া হইয়াছে শুনিয়া মাতা পিত্রালয়ে গেলেন। তাঁহাকে তথায় আবদ্ধ করিয়া সেই দুষ্ট শত্রু আদালতে অভিযোগ করিল যে আমার মাতাকে পিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাতা সেই দুষ্টকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। আদালতে তাহাই সাব্যস্ত হইল এবং পিতা রোগগ্রস্ত হইলেন। মাতাও ডিক্রীজারি ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন, ও তৎসংবাদ শ্রবণে পিতা পরলোক গমন করিলেন।" যুবার চক্ষে জল আসিল এবং বৃদ্ধ তৎসঙ্গে কাঁদিলেন।

পরে পুনঃ আগ্রহে যুবা বলিতে লাগিলেন। "মহাশয়! আমিও আত্মহত্যা করিতাম, কিন্তু পিতা আজ্ঞা দ্বারা তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। সংসারে বিরক্ত হইয়া বনে বাস করিলাম। একদা একটী কাঠুরিয়া রমণী পথভ্রমে আমার আশ্রমে আসিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেই রমণীকে পিতা আমার পত্নী করিবার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন। তাহাকে দেখে প্রণয় জন্মিল, সংসারে আস্থা হইল এবং পরে তাহার সহিত প্রণয় করিলাম। রমণী কহিল রাজ-রাজেশ্বরী হই ত তোমায় বিবাহ করিব। তথাস্তু বলিয়া অর্জ্জনার্থ বিদেশে আসিলাম। আক্যাবে এক ব্যক্তির সহবাসে কিছু দিন থাকিয়া দেখিলাম তাহার চরিত্র মন্দ ও তথাকার অর্জ্জনও অল্প। জন কএক বোসাঙ্গ যাইতেছিল তৎসঙ্গ লইয়া বোসাঙ্গ গেলাম। আমরা চাকরি পাইলাম। ইদ্‌পর্ব্বে সঙ্গীরা সকলে বাসায় আমোদার্থ রহিল, আমি নূতন মনিবের নিকট হইতে ছুটী পাইলাম না। আমার প্রভু রেয়ানজা মগ অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া দেখিলাম সঙ্গীরা মগী বাই লইয়া নৃত্য গীতে ব্যস্ত। আমি বিরক্ত হইয়া প্রভুর বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম ও তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন শুনিলাম সঙ্গীরা মগী বাইদের আপন ইচ্ছামত না পাইয়া প্রতিবাসী এক দরিদ্র মগিনীর প্রতি অত্যাচার করে, তাহাতে সমগ্র মগপল্লী উত্ত্যক্ত হইয়া সকলকে বিনাশ করিয়াছে। পরমেশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইলাম; কিন্তু সঙ্গী-বিহীন হইলাম।"

বৃদ্ধ অতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত অনুরোধ করাতে যুবা তাবৎ কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। "কহিলেন তাহার পর আমার প্রভুর বাটীতেই আমি বাস করিলাম। প্রভুর হিন্দুস্থানে বাণিজ্যার্থ জাহাজ ছিল, পারস্য লেখা পড়া আমা দ্বারা হইত। প্রভু আমাকে বড় স্নেহ করিতেন এবং ক্রমে আমাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী করলেন ও তাবৎ ভারই আমাকে দিলেন। আমি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহও করিলাম। একদা গালিবন্দরে আমি প্রভুর জাহাজ লইয়া গেলাম। তথায় দেশীয় লোক দেখিয়া বাটী গমন জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইল। নিজার্জ্জিত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা লইয়া দেশ গমনার্থ জুলফিকর খাঁ নামক এক ব্যক্তির জাহাজে যাইবার স্থির করিলাম। প্রভুকে পত্র লিখিলাম—কিন্তু সে পত্র পাইবা মাত্র প্রভু জাহাজ লইয়া অবিলম্বে তাঁহার কাছে যাইতে আদেশ করিলেন, তাঁহার এক মাত্র কন্যা লংথংজার বিবাহ উপস্থিত। আমি প্রভু ও প্রভু-কন্যাকে ভাল বাসিতাম। তাহার বিবাহ দেখিয়া অনুমতি লইয়া দেশে যাইব সংকল্প করিলাম। নিশ্চয় বাটী যাইব মনে হইল এবং প্রভুর জাহাজ লইয়া গেলে আরও কিছু অর্থ পাইব জানিলাম। বিশেষতঃ প্রভু কন্যার বিবাহে আমি উত্তম পারিতোষিক পাইব আশা ছিল।"

"মহাশয়! ঘটনার ভবিতব্যতা অননুমেয়। আমি রোসাঙ্গ গিয়া দেখিলাম—গৃহ আদি সংস্কৃত ও সুশোভিত হইয়াছে,—মহাসমারোহের আয়োজন হইতেছে এবং দুই তিন দিবসের মধ্যে কুমারী লংথংজার বিবাহ হইবে। লংথংজা অতি চপলা,—দুই বৎসর কাল তাঁহার কাহাকেও অভিরুচি হয় নাই যে বরণ করেন। এখন কাহার ঐ সৌভাগ্য হইল—জিজ্ঞাসা করায় বাটীর লোক সকলে বলিল জানি না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, লংথংজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া কহিলেন বিবাহ দিনে দেখিবে। পরে বিবাহ দিনে কএকজন দাস দাসী আমার শয়নকক্ষে অতি প্রত্যূষে আসিল। তাহারা আমাকে জাগ্রত করিয়া বলপূর্ব্বক স্নান করাইয়া সুগন্ধ ও অঙ্গরাগে বিভূষিত মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইল, আমি জিজ্ঞাসা করায় সকলে পরিহাস করিয়া কহিল—আমাদের রীতি, দাওয়ানকে এই দিনে সাজান। পরে রোয়ানজা স্বয়ং আসিলেন,—তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! অধীনের প্রতি এ কি ব্যবহার?" প্রভু হাসিয়া কহিলেন "তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমি আপন কন্যা ও যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি,—সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক নাই।" শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। যে প্রণয়িনীর প্রতিবিম্ব হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত আছে, জীবন থাকিতে অন্য কাহাকেও তথায় কিরূপে স্থান দেই! আর কি করেই বা তাহা বলি। কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া কহিলাম, "মহাশয়! বলিতে সাহস হয় না,— কিন্তু আমি ভিন্ন জাতি,—এ বিবাহ কি সংলগ্ন?" প্রভু কহিলেন— "আমাদের শাস্ত্রে প্রণয় হইলেই বিবাহ হইতে পারে, জাতিভেদে দোষ নাই।" আমি আস্তে আস্তে কহিলাম "প্রণয় হইয়াছে কিরূপে জানিলেন?" প্রভু কহিলেন, "লংথংজার অভিপ্রায় না জেনে কি বিবাহ দিতেছি, আর এমন সুন্দরী কন্যা ও ঐশ্বর্য্যে কি তোমার অপ্রণয় হইতে পারে? আমি উত্তর দিতে অক্ষম হইলাম।"

কিঞ্চিৎ পরে কহিলাম "মহাশয়! আপনাদের শাস্ত্রে না হউক আমাদের শাস্ত্রে এরূপ ভিন্নজাতি-বিবাহ নিষিদ্ধ।" প্রভু কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিলেন 'তোমার শাস্ত্র মানে কে? তোমার এদেশে কে আছে? বিবাহ কর, যখন দেশে যাইবে প্রায়শ্চিত্ত করিও, যত টাকা লাগে দিব।' আমি কহিলাম 'মহাশয়! আমার বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রী বর্ত্তমান' তাহাতে প্রভু বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'ক্ষতি কি? বৃথা আপত্তিতে সময় হরণ অনাবশ্যক। শাস্ত্র হউক বা না হউক, ইচ্ছা হউক বা না হউক, লংথংজার ইচ্ছা নিবারণ করে কাহার সাধ্য?' বলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লংথংজার গৃহদ্বারে লইয়া গেলেন। লংথংজা

আমার হস্ত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই যে দ্বার বন্ধ হইল আর উদ্ঘাটিত হইল না—এই পলায়ন পর্য্যন্ত তথায় আবদ্ধ ছিলাম।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "যুবা তোমারত ভাল হইয়াছিল, পলাইলে কেন ?" যুবা কহিলেন "মহাশয়! লংথংজ্ঞা হয়ত আমার প্রণয়িনী অপেক্ষা অনেকের লোভনীয়া; কিন্তু আমার হৃদয় আর কাহাকেও চায়না। তাহার সহিত দুই রাত্রি আলাপ না করাতে সে আপন পিতাকে জানাইল ও এক রাত্রির মধ্যে মিলন না হইলে আমার দেহ ও জীবন মিলিত থাকিবেক না শুনিলাম। রমণীকে আমার প্রণয়িনীর কথা বলিলাম, তাহাতে সে বিরক্ত না হইয়া বরং আমার প্রণয়িনীকে প্রভূত অর্থ পাঠাইয়াছিল এবং কহিল সর্ব্বদাই আমি দেশে যাইতে পাইব। শেষে নিরুপায় হয়ে আমি স্বাধীনতা চাহিলাম যে আমোদ জন্য প্রস্তুত হইব। সরলা আমাকে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং আমি আপনার সমভিব্যাহারে জাহাজে উঠিলাম।"

বৃদ্ধ এই শেষ বিবরণ শুনিয়া কহিলেন, "বাবা! তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতা কার্য্য ভাল হয় নাই। এতদূর করা আবশ্যক ছিলনা। এক হৃদয়ে কি দুইজন অবলা থাকে না—? বিশেষ পুরুষ-হৃদয়ে! না হইলেও শারীর বিবাহে দোষ কি ? আমাদের শাস্ত্রে ৪ বিবাহ সিদ্ধ।" যুবা কহিল "মহাশয়! সেকি বলেন—হৃদয়ে একজনের অধিক স্থান পায় না এবং যদি হৃদয়ে না রহিল তবে বিবাহে সুখ কি ?"

বৃদ্ধ। বালক! এখনও সংসারের পরিচয় পাও নাই, কত লোককে স্থান দিতে হইবে, আবার হৃদয় হইতে তাড়িত করিতে হইবে! বাবা, তুমি যাহার জন্য ভাব সে হয়ত এত দিনে কত হৃদয় পবিবর্ত্তন করেছে!

যুবা। মহাশয়! তাহা হইলে আর সংসারে, জীবনে কাজ কি ?

যুবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন। বৃদ্ধ মিষ্ট করিয়া বলিল, "বাবা, রক্ত গরম তাই বলিতেছ, কাজ থাক আর না থাক সংসারে থাকিতেই হইবে ও থাকিলে অমন কল্পনা রাজ্যে বাস অসম্ভব।" এই কথার পর কথোপকথন স্থগিত হইল। যুবা যে মেহের আলি তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। বৃদ্ধের নাম সেখ মোবারক।

যে সময় গালি বন্দরে পৌঁছিবার কথা, গালি পাওয়া গেলনা। তৎকালে এক প্রবল বাতাস আসিয়া জাহাজকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া গেল। নাবিকগণ পথ ভুলিয়া বিপথে চলিল। ৩ ঘণ্টার পথে ৩ দিন গেল, বন্দর দৃষ্ট হইলনা। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল—আর কয়েকদিন গেলে অনাহারে সকলে মরিবে। মেহের আলি গালিবন্দরে রোয়ান্জার জাহাজ আনিবার সময় দিগ্-দর্শন যন্ত্র বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছিলেন। তিনি নাবিকদের সর্ব্বদাই বলিতেছিলেন একটু বায়ুকোণ হইয়া

চল, এপথে মহা সমুদ্র পাইবে। তাঁহাকে অপটু জানিয়া সকলে তাঁহার কথা উপেক্ষা করে; পরে বৃদ্ধের অনুরোধে মেহেরের কথানুযায়ী বায়ু কোণে যাওয়া হইল। এক দিনে তীর দৃষ্ট হইল। মেহের আলির প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তীরে আসিয়া জানিল তাহারা গালির দক্ষিণ ১ দিনের পথে আসিয়াছে। তথা হইতে গালিতে উপনীত হইল।

বৃদ্ধ পূর্ব্ব হইতে যুবাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছিলেন, যুবার বিদ্যাবুদ্ধি দৃষ্টে আরও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "মেহের, তোমার মা বাপ নাই আমারও পুত্র নাই। আমার প্রভূত সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? আমি স্থির করিয়াছি তুমি আমার পুত্রের ন্যায় থাক এবং আমি তোমাকে বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই।" মেহের অসম্মত নহেন তবে জন্মভূমি ত্যাগে সম্মত নহেন। বৃদ্ধ কহিলেন মন্মরণে মেহের বিষয়াদি লইয়া চট্টগ্রামে বাস করিতে পারেন। তদবধি তাবৎ বিষয়াদি মেহের আলির নামে চলিল। জাহাজ বাণিজ্যার্থ সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি নানা স্থানে লইয়া জাওয়ায় প্রভূত অর্থ লাভ হইল। বৃদ্ধ তখন মেহেরকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে আসিলেন। একবার শ্রীহট্টে নিজ ভবনে মেহেরকে লইয়া যাইবেন পরে চট্টগ্রামে আসিবেন স্থির হইল। তদনুসারে মেহের বৃদ্ধের সঙ্গে শ্রীহট্টে গেলেন।

বৃদ্ধ ভয়ে বলেন নাই তাঁহার এক কন্যা আছে, তাহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। মেহের তাঁহার সঙ্কল্প বুঝিয়া আপনাকে ক্লীব বলিয়া পরিচয় দিলেন। সুতরাং বিবাহ ভঙ্গ হইল। তত্রাপি বৃদ্ধ স্নেহ বশতঃ মেহেরকে অর্দ্ধাংশ-ভাগী করিয়া স্বীয় পুত্রের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রাখিলেন।

মেহের আলি চট্টগ্রাম যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। সেখ মোবারক অনেক বাধা দিয়া অবশেষে মাস কএকের জন্য অনুমতি দিলেন। অর্ণবপোত লক্ষমুদ্রার দ্রব্যাদি দ্বারা সাজাইয়া মেহেরকে পাঠাইলেন ও বলিলেন ঐ অর্থ সমুদায় তাঁহার হইল, তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। অথবা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারেন। মেহেরআলি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মনে মনে যুবার কতই উল্লাস। কতই আনন্দ! মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, লক্ষপতি হইয়া সাধের মেহেরজানকে বিবাহ করিতে চলিলেন। কল্পনার পথিক যুবা, ভাবিতে লাগিলেন জাহাজ বন্দরে রাখিয়া চট্টগ্রাম সহরে নামিবেন, অত্যুত্তম কএক অশ্ব লইয়া ও সুবেশী দাস দাসী লইয়া ঐ নগরে একটী সুরম্য বাস ভবন করিবেন। পরে ছদ্মবেশে একেবারে মেহেরজানের কুটীরে প্রবেশ করিবেন। তিনি যে ধনী হইয়াছেন বলিবেন না, দেখিবেন মেহের জান দরিদ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে অনাস্থা করেন কি না। পরে

এক দিন সহসা ভদ্রবেশে যাইয়া পড়িবেন, মেহেরজানকে আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত করিবেন এবং মহাসমারোহে বিবাহ করিয়া চট্টগ্রামে আনিবেন। অর্থ ও লোক বলে নিজ বিষয়াদি মোক্তার হইতে কাড়িয়া লইবেন, বাধা হইলে তাহাকে গোপনে প্রাণনাশ আশঙ্কা দিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। মোক্তার হীনবল ও শাসিত হইলে তাহাকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় দান করিয়া সাধুতা প্রদর্শন করিবেন। মেহেরন্নিসাকে চট্টগ্রামে সংস্থাপিত করিয়া একবার বাণিজ্যার্থ যাইবেন। যে অর্থ নিজার্থে ব্যয় করিবেন তাহা পূরণ হইলেই জাহাজ সহ সমগ্র অর্থ সেথ মোবারককে পুনঃ প্রেরণ করিবেন। ইত্যাদি কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কখনও বা মনে মনে বিদেশ-সংগৃহীত অলঙ্কারের পরিচয় দিতেছেন—কখনও বা মহামূল্য পরিচ্ছদ স্বহস্তে মেহেরকে পরাইতেছেন—কখনও বা জঙ্গলের পুরাতন গল্প করিতেছেন। আহা! নবীনবয়স্কদিগের সুকোমল মনে, সরল হৃদয়ে কত আশা! কত আনন্দ! নিষ্ঠুর সংসার কিন্তু সকল সময়ে তাহার পোষণ করা দূরে থাকুক প্রায় বাধাই দেয়।

নোয়াখালি আসিয়া যুবা পুনঃ সমুদ্র দর্শনে উৎসুক হইলেন। অর্ণবপোতে আরোহী হইয়া ক্রমে সীতাকুণ্ড পাহাড় দেখিলেন। স্বদেশের চূড়া দেখে কত যে আনন্দ-হিল্লোল মেহেরের মনে উঠিল বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ভাবিতেছেন মেহেরজানকে লয়ে একবার ঐ পাহাড়ে আসিবেন। একবার রমণীয় ঢালা পথে উভয়ে পদ চারণ করিবেন এবং নিভৃত বৃক্ষমূলে বসে বনবাসের কথা কহিবেন। স্বর্গীয় অপ্সরীর নৃত্যের ন্যায় শব্দকারী পাহাড়ে কীট তাঁহাদের কর্ণ রঞ্জন করিবে, হরিৎবর্ণ ঘন নিবিড় কানন তাঁহাদের চক্ষু রঞ্জন করিবে, বন-পুষ্পের সৌরভ নাসিকা রঞ্জন করিবে, এবং উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বী বসে দেহরঞ্জন এবং প্রণয় কথা কহে মনোরঞ্জন করিবেন। মেহেরের দেহ লোমাঞ্চিত, মন উল্লাসিত, হৃদয় আনন্দ-পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কএক ঘটিকা পরেই স্বদেশে,—সেই হৃদয়-চন্দ্র যে দেশে আছে—পদার্পণ করিবেন। সহসা বায়ু হ্রাস হইল—জাহাজে পাল খাটে না, গতি অতি মন্দ হইল। মেহেরের মনে হইতেছে ফুৎকার দিয়া পাল চালান, অথবা নৌকা ধরিয়া অগ্রসর হয়েন।

এমত সময় তীরাভিমুখে দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র তরি প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজাভিমুখে আসিতেছে। তাহাতে এক ভদ্র আরোহী দাঁড়াইয়া আছে। মেহের জাহাজ-গতি রোধের আদেশ দিলেন, ইচ্ছা, আগন্তুক ব্যক্তির অভিপ্রায় জানেন এবং সুবিধা হইলে ঐ নৌকায় চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। নাবিকেরা নৌকা আসিলেই তাহার আরোহী-দিগকে জাহাজে লইল। প্রধান ব্যক্তি জাহা-

জাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া মেহের আলির চরণে কাঁদিয়া পড়িল। কিয়ৎ ক্ষণ ক্রন্দনের পর অলস ভাবে বসিয়া বলিল 'মহাশয়! দেখিতেছি আপনি অতি সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক মুসলমান, কিন্তু আপনার বদনে দয়ার চিহ্ন প্রভূত আছে। এ অধীন যে বিপদে পড়িয়াছে কাহারও ঘটে না। পরমেশ্বর আপনাকে আমারই সাহায্যার্থে নিশ্চয় পাঠাইয়াছেন।"

মেহের অনেক সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইলে ও আশ্বাস প্রদান করিলে আগন্তুক কহিল "মহাশয়! আমি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পরিবার লইয়া যাইতেছিলাম। সহসা একটী ক্ষুদ্র তরী আমাদের নৌকার কাছে এল, কএক মুসলমান খালাসী চড়াও হইয়া আমার দ্রব্যাদি ও—" আগন্তুক কাঁদিতে লাগিল। "কি হইয়াছে বল বল, ভয় নাই" আশ্বাস পাইয়া কহিল "আমার পরম সুন্দরী নবযৌবনা প্রণয়িনী পত্নীকে পাষণ্ডেরা লইয়া এক জাহাজে উঠিল।"

মেহের। জাহাজ কোন্ দিকে গেল—কোথায় যাইবে জান?

আগন্তুক অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল "জাহাজ দক্ষিণাভিমুখে চলিল। যখন বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়ে আমি জানিয়াছিলাম উহা মান্দ্রাজে কি তৎপ্রদেশে যাইবে।"

মেহের। কবে ঘটনা হইয়াছে ও জাহাজ কতদূর গিয়াছে?

আগন্তুক। এই ঘণ্টাত্রয় মাত্র—একটু অনুগমন করিলে জাহাজ ধরা যাইবে।

মেহের। জাহাজ কোন্ জাতির ও লোকবল কত?

আগন্তুক। চট্টগ্রামীয়; ১০ জন মাত্র লোক তাহাতে আছে—এ জাহাজের লোক অনায়াসে তাহাদের আয়ত্ত করিতে পারিবে। সে জাহাজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; কিন্তু দ্রুতগামী।

মেহের ভাবিতে লাগিলেন—এমন সুখের সময় কি বিপদ! তাঁহার হৃদয়ে সুকুমার ভাব সকলি প্রবল। যেমন প্রেমে উল্লসিত ছিলেন, তেমনি দয়ায় আদ্র্র হইলেন। প্রিয় মেহেরজানকে যদি কেহ কাড়িয়া লয়—মেহের ভাবিলেন। এইরূপ কল্পনাই সহানুভূতির মূল। মেহের আত্মবিপদবৎ—আগন্তুকের ঘটনা গ্রহণ করিলেন। যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে ভাবিলেন। অতএব বলিলেন "মহাশয়! চিন্তিত হইবেন না. আমি এক দিন মাত্র চট্টগ্রামে অবতরণ করিয়া পরে দস্যু অনুসরণে যাইব। যথায় যাউক আমা হইতে তাহার নিস্তার নাই।"

আগন্তুক। মহোদয়! এ প্রস্তাব কিরূপ হইল? এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে দস্যুরা অদৃশ্য হইবে। আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি হিন্দু, আমার স্ত্রীকে যদি তাহারা আহার করায় কি সম্ভোগ করে, আর আমি তাহাকে

লইতে পারিব না—তাহার জাতি নাশ হইবে। মহাশয়! আপনার এ প্রস্তাব অপেক্ষা এক সহজ উপায় বলি, আমাকে এই জলে নিঃক্ষেপ করুন; তাহা হইলেই আপদ যায়।”

মেহের অপ্রস্তুত হইলেন, আত্ম-সুখ জন্য নির্দ্দয় হইতেছেন বুঝিলেন এবং লজ্জিত হইলেন। চট্টগ্রামের আশা ছাড়িয়া দস্যু-অনুগমনের আদেশ দিলেন। বায়ু অনুকূল হইল এবং সপ্তাহের মধ্যে শ্রীরঙ্গপট্টন বন্দরে উপনীত হইলেন। আগন্তুক এক দিবস অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল, দস্যু-জাহাজ এখান হইতে গত কল্য প্রস্থান করিয়াছে। তাহারা কয়েকটী হিন্দু রমণীকে এখান হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণের সমুদ্রকূল-নিবাসী চারিলু-পরিবারকে বিক্রয় করিয়াছে এবং সেইটীই তাহার স্ত্রী। মেহের তৎপরামর্শে জাহাজ লইয়া কূলে কূলে দক্ষিণাভিমুখে গেলেন। সমুদ্রতট-সন্নিকটে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য দেবালয়—তাহার চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান। আগন্তুক তাঁহার নাম শঙ্কর সিং বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। শঙ্কর সিং কূলে নামিয়া বাগানের ভিতর গিয়া সমস্ত দিন পরে সংবাদ দিল, তাহার স্ত্রী ঐখানে আছে। তাহার সহিত দেখা হইয়াছে ও রজনীতে বলপূর্ব্বক মোচন করিতে পরামর্শ দিয়াছে। এখনও তাহার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই।

মেহের এরূপ গোপনীয় কার্য্যে সম্মত ছিলেন না—তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশ্যে ঐ কামিনীকে প্রার্থনা করেন—নচেৎ রাজস্থানে অভিযোগ করেন। কিন্তু উহাতে তাহার স্ত্রীকে সরাইবে আর পাওয়া যাইবে না বলে শঙ্কর সিং অনেক অনুরোধে মেহেরকে সম্মত করিল যে, সে রাত্রী পর্য্যন্ত জাহাজ এখানে থাকে এবং জন কয়েক মাল্লার সাহায্যে শঙ্কর সিং স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্ধার করে। পরোপকারার্থ মেহের আলি অগত্যা সম্মত হইল। রজনীতে সহসা দস্যুর ন্যায় শঙ্কর সিং ও কএক নাবিক চারিলু-ভবনে প্রবেশ করিল। পুরুষগণকে বন্ধন করিয়া অন্তঃপুরে রমণীগণকে ধরিল। সর্ব্বাপেক্ষা যৌবন-সম্পন্না ও সুন্দরী এক রমণীর মুখ দৃষ্টে শঙ্কর কহিল “এই এই, শীঘ্র লও।” সেই রমণীকে লইয়া নাবিকেরা জাহাজে উঠিল এবং গ্রামের গোলযোগ শুনিয়া উৎপাত আশঙ্কায় অমনি জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

পরদিন প্রাতে জাহাজ কৃষ্ণ জলে পড়িয়াছে, তীর হইতে বহুদূরে আসিয়াছে। অনুসন্ধানে শঙ্কর সিংহকে পাওয়া গেল না। কোথায় কেহ সন্ধান জানে না। নাবিকেরা ব্যস্ত হইয়া রমণী লইয়া জাহাজে আসিয়াছে, শঙ্কর কোথায় গেল কি সঙ্গে এল ঠাওর নাই। রমণী ডেকে এক স্থানে পড়িয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়াছে, ভয়ে কি অন্য কারণে কেহ জানে

না। মেহের ভাবিলেন হয়ত শঙ্কর তাড়াতাড়ি জলমগ্ন হইয়াছে এবং তাহাকে না দেখিয়া রমণী ক্রন্দন করিতেছে। নাবিকের মধ্যে বিচক্ষণ এক ব্যক্তি কহিল "মহাশয়! আমার সন্দেহ হইতেছে শঙ্কর সিং প্রবঞ্চক, এ তাহার স্ত্রী নহে এবং সে তজ্জন্য পলাইয়াছে।"

মেহের কহিল "কি জন্য এরূপ ভাবিতেছ?"

১ম নাবিক। মহাশয়! গত রজনীতে নাবিকেরা তাহার কাছে পুরস্কার চাহে। সে বলে "আমার কাছে কিছু নাই—যে যে স্ত্রীকে উদ্ধার করিবে আমি এক একবার তাহাদিগকে স্ত্রী ভোগ করিতে দিতে পারি, তোমাদের কৃপায় আমি পাইব, নয় একটু ভাগ দিব।" মহাশয়! আপন সহধর্ম্মিণী হইলে কদাপি এ কথা বলিতে পারিত না।

২য় নাবিক কহিল "মহাশয়! এই ঠিক, শঙ্কর সিং হিন্দুস্থানী, রমণী মান্দ্রাজী কথা কহিতেছে, উহার স্ত্রী সে নহে।" মেহের অবাক হইয়া কহিলেন "রমণীকে এখানে আন।" রমণী আসিয়া কাঁদিয়া মেহেরের পদানত হইল। মেহের সান্ত্বনা ও নির্ভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্বামী কোথায়? ও শঙ্কর সিং তোমার স্বামী কি না?"

রমণী। আমার স্বামীর নাম বেন্সাচীচারিলু, তিনি গৃহে ছিলেন, আপনার লোক তাঁহাকে আবদ্ধ করে রেখে এসেছে। শঙ্কর কে আমি জানি না।

মেহের। পরমেশ্বর জানেন, আমি সেই দুষ্টের দুরভিসন্ধি বুঝি নাই। তাহার কথায় আমি এমন চুক্তি করিলাম যে বিচার দিনে উত্তর দেওয়া শক্ত হইবে। যাহা হউক এক্ষণে অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনাকে স্বভবনে রাখিয়া আসিতেছি।

রমণী। মহাশয়! তাহাতে লাভ কি? দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা ব'লে আমার জাতি নষ্ট হইয়াছে পুরলোকে বুঝিয়াছে। দিব্য করিলেও তাহারা আর বিশ্বাস করিবে না এবং আমাকে গ্রহণ করিবে না।

মেহের। আমরা গিয়া সব অবস্থা প্রকাশ করিব ও আপনার কোন অত্যাহিত হয় নাই প্রমাণ করিব।

রমণী। গম্ভীর স্বরে কহিল, "বিশ্বাস করিলে ত বাঁচি। কিন্তু আমার নিশ্চয় আশঙ্কা হইতেছে, আমাকে পাইলে তাহারা লজ্জা নিবারণ জন্য হত্যা করিবে। মেহের কহিলেন "তবেইত! এখন কি করা যায়?" মেহের শঙ্করের প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে তাহাকে পেলে দ্বিখণ্ড করেন। রমণীকে কহিলেন "এখন আপনার অভিপ্রায় কি?"

রমণী। আমার মাথা আর মুণ্ড। কপাল আমার ভেঙ্গেছে, এবং আপনারই কর্ত্তৃক—আপনি জ্ঞাতসারে আর অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকুন।

মেহের অধোবদন হইলেন, কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন উপায় কি? আপনি যাহা

বলিবেন আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।”

রমণী। উপায় যাহা হউক, আমি ঘরে ফিরিব না, এ কালামুখ কোন্ লজ্জায় দেখাইব? আপনি আমাকে সঙ্গে লয়ে যান ও যাহা বিবেচনা হয় করিবেন।

মেহের অগত্যা চট্টগ্রামাভিমুখে চলিলেন। চারিলু-পত্নীর প্রতি পাছে কেহ অত্যাচার করে বলে মেহের তাহাকে আপন কক্ষের পার্শ্ব কক্ষে রাখিলেন। তাহার যে সাহায্য করিতে হইত নিজে করিতেন—অন্যের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। রমণীও সমুদ্র-তরঙ্গ বা বায়ু-প্রাবল্য জন্য ভীতা হইলে কখন মেহেরকে নিজ কক্ষে ডাকিতেন—কখনও বা মেহেরের কক্ষে আসিতেন। একদা মেহের কক্ষ মধ্যে নিদ্রিত আছেন, সহসা জাগরিত হইয়া দেখিলেন—চারিলু পত্নী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তক সেবা করিতেছেন। উঠিয়া কহিলেন—“এখানে কেন? কোন ভয় পাইয়াছেন?”

রমণী। না, আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

মেহের। কি?

রমণী। আমাকে কি করিবেন ভাবিয়াছেন?

মেহের। ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই—আপনার যাহাতে মঙ্গল হয় বলুন।

রমণী। আপনি অতি সাধু সদাশয়! আপনার আশ্রয়ে নিরাপদে আছি। কিন্তু আমি সমর্থা স্ত্রীলোক, একজনের আশ্রয় বিনা আমার থাকা সমূহ বিপদ্। আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে বিবাহ করুন।

মেহের ঐ প্রস্তাবের ভয় সর্ব্বদাই করিতেন, কহিলেন “চারিলু-পত্নী, আপনি হিন্দু—আমি মুসলমান; আমি ইচ্ছা করি না আপনি জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করেন। আমার কল্পনা হইতেছিল—আপনাকে এক স্থানে কিছুদিন রাখাইয়া দিব এবং অর্থ লোভ দিয়া আপনার স্বজাতি কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়াইব।”

রমণী। আমি আর সে আশা করি না। অর্থলোভী সামান্য লোকের সহবাস প্রার্থনীয় নহে। আমি মুসলমান হইব, আমাকে বিবাহ করুন। মেহের “দেখা যাইবে” বলিয়া তখন বিরত হইলেন। এমত সময় সহসা এক বৃহৎ অর্ণবপোত নিকটে আসিল। অনবরত রাজকর্ম্মচারী আসিয়া মেহেরের জাহাজ আক্রমণ করিল। এবং মেহেরকে, চারিলু-পত্নীকে ও নাবিক্দের বাঁধিয়া লইল। জাহাজের পশ্চাতে জাহাজ বাঁধা রহিল। তৎসঙ্গে শঙ্করসিংহও দেখা দিল। সে যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল তাহা অতঃপর প্রকাশ হইল।

ক্রমশঃ।

সন্ধ্যা।

সমাগত সন্ধ্যা, রবি বিলীন আকাশে,
ম্লান মনে ধরণী ধূষর বাস পরে,
পুরনারী শঙ্খধ্বনি করিয়া উল্লাসে,
দীপ জ্বালি, মঙ্গল আরতি করে ঘরে।

ধীরে ধীরে সুখ-স্পর্শ সঞ্চরে সমীর,
কভু তরঙ্গিনী বক্ষে তরঙ্গে নাচায়,
কভু বিভূষিত বপু গন্ধে মালতীর
প্রমদা-অলকগুচ্ছ ঈষদ্ দোলায়।

আধো ফোটো ফোটো যূথি মল্লিকা মালতী,
যতনে যুবতী হার গাঁথিয়াছে তায়,
কৌতুকে পরেছে কণ্ঠে কোন রসবতী,
কেহবা কবরী বেড়ে বেখেছে মাথায়।

মনঃক্ষোভে খাদ্য লোভ সম্বরি বায়স,
নীড় লক্ষ্যে দ্রুত পক্ষে উড়িছে সত্বর ;
আঁধারে মুদিত চক্ষে বঞ্চিয়া দিবস,
পেচক কর্কশকণ্ঠ ত্যজিল কোটর।

কুঞ্জবন-গায়ক বিহঙ্গ কলাবৎ *
বিরত সঙ্গীতে ; সুর রাখিতে বজায়,
প্রভাতি-সঙ্গীত, পাখী না ধরে যাবৎ,
সাধ পূরে তানপূরা ঝিঁঝিঁতে † বাজায়।

কত অনুনয় অলি করে নলিনীরে,
তথাপি মানিনী মানে ঝাঁপিল বদন,
মধুলোভে শঠ সেই কত ফুলে ফিরে,
কেন সে রাখিবে ধনী কৈতব বচন ?

নিশা-সখী কুমুদিনী মেলিল নয়ন,
রহস্য সংবাদ তারা কহিবে দুজনে
কহিবে প্রণয়-রসে অভিষিক্ত মন
কামিনী কি কথা কহে পতিরে নির্জ্জনে।

কর্ম্ম স্থল হতে নর আগত আলয়,
শ্রমখিন্ন দেহভার করিয়া বহন ;
দেখিবে সে পূর্ণশশী গৃহেতে উদয়,
বনিতা নিকটে আসি দাঁড়াবে যখন ;

অভিনব-অরবিন্দ-প্রফুল্ল আনন
ধাইয়া সোহাগে শিশু বাহু পসারিয়া
কোলেতে উঠিবে তার লভিতে চুম্বন,
অভাগা যতেক ক্লেশ যাইবে ভুলিয়া।

নীরব অবনী, স্তব্ধ জীবা সমুদয়,
চঞ্চল হৃদয়, স্থির হইল এখন,
ধীরে ধীরে স্মৃতিপথে আসিয়ে উদয়,
পাশরি সকল স্নেহ গিয়াছে যে জন।

প্রতিবাসী, দাস দাসী, বন্ধু, পরিচিত,
সকলে অনেক দিন ভুলে তারে গেছে।
রয়েছে মূরতি হৃদি-পাষাণে অঙ্কিত
শুধু তার, মর্ম্মে যার শেল বিঁধিয়াছে।

স্মরি পুত্র-কমনীয়-বদন-মণ্ডল,
জননী হৃদয়ে, শোক-তরঙ্গ উথলে,
বিরলে বিধবা বসি ফেলে নেত্রজল,
যে তারে বাসিত ভাল, সে গিয়াছে চলে !

* কালোয়াত। † ঝিঁ ঝিঁ—ঝিল্লী।

শ্যামাঙ্গিনী শর্ব্বরীর সীমন্ত-ভূষণ
উঠেছে সন্ধ্যার তারা নীলনভস্থলে,
বিমল চাঁদের রেখা যুড়াল নয়ন,
খদ্যোতের ক্ষুদ্র মন ঈর্ষ্যানলে জ্বলে।

বণিকের বিত্তরাশি করিয়া বহন
নদীজল বিলোড়িয়া তরি চলে যায়,
ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় পড়িছে কেমন!
সমস্বরে কর্ণধার-সারি গীত গায়।

তটস্থিত কুটীরের হরিয়া আঁধাব,
মৃদু প্রদীপের আলো পড়িয়াছে জলে,
বহুদূরে প্রভা তার হতেছে বিস্তার:
সুকাজের দীপ্তি হেন হয় ধরাতলে।

দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁসর,
যে বলে বলুক অই কাঁসরে কর্কশ,
আমার নিকটে উহা শ্রুতি-সুখকর
হৃদয়েতে আবির্ভাব করে শান্তরস।

জ্ঞানী নই, মজি নাই সেই দিব্য জ্ঞানে,
পর-ধর্ম্মে ঘৃণাবোধ যাহাতে ঘটায়,
সত্যধর্ম্মজ্যোতি মম উড়েনা নিশানে,
ব্যগ্র নই স্বর্গ রাজ্য আনিতে ধরায়।

জানি এই, যোগী যাঁরে ধিয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেব, সায়াহ্ন সময়ে,
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদি আরাধিয়া।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

[পঞ্চম প্রবন্ধ।]

ম্যাট্‌সিনি কর্ত্তৃক লা জিয়োবিনি ইতালীয়া বা নব্য ইতালী নামক সমাজ সংস্থাপন।

১৮২০-২১ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না। কোন্ কোন্ ভ্রম প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতন হইল, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন; এবং তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের দূরীকরণ হইলে ভাবী অভ্যুত্থান অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না বটে, কিন্তু ইতালীয়গণের অধিকাংশেরই হৃদয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে গভীর হতাশতার ভাবে ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল।

ম্যাট্‌সিনি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইলেন যে অধিনয়ন কার্য্যের পটুতার উপরই জাতীয় অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। এই অধিনয়ন কার্য্যের দোষই জাতীয় অতীত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনের একমাত্র কারণ।

যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বৈপ্লবিক শাসন কার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইয়া সচরাচর বিপ্লববিরোধী বা উদাসীন ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এই ভ্রমের সহস্র সহস্র জীবন্ত উদাহরণ ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যাঁহারা কখন উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করা ইতালীয় লোকসাধারণের—বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর—একটী রোগ হইয়া উঠিয়াছিল। অরাজকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষতা অপবাদ ভয়ের প্রাবল্যই ইহার মূল। জাতীয় স্বাস্থ্যের সময় পলিতকেশ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা শুভপ্রদ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবসময়ের কে? বিপ্লবের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পলিত-কেশই হউন আর পূর্ণপ্রভাবশালীই হউন, তাঁহাদিগদ্বারা বিপ্লবের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধন হইতে পারে না। পীড্‌মণ্ট ও বলোনার বৈপ্লবিক শাসনসমিতি এইরূপ লোকদ্বারাই সংগঠিত হয়। ইহাঁরা পর্য্যুদস্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত, গলিতবয়া, পুরা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ মতাবলীতে দীক্ষিত, যুবক-মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসবিরহিত, ফরাশিবিপ্লবের অত্যাচার-জনিত ভয়ে অদ্যাপি জড়ীভূত; এরূপ লোকদিগের বিপ্লব-সাধনোপযোগী উৎসাহ, অধ্যবসায়, শক্তি ও বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ লোকদিগের হস্তে যখন বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যভার অর্পিত হয়, তখন বিপ্লব পরাস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি নূতন প্রণালীতে বিপ্লবসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি নব্য ইতালী নামক একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের জন্য ম্যাট্‌সিনি যে উপদেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

নব্য ইতালী।

সাম্য—স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা—

একতা—পরোপকারব্রততা—

নব্য ইতালীর মূলমন্ত্রস্বরূপ।

প্রথম শাখা।

ইতালীর উন্নতি ও উদ্ধার সাধন যাঁহারা জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন; যাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতালী একদিন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে, এবং তৎসাধনার্থে ইতালীকে বহিশ্চর রাজ্যসকলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না; যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয় অভ্যুত্থানসকলের পতনের কারণ অধিনয়ন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য নহে; এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে চেষ্টার

অবিচ্ছিন্নতা ও একতাই বলের মূল; নব্য ইতালী সেই সকল ইতালীয়গণকে এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ করিতেছে। ইহাঁরা ইতালী উদ্ধারসাধন জন্য চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, অষ্ট্রিয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইতালীয়দিগকে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবেন, এবং স্বাধীন ইতালীয় জাতির অন্তরে সাম্য ও ঐক্যের ভাব প্রবলতররূপে অঙ্কিত করিবেন।

দ্বিতীয় শাখা।

একশাসনের অধীন, এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশস্থ ইতালীয় অধিবাসি-সমষ্টিই ইতালীয় জাতি শব্দের প্রতিবাদ্য।

তৃতীয় শাখা।

সমাজের ভিত্তিমূল।

লক্ষ্যের অবিচলিততা, পরিস্ফুটতা ও সুনিশ্চিততা,—সমাজের স্থায়িতা, কার্য্যকারিতা এবং দ্রুত উন্নতির মূল।

সভ্যসংখ্যা সমাজের বলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে; সভ্যদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অবিচলিততা এবং লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতাই সমাজবলের প্রকৃত পরিচায়ক।

যাঁহাদিগের লক্ষ্যের ও কার্য্যপ্রণালীর কোন নিশ্চিততা নাই, যাঁহাদিগের মতের কোন একতা নাই, এরূপ নির্লক্ষ্য বা অনিশ্চিতলক্ষ্য বিভিন্নধর্ম্মা সভ্যগণ দ্বারা যে সকল বৈপ্লবিক সমাজ সংগঠিত, সংস্কার-কার্য্যের সময় তাঁহাদিগের একচিত্ততা পরিদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইলেই তাঁহাদিগের কার্য্যস্রোত অন্তর্বিচ্ছেদে ব্যাহত হইবে; এবং যে সময় কার্য্য ও লক্ষ্যের একতার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই ঘোরতর গৃহ-বিচ্ছেদে বিপ্লবের উদ্দেশ্য পর্য্যুদস্ত হইবে।

বিপ্লব সাধন করিতে হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে; নিয়ম শব্দের অর্থ প্রণালী; লক্ষ্যের অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন করাই উক্ত প্রণালীর কার্য্য।

যত দিন বিপ্লবের লক্ষ্য অনিশ্চিত থাকিবে, ততদিন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীরও কোন নিশ্চিততা হইবে না; এবং সাধন-সামগ্রীর নিশ্চয়াভাবে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প। কারণ লক্ষ্যের নিশ্চয়াভাবে, অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন হইতে পারে না; এবং অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন বিনাও বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বিশ্বাস না জন্মিলেও লোকে বিপ্লব সংসাধন জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না; প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীতও কখন বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে না। অতীত ঘটনায় ইহার ভূরী ভূরী প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারাই বিপ্লবের অধিনায়ক হইবেন, বিপ্লবের পরিণাম কি তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে। যাঁহারাই লোক সাধারণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান

করিবেন, তাঁহাদিগকেই বলিয়া দিতে হইবে কি ফলের আশায় তাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে; কারণ জয় লাভ করিয়া কি ফল হইবে তাহা জানিতে না পারিলে কখন সমস্ত জাতি যুদ্ধার্থ অভ্যুত্থিত হইতে পারে না। যাঁহারাই দেশের পুনঃসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ; এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহারা কখনই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবেন না; এবং তাঁহারা সংহার কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিয়া এরূপ অরাজকতা সংঘটিত করিবেন, যাহার প্রতিবিধান বা নিবারকরণ তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

এই সকল কারণে নব্য ইতালীর সভ্যগণ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্য-প্রণালী অবগত করাইতেছেন।

এই সমাজের প্রথম লক্ষ্য **বিপ্লব সাধন** দ্বিতীয় লক্ষ্য **মন নির্ম্মাণ**; কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য সাধনের প্রধান অস্ত্র **শিক্ষা**। শিক্ষা যেরূপ বিপ্লব সাধনের মহাস্ত্র, তেমনই বিপ্লবের পর নির্ম্মাণ-কার্য্যেরও অদ্বিতীয় সাধক; এই জন্য বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে শিক্ষাই এই সমাজের প্রধান অবলম্বনীয় হইবে।

নব্য ইতালী সমাজ সাধারণ-তন্ত্র-বাদী।

১ কারণ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকল জাতিই সমভাবে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই এই ভবিষ্য সুখ সাধনের একমাত্র উপযোগিনী।

২য় কারণ—জাতি সাধারণই দেশের প্রকৃত রাজা এবং সর্ব্বোচ্চ নৈতিক বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

৩য় কারণ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এখন যতই কেন অধিকার ভোগ করুন না, সমাজের স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্যের দিকেই; সাম্যই স্বাধীনতার মূল; সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই সাম্যের প্রতিকূলে, সুতরাং সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই স্বাধীনতার বিরোধী।

৪র্থ কারণ—জাতিসাধারণের রাজত্ব স্বীকার না করিয়া যদি ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের রাজত্ব স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর বিবাদের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে সখ্যভাব একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের সহিত কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সখ্যভাবের অভাবে সামাজিক জীবনের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

৫ম করণ—রাজা প্রজাসাধারণের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া কখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না; রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন—যাঁহারা রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় বিভবশালীও

হইবেন না এবং প্রজা-সাধারণের ন্যায় অতি দীনও হইবেন না;—কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সমাজের যাবতীয় দূষণ ও বৈষম্যের নিদান।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতিহাস পাঠে ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সিংহাসন শূন্য হইলে, প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবার নূতন নূতন রাজা মনোনীত করিতে গেলে, রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়; আবার এদিকে পুরুষ-পরম্পরায় এক বংশেই রাজসিংহাসন আবদ্ধ রাখিলে যথেচ্ছচারিতার নিরতিশয় আধিক্য হইয়া উঠে।

৭ম কারণ—রাজত্বাধিকার পুরাকালের ন্যায় এখন আর ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না; এই জন্য লোক-সাধারণের নিকট ইহার মোহিনী শক্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় ইহা রাজ্যের প্রভুতা ও একতার কেন্দ্র-স্বরূপ হইতে পারে না।

৮ম কারণ—ইউরোপে যে সকল ক্রমিক উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই অনিবার্য্য প্রবণতা সাধারণতন্ত্র সংস্থাপনের দিকে।

৯ম কারণ—ইতালীতে আপাতত রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

১০ম কারণ—কার্য্যতঃ ইতালীতে রাজতান্ত্রিক উপাদান-সামগ্রী নাই। রাজা, জমিদার ও প্রজাসাধারণ—এই তিনটীই রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার কোনটীরও অভাবে রাজতন্ত্র পরিরক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতালীতে প্রথম দুইটীরই একপ্রকার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইতালীতে এমন কোন প্রাচীন রাজবংশ নাই যাহা ইতালীর সমস্ত প্রদেশের স্নেহ ও সহানুভূতি আয়ত্ত করিতে পারে; এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণীও নাই যাঁহারা রাজা ও প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পরিপূরিত করিতে পারেন।

১১শ কারণ—ইতালীয় প্রবাদ প্রধানতঃ সাধারণতান্ত্রিক; ইতালীর অতীত অবদান-পরম্পরার স্মৃতিও সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর জাতীয় উন্নতির ইতিবৃত্ত সাধারণ-তান্ত্রিক; রাজতন্ত্র ইতালীর অবনতির সমসাময়িক মাত্র। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতা, প্রজাবর্গের প্রতি বিরোধিতা, এবং জাতীয় একতার প্রতিকূলতা দ্বারা, রাজতন্ত্রই অচিরকাল মধ্যে ইতালীর পূর্ণ ধ্বংশ বিধান করিয়াছে।

১২শ কারণ—যে প্রণালী প্রাদেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে, ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ সকল প্রফুল্ল মনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের প্রভুতাধীনে আসিবে না।

১৩শ কারণ—যদি রাজতন্ত্র ইতালীয় বিপ্লবের একবার লক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক

কর্ত্তব্যনিচয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে; বহিশ্চর রাজবৃন্দের চরণে আত্মবিসর্জ্জন,—দূতমণ্ডলীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন,—দেশের একমাত্র উদ্ধার-সাধক লৌকিক বলের নিয়ন্ত্রণ,—বিপ্লববিরোধী রাজতন্ত্র-পক্ষপাতীদিগের হস্তে বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপরিভাবী ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবেরই মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

১৪শ কারণ—অতীত ইতালীয় বিপ্লবদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ইতালীয় জাতি-সাধারণের বলবতী প্রবণতা সাধারণতন্ত্রেরই দিকে।

১৫শ কারণ—সমস্ত জাতিকে যখন যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট এমন একটী লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহার সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৬শ কারণ—ইতালীর বর্ত্তমান সকল গবর্ণমেণ্টই—হয় ভয়ে নয় মতে—সঞ্জীবন (Regeneration) কার্য্যের প্রতিকূল।

এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ বিপ্লবসাধনার্থ রাজতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক; ইহার সভ্যেরা ইতালীর রণক্ষেত্রে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া লোক-সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন; এবং যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী আধুনিক ইউরোপীয় বৈপ্লবিক বিস্ফুরণের অভিনেত্রী, সেই সার্ব্বজনীন প্রণালীর নামে সভ্যেরা লোক-সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন।

নব্য ইতালী একতাবাদী (Unitarian) অর্থাৎ ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাজ্যসকলকে এক সাধারণ সূত্রে সম্বদ্ধ করা ইহার অন্যতম লক্ষ্য।

১ম কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

২য় কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত বলপ্রাপ্তির আশা নাই; কিন্তু যখন ইতালী চতুর্দ্দিকে প্রবল, একীভূত ও ঈর্ষা-পরবশ জাতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত,—তখন ইতালীর পক্ষে বল প্রাপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৩য় কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক সুইজরলণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়িবে; সুতরাং অগত্যা তাহাকে কোন সন্নিকৃষ্ট প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিতে হইবে।

৪র্থ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার আবার ইতালীকে আচ্ছন্ন করিবে।

৫ম কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে ইতালীর প্রশস্ত জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির অযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে; সুতরাং সাম্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

৬ ষ্ট কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে মানবজাতি-সাধারণের প্রতি ইতালী যে গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধন-ব্রতে ব্রতী, তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৭ ম কারণ—যখন ইউরোপীয় সমাজ এক বৃহৎ রাজনৈতিক সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তখন ইতালীকে অন্তর্বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া উন্মাদবিজৃম্ভিত মাত্র।

৮ ম কারণ—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে বহুদিন হইতে ইতালীর আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বেগ একতা প্রতিষ্ঠাপনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

নব্য ইতালী সমাজ যে জাতীয় একতার উপাসক, তাহার অর্থ ইতালীর সমস্ত প্রদেশের এক রাজনীতি ও একসমাজ সূত্রে গ্রন্থন। প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। নব্য ইতালী সমাজ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক (Administrative) বিভাগের এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা করিবেন যে প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় একতা এই দুইই সংরক্ষিত হইবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগ—যাহা অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য সকলের নিকট ইতালীর প্রতিভূ স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে—এক এবং কেন্দ্রীভূত থাকিবে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একতা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় জীবন সম্ভবপর নহে। নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মত সকল এবং তাহাদিগের সম্ভাবিত ভাবী পরিণাম—যাহা যাহা সমাজের পত্রিকাদিতে পরিব্যক্ত হইবে—সমাজের মূলধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে: এবং যাঁহারা এই মূল ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহাদিগের এই মূল ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তাঁহারাই নব্য ইতালী সমাজের সভাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

নব্য ইতালী সমাজ হইতে সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রত্যেক মতের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব বাহির হইবে। উন্নতি মানবজাতির জীবন; সুতরাং সেই উন্নতির নিয়মানুসারে এই সকল মতেরও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

যাঁহারা দীক্ষাগুরু তাঁহারা এই সকল মত দীক্ষিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন; এবং দীক্ষিতেরা আবার সেই সকল মত যতদূর সম্ভব ইতালীর জাতিসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত উভয়কেই সতত মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল মতের নীতিমার্গানুসারী প্রয়োগই বিশেষ প্রয়োজনীয়; নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে প্রকৃত নাগরিকত্ব (Citizenship) সম্ভবপর নহে;—কোন গুরুতর কার্য্যের কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান নৈতিক উৎকর্ষ;—যাঁহারা এই সকল মতের প্রচারক, এই সকল মতের সহিত তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের অবিসম্বাদিতা থাকা চাই, অন্যথা তাঁহারা জগতের নিকট অতি ভয়ঙ্কর কপটাচারী ও স্বধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইবেন;—নৈতিক উৎ-

কর্ম্মের দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা অপরকে তাঁহাদিগের মতে আনিতে সক্ষম;—যাঁহারা তাঁহাদিগের মতের সত্যতা অস্বীকার করেন, যদি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িক (Sectarian) বলিয়া ঘৃণা করিবে;—কিন্তু নব্য ইতালীসমাজ সম্প্রদায়বিশেষে বা দলবিশেষে পরিণত হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিতের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে।

যে উপায় দ্বারা নব্য ইতালী সমাজ তাঁহাদিগের লক্ষ্য সংসাধন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহা শিক্ষা এবং বিপ্লব। দুইই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং একটী অপরটীর সহিত যাহাতে সমঞ্জসীভূত হয় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত বাক্য এবং রচনা দ্বারা বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য হইবে। আবার বিপ্লব এরূপ প্রণালীতে সংসাধন করিতে হইবে যে তাহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা সংসাধিত হইতে পারিবে।

এই বিপ্লবোদ্দীপক শিক্ষা ইতালীতে কাযে কাযেই গুপ্তভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু ইতালীর বাহিরে ইহা প্রকাশ্যভাব ধারণ করিবে।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা সমাজের মত প্রচার ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিবেন।

ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই সকল মতের প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপদেশাদি ও সংবাদ ইতালীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই অতি গুপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। এই বিপ্লবের কার্য্যপ্রণালী ভাবী ইতালীর জাতীয় কার্য্য-প্রণালীর বীজস্বরূপ হইবে। যেখানেই বিপ্লবের নবাভ্যুত্থান হইবে, যেখানেই বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন হইবে, যেখানেই বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ইতালীর নাম সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইবে, ইতালীর জাতীয়ভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ইতালীকে একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করা; সুতরাং ইহার কার্য্যপ্রণালী জাতীয় নামেই সম্পাদিত হইবে; এবং যে ইতালীর লোকসাধারণ এতদিন অনাদৃত ও পদদলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই এই বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র অধিনায়ক করিতে হইবে।

নব্য ইতালী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে —ইতালী বাহিরের সাহায্য ব্যতীতও অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে সক্ষম; একটী জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইলে, অগ্রে লোকের মনে জাতীয়

ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে; কিন্তু বৈদেশিক শক্তি দ্বারা বিপ্লব সংসাধিত হইলে এরূপ জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান সম্ভবপর নহে। "নব্য ইতালী" সমাজ অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইয়াছেন যে, যে বিপ্লব বহিশ্চর সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বহিশ্চর ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার জয়লাভ অনিশ্চিত।

যে বিংশতি লক্ষ ইতালীয় এক্ষণে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যে জিনিসের অভাব আছে তাহা শক্তি নহে, আত্মশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বিশ্বাসের উৎপাদন করাই নব্য ইতালী সমাজের প্রধান চেষ্টা হইবে।

ইতালীর পূর্ণ বিপ্লব সাধন করিতে হইলে অগ্রে ইতালীর চতুর্দ্দিকে লোকসাধারণকে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করিতে হইবে; যখন এই অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব আরম্ভ হইবে।

প্রথম অভ্যুত্থান ও ইতালীর পূর্ণ দাসত্ব মোচনের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক কার্য্যভার অল্পসংখ্যক লোকেরই হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

ইতালীতে পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে, একটী জাতীয় সভা সংগঠিত হইবে; তখন সেই জাতীয় সভার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হইবে; যিনি যে কোন ক্ষমতাপ্রার্থী হইবেন তাহা এই সভার নিকট হইতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জাতি আপনাদিগকে বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে 'গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী (Guerilla warfare) অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে অধীন জাতির নিয়মিত ও সুসম্বদ্ধ সেনা থাকার সম্ভাবনা নাই; গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। ইহা অধীন জাতিকে যুদ্ধকুশল করিয়া তুলিবে এবং জন্মভূমির প্রত্যেক স্থানকেই যুদ্ধ-ব্যাপারের পবিত্র স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী স্থানীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্যদক্ষতা উৎপাদন করে; শত্রুদিগকে অনভ্যস্ত যুদ্ধপ্রণালীতে বলপূর্ব্বক অবতারিত করে; অতিবিস্তৃত সমরে ভীষণ পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে দেশবাসীদিগকে সংরক্ষিত করে; এবং জাতীয় সমরকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করেনা। এই সকল কারণে ইহা অজেয় ও অবিনাশ্য।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী দ্বারা যখন শত্রুসৈন্য ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত ও অতিযত্নে শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত

সেনাদ্বারা বিপ্লবকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

"নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেকেই এই সকল মত প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হইবে, তাহাতে সেই সকল মত অতিশয় পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা অভ্যুত্থানকাল (Period of Insurrection) নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৫ম শাখা।

"নব্য ইতালী" সভার প্রত্যেক সভ্যকে সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতিমাসে অন্যূন অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইবে। যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে অবস্থার ক্রমানুসারে অধিকতর চাঁদা দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ শাখা।

"নব্য ইতালীর" পরিচায়ক বর্ণ—শ্বেত, লোহিত এবং হরিৎ হইবে। "নব্য ইতালীর" ধ্বজপতাকা এই তিন বর্ণই ধারণ করিবে এবং পতাকার এক দিকে—**স্বাধীনতা, সাম্য ও পরোপকারব্রতত** ও অন্যদিকে—**একতা ও স্বাতন্ত্র্য** এই বাক্য গুলি লিখিত থাকিবে।

৭ম শাখা।

প্রত্যেক সভ্যকে "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যপদে দীক্ষিত হওয়ার সময় দীক্ষাগুরুর সমীপে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হইবে :—

ঈশ্বর ও ইতালীর নামে—এবং সেই মহাত্মাদিগের নামে যাঁহারা ইতালী উদ্ধাররূপ পবিত্র যজ্ঞে স্বদেশীয় যথেচ্ছচারিণী শক্তির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন—

যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে আমার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি আমি যে কর্ত্তব্য-ঋণে আবদ্ধ, তাহার নামে—

যে দেশ আমার জননীকে জন্ম প্রদান করিয়াছে, যে দেশ আমার পুত্রকন্যাদিগের ভাবী ক্রীড়াস্থল হইবে, সেই দেশের প্রতি আমার হৃদয়ে যে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রণয় বিরাজমান রহিয়াছে, সেই প্রণয়ের নামে—

অন্যায়, অবিচার, অশুভ, পরাধিকারগ্রহণ ও যথেচ্ছচারিণী শাসনপ্রণালীর প্রতিকূলে আমার হৃদয়ে যে বলবতী ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে :—

যখন আমি অন্যান্য দেশের স্বাধীন নাগরিকের নিকট দণ্ডায়মান হই এবং জানিতে পারি যে তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নাই, যাহাকে নিজের দেশ বলিতে পারি এমন দেশ নাই, এবং নিজের জাতীয় পতাকা নাই, তখন যে প্রবল

লজ্জার বেগে আমার ললাটদেশ আলোড়িত হয়, তাহার নামে ঃ—

আমার যখন মনে হয় যে আমার আত্মা স্বাধীনতাসুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, যখন আমার মনে হয় যে আমার আত্মা জগতের অনন্ত শুভ সাধনে সক্ষম হইয়াও দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় জগতের কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন আমার হৃদয়ের যে বলবতী ইচ্ছা স্বাধীনতার দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, তাহার নামে ঃ—

ইতালীর অতীত মহত্ত্বের যে স্মৃতি ও বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার যে জ্ঞান আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে ঃ—

সংক্ষেপতঃ ইতালীর অসংখ্য অধিবাসী অহরহ যে দারুণ দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার নামে ঃ—

আমি অমুক,——যাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে যে জগদীশ্বর ইতালীকে জগতের মঙ্গল সাধন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক ইতালীয়েরই কর্ত্তব্য তদুদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করা—

—যাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস, যে ইতালী একটী স্বাধীন জাতিরূপে পরিণত হয় ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন তিনি তৎসাধনোপযোগী শক্তি অবশ্যই ইতালীর অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিয়াছেন; সেই শক্তির আধার ইতালীর লোকসাধারণ; এবং সেই শক্তি লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই জয় লাভ হইবে—

—যাহার বিশ্বাস যে আত্মত্যাগে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাতেই প্রকৃত বল—

সেই আমি, "নব্য ইতালী" সমাজের—যে নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত এক মতে, এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও সম্বদ্ধ—সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি—

যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে—

ইতালীকে একটী সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাক্য, রচনা ও কার্য্যদ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজবন্ধন "নব্য ইতালীর" অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায় তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব এবং যে নৈতিক উৎকর্ষ জয় চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না।

কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না। যাঁহারা "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ, তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করি-

বেন, সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসম্বাদী না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব; এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গূঢ়তা রক্ষা করিব।

কার্য্য ও পরামর্শ দ্বারা সমাজস্থ ভ্রাতৃগণের সতত সাহায্য করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞাপালনে—এক্ষণে ও অনন্তকালের জন্য—আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।

যদি কখন আমি আমার এই প্রতিজ্ঞা-সকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে, মানবী ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে, এবং মিথ্যাশপথ-কারীর অক্ষালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্তকালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাট্‌সিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাট্‌সিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইত্যালী সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল।

নব্য ইতালী সমাজ ম্যাট্‌সিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা। সুতরাং ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনে ম্যাট্‌সিনির যতদূর আগ্রহ ও যত্ন হইবার সম্ভাবনা ততদূর আর কাহারও সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনের জন্য যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা তৎকালে ম্যাট্‌সিনি ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই ছিল। আরও বিপ্লবের সময় অধিনয়ন কার্য্যভার অধিক লোকের হস্তে সমর্পিত থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকা দুরূহ। এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি স্বয়ংই ইহার অভিনেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন।

অভিনেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছামত তাঁহার কার্য্য করিবার যো ছিল না। কারণ নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহাকে সতত আবদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সে গুলি হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলে তাঁহার সহশ্রমীগণ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেন; সুতরাং ম্যাট্‌সিনিকে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ও ভ্রমসংশোধন করিতে হইত।

বস্তুতঃ অভিনেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ম্যাট্‌সিনিকে কষ্টের বোঝাই অধিক বহিতে হইয়াছিল। অপযশ, বাধা, নির্য্যাতন প্রভৃতি তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই প্রায় রিক্তহস্ত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি চারি মাস অন্তর বাটী হইতে জীবনধারণোপযোগী কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন। তিনি তাহা হইতেই যতদূর সাধ্য কিছু বাঁচাইয়া সভায় চাঁদা দিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় ছিল। তথাপি তাঁহারা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত সাগরে ঝাঁপ দিলেন! যদি তাঁহাদিগের মতে কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই অনেকে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন এবং অর্থ সাহায্য করিবেন—এই অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দক শূন্য কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত বিপ্লবতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতবাসি! পূর্ব্বপুরুষগৌরবদৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন্! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস, ও দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার শিক্ষা কর।

তড়িৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গ্রে সাহেব কর্তৃক শেষোক্ত পরীক্ষিত সত্যটী প্রচারিত হইলে পদার্থবিদ্‌গণ আগ্রহ সহকারে তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং বিবিধ প্রকারে পরীক্ষিত হইয়া সত্যটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইক্ষণে পরিচালক এবং অপরিচালক বস্তু সমূহের তালিকা প্রস্তুত হইল। আরও নির্দ্দিষ্ট হইল যে, যে সমস্ত পদার্থ তড়িদুত্তেজক (electrics) তাহারাই মন্দ তড়িৎ-পরিচালক; এবং তড়িদনুত্তেজক (non electrics) পদার্থ মাত্রেই উত্তম পরিচালক। উত্তরোত্তর আরও পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে পদার্থ মাত্রেই ন্যূনাধিক তড়িৎ-সঞ্চালক এবং ধাতু সমস্ত, অম্ল, জল, জীব, উদ্ভিদ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে উত্তম সঞ্চালক, এবং কাচ, রেশম, বায়ু, গন্ধক, রঞ্জন, গালা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অধম সঞ্চালক।

উক্ত আবিষ্ক্রিয়ার সমকালে ফরাসি রাজ্যের উদ্যানতত্ত্বাবধারক ডুফে (Dufay) দৈব ঘটনা যোগে প্রথম লক্ষ করেন যে তাড়িত তরল দুই বিভিন্ন প্রকার। এক দিবস পরীক্ষা কালীন তিনি এক খানি স্বর্ণ ফলক (gold leaf) ঘর্ষিত কাচ দণ্ড হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটী লাক্ষা দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ঐ প্রতিক্ষিপ্ত ফলকের নিকট ধারণ করিলেন। তাহাতে ফলক উত্তেজিত লাক্ষা দণ্ড হইতেও প্রতিক্ষিপ্ত না হইয়া তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং উপর্য্যুপরি কয়েকবার ঐ পরীক্ষাটী করিয়া দেখিলেন যে স্বর্ণ ফলক ঘর্ষিত কাচ দণ্ড দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত হইলে পরে ঘর্ষিত লাক্ষাদণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল এবং তদ্বিপরীত, লাক্ষা কর্ত্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া কাচ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। সুতরাং তদ্দর্শনে ডুফে অনুমান করিলেন যে উভয়—কাচজ এবং লাক্ষাজ তড়িৎ কখন এক প্রকার হইতে পারে না। তজ্জন্য কাচোদ্ভূত তড়িৎকে তিনি (Vitreous) কাচজ, এবং লাক্ষাস্থিত তড়িৎকে (Resinous) লাক্ষাজ নাম প্রদান করিলেন। তৎকালীন পদার্থবিদ মাত্রেই উক্ত বিভিন্নতা এবং অভিনব নামদ্বয় স্বীকার করেন।

ঐ সময়ে মানব দেহ হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাবন দ্বারা কতিপয় তত্ত্ববিৎ জন সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন। এতদ্দ্বারা তড়িৎ বিদ্যার চর্চ্চাও অনেক বৃদ্ধি হয়। গ্রে সাহেব একটী ছোট বালককে আসন সহিত চুলের দড়ি দ্বারা ঝুলাইয়া একটী কাচ দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া বালকের শরীর মধ্যে তড়িৎ প্রদান করেন। তৎপরে তাহার গাত্রের যে

কোন অংশের নিকট গ্রে তাঁহার অঙ্গুলি ধারণ করিলেন, তথা হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হইতে লাগিল। এরূপ *প্রত্যক্ষের সামান্য কারণ এই যে জীব* দেহ মাত্রই আভ্যন্তরিক রসাধিক্য বশতঃ উত্তম তড়িৎ পরিচালক। সুতবাং মানব দেহ কোন প্রকাবে বিচ্ছিন্নাবস্থায় (insulated) স্থাপিত হইলে তড়িৎ ধারণ-ক্ষম হয়, এবং শরীর-মধ্যগত অতিরিক্ত তড়িৎ ব্যাপ্তভাবে অবস্থিতি করে। তজ্জন্য তড়িৎ-পূর্ণ শরীরের যে কোন স্থানে কোন তড়িদনাক্রান্ত বস্তু ধৃত হয়, তথা হইতে আলোক রূপে তড়িৎ বহির্গত হইয়া ধৃত পদার্থে প্রবেশ করে।

গ্রে সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার পর ডুফে স্বয়ং উক্ত প্রকারে আপনার শরীরকে তড়িৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এবং তৎকর্ত্তৃক এই সময়ে চুলের দড়ির পরিবর্ত্তে গালার আসন এবং কাচের টুল বিচ্ছেদক রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে সুবিধা জনক বিচ্ছেদকের আবিষ্কার হওয়ায় অনেক কৃতবিদ্য এবং পদার্থবিদ্ ঐ পরীক্ষা দ্বারা আমোদ করিতে লাগিলেন।

আঠার শ শতাব্দিতে জার্ম্মান দেশে কতিপয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গুলির বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং পরীক্ষা আরম্ভ করেন। উইডেনবর্গের অধ্যাপক বোজ (Boze) সাহেব তড়িৎউদ্ভাবনের সুবিধা হেতু পূর্ব্ব আবিষ্কৃত তড়িৎযন্ত্রের বিশেষ সংস্কার করেন। তিনি গন্ধক বর্ত্তুল যন্ত্রের গন্ধক বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে কাচের বর্ত্তুলের ব্যবহার করিলেন। এবং উৎপন্ন তড়িৎকে পাত্রান্তরে একত্রিত করণাভিপ্রায়ে বর্ত্তুলের সম্মুখে তিনি অপর এক ব্যক্তিকে একটী বিচ্ছেদক টুলের উপর দণ্ডায়মান রাখিতেন। সেই ব্যক্তি একটী ধাতব দণ্ড হস্তে লইয়া বর্ত্তুলের নিকট ধারণ করিত। তাহাতে বর্ত্তুলোৎপন্ন তড়িৎ ঐ দণ্ডে গিয়া জমিত। কিয়ৎকাল এই রূপ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ঐ ধাতব দণ্ড, যাহা তড়িৎ-যন্ত্রের মূল-পরিচালক (prime conductor of the Electrical machine) নামে অভিহিত হয়, রেশমের সূতা দ্বারা বর্ত্তুলের সম্মুখে দোদুল্যমান রাখিতেন। পূর্ব্ব মত অন্য এক ব্যক্তিকে আর ধরিয়া থাকিতে হইত না। প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ সংগ্রহ করণাভিপ্রায়ে বোজ সাহেব ঐরূপ ৪, ৫টী বর্ত্তুল এককালে ঘূর্ণিত করিয়া তদুৎপন্ন তড়িৎ সমষ্টি একটী মাত্র ধাতব পরিচালকে সঞ্চিত করেন। কথিত আছে এই প্রকারে এত অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হইত যে তাহার আঘাতে হস্তাঙ্গুলি হইতে রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হইত। এবং আপাদ মস্তক সমস্ত শরীরে তাহার সংক্ষোভ-shock-বিলক্ষণ রূপে অনুভূত হইত। অধিকন্তু তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র পক্ষির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইত। যদি ও এরূপ বাহুল্য বর্ণনা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না, ফলতঃ ঐ যন্ত্রের সাহায্যে যে অধিক পরিমাণে তড়িৎ একত্রিত হইত

এবং তাহার কার্য্যও যে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালের অত্যুৎকৃষ্ট তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যেও উক্ত রূপ বর্ণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই সময়ে ইউরোপীয় পদার্থ বিজ্ঞানবিৎগণ দ্বারা তড়িৎ সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আরব্ধ হয় তন্মধ্যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গের দ্বারা দাহ্য পদার্থের প্রজ্বলন সর্ব্বাপেক্ষা জনসাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন করিয়াছিল। বার্লিন নগর নিবাসী ডাক্তার লিউডল্‌ফ (Dr. Ludolph of Berlin) সর্ব্বপ্রথমে এই পরীক্ষা সংসাধন করেন। তৎপরে উহা ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অতি অল্পকাল মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তীব্র সুরা (Spirits of wine) এবং ফসফরাস (Phosphorus), তড়িৎস্ফুলিঙ্গ সংযোগ মাত্রেই প্রজ্বলিত হয় দেখিয়া অপর-সাধারণ কি, তত্ত্ববেত্তারাও এরূপ আশ্চর্য্য হইলেন যে তাঁহারা অধিকতর আগ্রহের সহিত পদার্থ বিদ্যার এই শাখার বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। এমন কি এই পরীক্ষাটি এবং তড়িতের অপরাপর আবিস্কৃত অদ্ভুত কার্য্য সমূহ সমগ্রে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া কতিপয় তত্ত্ববিদ পণ্ডিত প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।

তাড়িত তরলের দাহিকা শক্তির আবিস্কারের অব্যবহিত পরেই লিডেন বোতলের (Leyden phial or jar, আবিস্কার হয়। ইতিপূর্ব্বাবিস্কৃত তাবৎ তড়িৎ কার্য্যাপেক্ষা এইটী পরমাশ্চর্য্য। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লিডেন নগর নিবাসী এম্‌ কিউনিয়স (M Cuneus) ইহার প্রথম আবিস্কর্ত্তা। অধিকাংশ আবিস্ক্রিয়ার ন্যায় এইটীও আকস্মিক ঘটনা দ্বারা প্রথম সূত্রপাতিত হয়। যন্ত্রযোগে প্রচুর পরিমাণে তড়িদুদ্ভাবন করিয়া, তাহাকে কি উপায়ে পাত্রবিশেষে কিয়ৎক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখা যায়, তদুদ্দেশে অধ্যাপক মসেনব্রেক (Professor Muschenbrœk) কর্ত্তৃক একটী সুনিপুণ পরীক্ষা কল্পিত হয়। তিনি কল্পনা করেন যে কোন অপরিচালক বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত একটী পরিচালক পদার্থে বহুল পরিমাণে তড়িৎ প্রদান করিলে, তড়িৎ শীঘ্র ইতস্ততঃ বিসৃত (dissipated) হইবে না, এবং তাহার ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব যথেষ্ট হইবে। তদভিপ্রেত প্রতিপাদনোদ্দেশে তিনি এই উপায় অবলম্বন করেন। একটী কাচের বোতলকে অর্দ্ধজলপূর্ণ করিয়া ছিপিদ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ করেন। তৎপরে এক লৌহশলাকা লইয়া তাহাকে ছিপি ভেদ করত বোতলস্থ জলসংলগ্ন করিয়া রাখেন। শলাকার কিয়দংশ ছিপির উপরিভাগে বাহিরে রহিল। বোতলসহিত ঐ অংশকে তড়িৎ-যন্ত্রের মূল পরিচালকের সমীপে স্থাপিত করিয়া বোতলকে তড়িৎপূর্ণ করেন। এই রূপে উক্ত অধ্যাপকের কল্পিত পরীক্ষা প্রণালীটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বটে, এবং বোতল মধ্যে প্রভূত

তড়িৎ সঞ্চিতও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বোতলের বহির্গাত্র কোন পরিচালক বস্তুদ্বারা বেষ্টিত না করাতে, তিনি তন্মধ্যস্থ তড়িতের সত্ত্বা কিছুমাত্র উপলব্ধি করেন নাই, অর্থাৎ তড়িৎ কোন রূপে প্রকাশমান বা কার্য্যকর হয় নাই। কিউনিয়স উক্ত অধ্যাপকের অনুকরণে ঐ পরীক্ষা সাধন করিতে গিয়া, দৈব ক্রমে এক হাতে বোতলটি ধরিয়া অপর হাতদ্বারা যেমন লৌহশলাকা তড়িৎ যন্ত্র-পরিচালক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন, অমনি বাহুদ্বয়ে গুরুতর সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পর অধ্যাপক স্বয়ং এই পরীক্ষা উক্তরূপে করিয়াছিলেন। তাহাতে অন্যতর কোনও ফল প্রাপ্ত হন নাই। এই সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত তত্ত্ববেত্তাগণ লিডেন বোতলকে একহস্তে ধারণ করিয়া তাহার পরীক্ষা সমস্ত করিতে থাকেন। কিন্তু এপ্রকারে ধৃত হইলেই যে বোতল কার্য্যকর হইবে নচেৎ হইবে না তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধানে তৎকালীক কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কেহ কেহ বলেন যে কিউনিয়সের পূর্ব্বে ভন ক্লিষ্ট—Von Kleist—নামক জনৈক জার্মান ধর্ম্মপ্রচারক লিডেন বোতলের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। অধিকন্তু তিনি তদ্দ্বারা সুরা প্রজ্বলন প্রভৃতি তড়িতের অপরাপর অদ্ভুত কার্য্য গুলির পরীক্ষাও করেন। কিন্তু তিনিও লিডেন বোতলের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হন নাই।

লিডেন বোতলের কার্য্য দর্শনে অপর সাধারণে স্বভাবতই প্রথমতঃ অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছিল। অনেকানেক সুবিজ্ঞ তড়িৎ-বেত্তাগণের ও মন এরূপ আকৃষ্ট হয় যে তাঁহারা বোতলের সংক্ষোভণী শক্তির এবম্প্রকার বাহুল্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে সেরূপ ফল তৎকালীন সামান্য এবং অসম্পূর্ণ বোতল হইতে কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অধ্যাপক মাসেনব্রেক বলেন, যে লিডেন বোতল হইতে তিনি বাহুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, এবং স্কন্ধ দেশে এরূপ কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হন যে তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষণেক শ্বাস বদ্ধ হইয়া যায়, ও দুই দিবস তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। সমস্ত ফরাসী রাজ্য পাইলে ও তিনি দ্বিতীয় বার বোতলের সংক্ষোভ লইবেন না। এলামণ্ড (Allamond) নামক উক্ত অধ্যাপকের জনৈক সহকারী পরীক্ষক কহেন, যে তিনি বোতলের সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং দক্ষিণ হস্তে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। লিপজিক নিবাসী অধ্যাপক উইঙ্ক্লার্ (Professor Winckler of Leipsic) বলেন, যে প্রথমবার লিডেন বোতলের সংক্ষোভ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর ও শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, মস্তকে এক বৃহৎ প্রস্তরের ভার অনুভূত হয়, এবং নাসারন্ধ্র দিয়া শোণিত মোক্ষণ হয়।

উক্ত ভয়াবহ বর্ণনা সমূহ প্রচারিত হইলেও অনেকে কৌতুহল পরবশ হইয়া

লিডেন বোতলের কার্য্য দর্শনে এবং তাহার সংক্ষোভ অনুভব করণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্রমে বোতলটী অর্থ উপার্জ্জনের এক সুন্দর উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বস্থানে অর্দ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে লিডেন বোতল, তড়িৎযন্ত্র, এবং তাহার উপকরণসামগ্রী সমস্ত সঙ্গে লইয়া পথে পথে এবং বাটী বাটী ভ্রমণ করিয়া তড়িতের বিস্ময়কর পরীক্ষা গুলি প্রদর্শন দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। তত্ত্ববিশারদগণ ও ঐ সময়ে লিডেন বোতলের গুণ সমূহের সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেন। বোতলের কার্য্যকারিতার উপযোগী অবস্থা সমস্ত আরও স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইল। অনেক অভিনব তত্ত্বও নির্ণীত হইল। কিন্তু তত্ত্বাবত্তের যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হয় তৎসমুদয় ভ্রমসঙ্কুল। যন্ত্রটির গঠনের ও অনেকাংশে উন্নতি হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তাননতন বোতল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এবং তাহার অন্তর ও বহির্গাত্র ধাতবফলক দ্বারা মণ্ডিত (coated) হয়। অন্তরফলক (inside coating) জলের এবং বহিফলক হস্তের পরিবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হইল।

এই সময়ে তড়িতের প্রচণ্ড বল এবং অসামান্য বেগশালীতা প্রকাশক নানাবিধ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ফরাসীরাজসমক্ষে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে ১৮০ জন প্রত্যেকে অপরের হস্ত ধারণ করত অবিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া ও এক প্রান্তস্থ ব্যক্তি বোতলের বহির্দ্দেশ এবং অপর প্রান্তস্থ ব্যক্তি বোতলস্থ ধাতব ফলকসংলগ্ন লৌহতার স্পর্শ করিয়া, তাৎক্ষণিক—instantaneous—সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়।

অনেকে কতিপয় লিডেন বোতল একত্রে সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তাড়িৎ বল সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যে এবম্প্রকারোদ্ভূত তড়িৎ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার দাহ্য পদার্থ প্রজ্বলিত, স্বর্ণতার ও ফলক বিগলিত এবং ক্ষুদ্র জীবের প্রাণনাশ হয়। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন উক্ত প্রকার কতিপয় লিডেন বোতলের যোগে ৬ জন ব্যক্তিকে এককালে ভূতলশায়ী করেন। তিনি স্বয়ংও অনেক বার তাহার সংক্ষোভ প্রাপ্ত হন। এবং তদ্দ্বারা তিনি লৌহদণ্ডে চৌম্বকীয় গুণ প্রদান করেন।

ইহার পর ডাক্তার ওয়াটসন্—Dr Watson—, লর্ড, সি, ক্যাভেনডিস্—Lord C. Cavendish—প্রভৃতি কতিপয় তত্ত্বজ্ঞ তড়িৎ-প্রবাহের বেগ নির্দ্ধারণোদ্দেশে বিবিধ পরীক্ষা সংসাধন করেন। তন্মধ্যে একটী পরীক্ষায় টেম্‌স্—Tames—নদীর পারাপারে তড়িৎ স্রোত সঞ্চালিত হয়। এবং অপর একটীতে ক্রোশ পরিমাণ লম্বিত তারের ও ক্রোশ বিস্তৃত শুষ্ক ভূমির মধ্য দিয়া তাৎক্ষণিক তড়িতোদ্গম লক্ষিত হয়। এই রূপে পৃথিবীর তড়িৎ সঞ্চালকত্ব শক্তির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা তড়িৎ

বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে আমাদিগের একটী মহোপকার সংসাধিত হইয়াছে।

লিডেন বোতলের প্রক্রিয়ার গুঢ় কারণ সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্তমত প্রকটিত হয়। অবশেষে ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ বহ্বায়াসে যন্ত্র যোগে পরীক্ষা দ্বারা লিডেন বোতলের প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য সমূহের নিয়মাবলীর বাস্তবিকতা সপ্রমাণ করেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন যে বোতল পৃথিবীর সহিত সংস্পৃষ্ট ভাবে রক্ষিত না হইলে তাহাকে কখনও তড়িৎ-পূর্ণ করা যায় না। এবং বোতলমধ্যস্থ ও তৎবহির্গাত্রস্থ তড়িৎ দুইটী বিভিন্ন প্রকার। বোতল মধ্যে যে পরিমাণে ও যে বর্ণের তড়িৎ প্রদত্ত হইবে, তাহার বহির্দ্দেশ হইতে সেই পরিমাণে অপর বর্ণ তড়িৎ বোতল সংস্পৃষ্ট কোন পরিচালক দ্বারা পৃথিবীতে তাড়িত হইবে। বোতল পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় স্থাপিত হইলে তাহাকে কখনও তড়িদাক্রান্ত করা যায না। সেই জন্য তাহার বাহ্যদেশ হইতে কোন পরিচালক পদার্থ পৃথিবী সংলগ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

তড়িদাক্রান্ত লিডেন বোতলের অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্ক্‌লিনের মত এই যে বোতলের অভ্যন্তর ঘর্ষিত কাচ দ্বারা অর্থাৎ কাচজ তড়িৎপূর্ণ করিলে বোতলের বহির্ভাগ ও সেই পরিমাণে তদ্বিপরীত অর্থাৎ লাক্ষাজ তড়িৎপূর্ণ হইবে। এই দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পর আকর্ষণ শীল। কিন্তু উভয়ের মধ্যস্থিত অপরিচালক কাচ ও চতুর্দ্দিগস্থ বায়ু ব্যবধান থাকায় উভয়ে মিলিত হইতে না পারিয়া পৃথক অবস্থায় অবস্থান করে। এবং বোতলের অন্তর ও বহির্দ্দেশ কোন পরিচালক বস্তু দ্বারা পরস্পরের যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলে উক্ত তড়িৎদ্বয় বেগে অগ্রসর হইয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে লিডেন বোতলের কার্য্য সমস্ত সংঘটিত হয়।

ফ্রাঙ্ক্‌লিন আরও নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করেন যে লিডেন বোতলাভ্যন্তবস্থ তড়িৎ বোতলের কাচের উপরিভাগে অবস্থিতি করে; ধাতব ফলকে নহে। যে ধাতব ফলক দ্বারা বোতলের ভিতর দিকের কাচ মণ্ডিত থাকে তন্মধ্যে তড়িৎ সঞ্চিত হয় না। তদ্দ্বারা কেবল কাচোপরি বিস্তৃত তড়িৎ রাশী সঞ্চালিত হইয়া একটী বিন্দুতে একত্রীভূত হয়। ইহার বাস্তবিকতা তিনি একটী সুন্দর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন। একটী ধাতব পাত লইয়া তাহাকে আটা দ্বারা বোতলাভ্যন্তর মণ্ডিত না করিয়া পৃথক এবং আল্‌গা ভাবে তন্মধ্যে স্থাপিত করেন। তৎপরে বোতলকে তড়িদাক্রান্ত করিয়া উক্ত পাত বাহির করিয়া লইয়া তদপরিবর্ত্তে অন্য একটী পাত সেই স্থানে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে বোতলস্থ তড়িতের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

লিডেন বোতল সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিন্ যে

সহজ ও সুন্দর মতটী প্রকাশ করেন তদ্দ্বারা তড়িৎতত্ত্বের একটী মহৎ সত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি অনুমান করেন যে কাচ প্রভৃতি তাড়িত পদার্থের (Electrics) ঘর্ষণ দ্বারা অতিরিক্ত তড়িৎ উদ্ভূত হয় না। ঘর্ষণ দ্বারা তদ্বস্তুগত সহজাবস্থ তড়িতের সাম্যাবস্থা (Equilibrum) নষ্ট হয়। তাহা হইলে পদার্থ বিশেষে কেহ সহজাবস্থাপেক্ষা কম কেহ বা অধিক তড়িদাক্রান্ত হয়। এই ন্যূনতা এবং অধিকতর অবস্থাদ্বয় বিয়োগিক ও যৌগিক সংজ্ঞাদ্বয় দ্বারা আখ্যাত। সুতরাং এ মতানুসারে এক প্রকার তাড়িত তরলের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া থাকে। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে তাড়িত তরলের পরমাণু সমস্ত পরস্পর বিয়োজনশীল(repulsive) তজ্জন্য সমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত দুইটী পদার্থ পরস্পরকে প্রতিক্ষেপণ করে। অসমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত দুই বস্তু অর্থাৎ একটী সহজাবস্থাপেক্ষা অধিক ও অপরটি কম তড়িৎ যুক্ত পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইলে যৌগিক তড়িৎ অপরটীতে গিয়া মিশিয়া উভয়ের সাম্যাবস্থায় সংস্থাপন করণের একটি আসক্তি প্রাপ্ত হয়। ঐ আসক্তির বেগকে আকর্ষণ কহে। তন্নিমিত্ত দুইটি অসমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

ফ্রাঙ্কলিনের উক্ত মতানুসারে যদিও অধিকাংশ তড়িৎ প্রত্যক্ষ (phenomena) সহজে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু অন্যতর সংস্কৃত মত তৎপরে প্রচারিত হওয়ায় উহা অধুনা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই মতের বিষয় যথা স্থানে উল্লেখ করা যাইবে। [ক্রমশঃ—

শ্রীতাঃ—

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত করিবার জন্য কে দায়ী? কাহার দোষে অনন্তপ্রবাহ নরশোণিতে মুলতান প্লাবিত হইল? কে যুদ্ধ-মাদকতায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের জন্য নয়, মাসের জন্য নয়, জীবনের তরে হতভাগ্য মুলরাজকে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করিল? আমরা অতীত সাক্ষী ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিয়া এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিব। মুলতানঘটিত গোলযোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, মুলরাজ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় পদোচিত বীরতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে লাহোর দরবারে স্বীয় অবস্থা জানাইলেন, ধীরভাবে ব্রিটীষ রেসিডেণ্টের নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করিলেন, এবং পরিশেষে তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ধীর-

ভাবে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শাসন কর্ত্তার হস্তে মুলতানের শাসন ভার সমর্পণ করিলেন। এরূপ ধীরতা কখন বিশ্বাসঘাতকতার জননী হইতে পারে না, এরূপ সরলতা হইতেও কখনও দুরভিসন্ধি বাহির হয় না। মুলরাজ দুর্গের সহিত সর্দ্দার খান সিংহ মানের হস্তে যুদ্ধোপযোগী কামান ইত্যাদিও সমর্পণ করিয়াছিলেন, * যদি মুলরাজ রণমদে মাতিয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও ধীরভাবে কামান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে সমর্পণ করিতেন না। যে দুইজন ব্রিটীষ্ কর্ম্মচারী দুর্গ মধ্যে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েন, মুলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি বরাবর ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ভ্যানস্ আগ্নু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, মুলরাজের কোন দুষ্টাভিসন্ধিতে তাঁহারা আহত হয়েন নাই †। মুলরাজের সদাশয়তার এরূপ বলবৎ প্রমাণ থাকাতেও কেবল সার্ ফ্রেডরিক কারির অব্যবস্থিততায় মুলতানে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সার ফ্রেডরিক মুলরাজের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট দশ বৎসরের হিসাব চাহিলেন, মুলরাজ উত্তর দিলেন, "আমি কি প্রকারে পিতৃঠাকুরের কাগজাত দাখিল করিব। তৎসমুদয় কীট-দষ্ট অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।" এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই মুলরাজের হৃদয় ঘোর নৈরাশ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল, রেসিডেণ্টকে স্বীয় অবশ্যম্ভাবি পতনের অধিনায়ক ভাবিয়া মনঃক্ষুণ্ণ শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বার নম্রভাবে কহিলেন "আমি আপনার মুষ্টি মধ্যেই আছি *"। মুলরাজের এই শেষোক্ত উক্তি শ্রবণে কে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধিক্কার দিবে? কে তাঁহাকে বিপ্লবকারী বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ উদারতা, এইরূপ নম্রতা দর্শনেও সার ফ্রেডরিক কারির হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া রহিল, তিনি মুলরাজের সর্ব্বনাশ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না, ভ্যান্স আগ্নু ও আণ্ডার্সন মুলতানবাসিগণের রণমত্ততায় নিহত হইলেন। ভ্যান্স আগ্নু

* Herbert Edwardes—A year on the Punjab Frontier. Vol II.

† ভ্যান্স্ আগ্নু আহত হইয়াই লাহোরে সার্ ফ্রেডরিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখেন, তাহাতে এই উদার বাক্যটী ছিল:—"আমার বোধ হয় না মুলরাজ ইহার মধ্যে আছেন।" Herbert Edwardes—A year on the Punjab Frontier. Vol II.

* Torrens—Empire in Asia P. 338.

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মুলরাজকে নির্দ্দোষী বলিয়া সার ফ্রেডরিকের নিকট পত্র লিখিলেন, তথাপি সার ফ্রেডরিক কারি মুলরাজের স্কন্ধে সমুদয় দোষ ভার চাপাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে এক দল ব্রিটীয় সৈন্য পাঠাইলেন। প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনরলের পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যেও তিনি নিবস্ত হইলেন না। সার ফ্রেডরিক কারি কে? দেওয়ানী কার্য্যের এক জন রণমূর্খ কর্ম্মচারী মাত্র। আর লর্ড গফ কে? সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসমষ্টির সর্ব্ব প্রধান অধিনায়ক। (৪) এক জন যুদ্ধানভিজ্ঞ দেওয়ানি কর্ম্মচারী অনায়াসে এই রণপণ্ডিত অধিনায়কের বাক্য পদদলিত করিয়া মুলরাজকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান করিলেন।! ব্রিটীষ কার্য্য এই রূপ অনন্ত বিষয়ের অনন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ। ব্রিটিষ ইণ্ডিয়া এইরূপ অনন্ত লোভ, অনন্ত দৌরাত্ম্য ও অনন্ত কৌশলে অর্জ্জিত।

ব্রিটিষ সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে আসিলে মুলরাজ যখন বীর বেশ ধারণ করিলেন, তখনও আমরা তাঁহাকে দুষিতে পারি না। ব্রিটীয় রেসিডেন্টের রাজ্যকণ্ডূয়ন যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখনই মুলরাজ আত্ম মর্য্যাদা রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; ইহা প্রকৃত বীর পুরুষের লক্ষণ। যিনি কুকুরবৎ বারম্বার প্রহৃত ও অপমানিত হইয়াও প্রহার ও অপমানকর্ত্তার পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়েন, আমরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া শত হস্ত দূর হইতে ধিক্কার দিই। ইতিহাসে এরূপ কুক্কুরের সংখ্যা যত কমে, ততই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হয়।

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে লাহোর-দরবার ব্রিটীষ রাজনীতি অথবা চাতুরীর কয়েকটী তরঙ্গ পুনর্ব্বার দোলায়িত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা পূর্ব্বে মুলরাজের হাঙ্গামাকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এই রাজনীতিতেই উহার প্রধান কারণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটী ধরিতে হয়:— পঞ্জাব হইতে মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটীষ রেসিডেণ্টের অমত এবং সর্দ্দার ছত্র সিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট্ ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্ব্যবহার (৫)।

মহারাণী ঝিন্দনকে যেরূপ নিষ্ঠুরতার

(৪) Sir charles James Napier—Defects in the Indian government, p. 222.

(৫) Major Evans Bell—Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 102. Comp: Torrens—Empire in Asia.

সহিত পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা পূর্ব্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। খালসা সৈন্যগণ যাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় নির্ব্বাসনে তাহাদিগের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। শিখ সেনাপতি সের সিংহ রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন করিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করেন, "ইহা সকলেই ভাল রূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে। তাঁহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিতেও ত্রুটী করে নাই (৬)।"

কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁও মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি ইংরেজদিগের দুর্ব্ব্যবহার শিখদিগের অসন্তুষ্টির একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি কাপ্তেন আবট্‌কে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "মহারাজ দলীপ সিংহের মাতা ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করাতে সমস্ত শিখ জাতি দিন দিন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে" (৭)। অধিক কি, স্বয়ং সার ফ্রেডরিক কারিও ১৮৪৮ অব্দের ২৫এ মে তারিখে এই বিষয় প্রসঙ্গে গবর্ণর জেনারেলকে লিখিয়াছিলেনঃ—"সেনাপতি সের সিংহের শিবির হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন শুনিয়া খালসা সৈন্য নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ঝিন্দন খালসাদিগের মাতৃ-স্থানীয় ছিলেন, তিনি যখন নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এবং মহারাজ দলীপসিংহ যখন ইংরেজদিগের হাতে আছেন, তখন তাহারা কখনই মুলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না"(৮)। এই সর্ব্বজনীন বিরাগের মূল কারণ কে? কাহার দোষে সমস্ত পঞ্জাব এই রূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে সার ফ্রেডরিক কারিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। সার ফ্রেডরিক প্রতিনিধি সভার সম্পূর্ণ অমতে কেবল গবর্ণর জেনরলের লিখিত অনুমতি লইয়া মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন (৯)!! যিনি চিরদিন ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সহিত

(৬) Retrospects and prospects of Indian policy. P. 108 comp: Panjab Papers, 1849, p. 392.

(৭) Panjab Papers, 1849, p. 512 comp: Restrospects. p. 108.

(৮) Panjab Papers. 1849, p. 179. Retrospects 108.

(৯) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 103.

বন্ধুতা-সূত্রে নিবদ্ধ ছিলেন, চিরদিন যাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দেখাইয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট সেই প্রিয়বন্ধু রণজিৎ সিংহের বিধবা পত্নীকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন!! সৌহার্দ্দের কি বিড়ম্বনা!! বন্ধুতার কি শোচনীয় পরিণাম (১০)!!

কে প্রভৃতি বিজাতীয়-ইতিহাস-লেখকগণ বলিয়াছেন, মহারাণী ঝিন্দন গোপনে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি এই রূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল (১১)। সার ফেড্রিক কারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও ঝিন্দনের প্রতি এই দোষ আরোপিত হয় (১২)। কিন্তু টরেন্স প্রভৃতি অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ বলেন, যখন রেসিডেণ্টের আদেশে মহারাণীর কাগজাত ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা দুরভিসন্ধিজ্ঞাপক কিছুই পাওয়া গেল না (১৩)। এবিষয়ে সার ফেড্রিক কারিও স্বয়ং বলিয়াছেন, "যদিও ঝিন্দনের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না, তথাপি যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সম্মান ও মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এ বিষয়ে আর আমাদিগের সন্দেহ-দোলায়মান হইবার অবকাশ নাই" (১৪)। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় সার্ ফেড্রিক কারি মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া নাবালক মহারাজ দলীপ সিংহকে হাতে রাখিয়া সুবিস্তীর্ণ পঞ্জাব রাজ্য উদরসাৎ করিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ন্যায় ও সন্নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া এরূপ অত্যাচার করা পঞ্জাবের ইতিহাসে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের একটী দুরপনেয় কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে।

ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট, মহারাণী ঝিন্দনকে কেবল নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তিও ন্যূনতর করিয়া দিয়াছিলেন। বাইরাওল সন্ধির নিয়মানুসারে ঝিন্দনের বার্ষিক বৃত্তি ১,৫০,০০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছিল। সেখপুরে কারারোধের সময় উহা কমাইয়া ৪৮০০০ টাকা করা হয়। পরিশেষে বারাণসীতে নির্ব্বাসন সময়ে লেখনীর আর এক আঘাতে ৪৮ সহস্রের অঙ্ক দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত কারাবন্দিনী বলিয়া ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট ঝিন্দনের সমুদয় অলঙ্কার

(১০) Ibid. p. 106.

(১১) History of the Sepoy War, Vol I. p. 30.

(১২) Retrospects p. 104. Panjab Papers, 1849, p. 163.

(১৩) Empire in Asia, p. 343 Retrospects. p. 107—108

(১৪) Empire in Asia, p. 342.

সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেন (১৫)। এইরূপে রাজবনিতা ও রাজমাতার প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল, এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের প্রথম কারণ ইতিহাস হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করিল। রণজিৎ-রাজ্যের সকলেই মহারাণীর এই নির্ব্বাসন আপনাদিগের জাতীয় অবমাননা এবং মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহাসন-চ্যুতি ও পঞ্জাবরাজ্য-বিধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিল (১৬)। যে রণজিৎসিংহের জীবিত সময়ে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট মিত্রভাবে হৃদয়ের সারল্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, সেই রণজিৎ সিংহের অবর্ত্তমানে তদীয় পত্নী ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। অদ্য রণজিৎমহিষী ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের কারাবন্দিনী, অদ্য রণজিৎ তনয় ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়া-পুত্তুল। জগৎ এরূপ মিত্রদ্রোহিতা কখনও মার্জ্জনা করিবে না, ঐতিহাসিক-গণও ন্যায়ের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে কখনও এরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবেন না।

শিখ যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ দলীপসিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্টের অমত। সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজরার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণ-বৃদ্ধ বলিয়া শিখ-সমিতিতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র শিখসেনাপতি সেরসিংহও উদার-প্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপসিংহের সহিত এই সর্দ্দার ছত্র-সিংহের দুহিতা অথবা সেরসিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধকর্ত্তা বিবাহের দিন ঠিক করিতে লাহোর দরবারে রেসিডেণ্টের নিকট যথাবিধি আবেদন করেন। সেনাপতি সেরসিংহ মেজর এড্-ওয়ার্ডিসের সাহায্যার্থ মুলতানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ভগিনীর বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার সহিত এড্ওয়ার্ডিসের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এড্ওয়ার্ডিস্ রণদক্ষতার সহিত প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতায় অলংকৃত ছিলেন। তিনি ২৮এ জুলাই প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবেদনের সমর্থন ও সর্দ্দার সের সিংহের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া রেসিডেণ্টের নিকট এক খানি পত্র লিখেন (১৭)। পত্রে উল্লেখ থাকিল, "এক্ষণে সকলেই প্রকাশ করিতেছে, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈন্যগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দর্শাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন, এই সময়ে যদি মহা-

(১৫) Empire in Asia, p. 343 Comp : Retrospects and prospects of Indian Policy p.p. 106-107, 107, 108. Comp: Panjab Papers, 1849, p p 235, 236.

(১৬) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 109.

(১৭) Empire in Asia, p. 343—344.

রাজকে একটী মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধি রক্ষা করিতে বিট্রীষ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন আছে বলিয়া সাধারণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের মন আশ্বস্ত হইবে।" (১৮) সার ফ্রেডরিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরমার্শ করিবেন; স্বীকার করিলেন, বিট্রীষ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহ-পাত্রী এবং পরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বর্দ্ধন করিতে বিলক্ষণ সমুৎসুক আছেন (১৯)। কিন্তু তিনি মেকিয়াভেলির যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। মেকিয়াভেলির মন্ত্রশিষ্য পুনর্ব্বার অমুল্লেয় রাজনীতির চাতুরী খেলাইয়া লিখিলেন, "দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যা পক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে; এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই (২০)।" যাঁহারা সরল-প্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহাদিগের সারল্যলীলা করিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহারা আপনাদিগের ন্যায় রেসিডেণ্টের এই লিখন-ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম, যাঁহাদিগের 'মস্তিষ্কের সজীবতায় মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বিরাগী উদাসীন বেশে বনে বনে বেড়াইছেন; পক্ষান্তরে সংসার বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড চালনা করিতেছেন; "তন্তুবায় কর-সঞ্চালিত তূরীর ন্যায় একবার এক রাজ্য একের করতলস্থ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাহা অপরের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে;" তাঁহারা অনায়াসেই উক্ত লিখন-ভঙ্গীতে রেসিডেণ্টের হৃদয়ের তরঙ্গাবর্ত্ত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিবেন। বুঝিতে পারিবেন, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী সের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ হইতেও ঘনিষ্ঠ করিতে সম্মত নহেন; বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ সমাধা করিতে এখনও লাহোর দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখ-হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবি। অদ্য যাহা রণজিৎ-রাজ্য

(১৮) Ibid. p. 344

(১৯) Retrospects, p. 111. Comp: Empire in Asia, p. 366.

(২০) Retrospescts and prospects of Indian Policy p. 111—112. Panjab papers. 1849 p p 272. 273. Comp: Empire in Asia, p. 344.

বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে, কল্য তাহা ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ব্রিটীষ্ ভাব, ব্রিটীষ্ আচার ও ব্রিটীষ্ নীতিতে পরিণত হইবে।

কঠোর-প্রকৃতি রেসিডেণ্টের এই কঠোর উত্তর মুলতানে পৌঁছিল। হারবার্ট এড্ওয়ার্ডি স্ উত্তর পাইয়া সর্দ্দার সের সিংহকে জানাইলেন, সের সিংহ উহা আবার হাজরাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট লিখিলেন। সর্দ্দার ছত্র সিংহ ইহার পূর্ব্বেই মহারাণী ঝিন্দনের কারারোধ দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রেসিডেণ্টের দুর্ম্মতি বশতঃ তনয়ার বিবাহের গোলযোগ দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রেসিডেণ্ট গোপনে গোপনে যেরূপ আট ঘাট বান্ধিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই পঞ্জাব কোম্পানীর মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইবে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে স্বদেশবৎসল বৃদ্ধ শিখ সর্দ্দারের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম জন্ম ভূমিকে এই আশঙ্কিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন. প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন গুরুগোবিন্দ-সিংহের মন্ত্রপূত শেষ রক্ত-বিন্দু তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন তিনি পঞ্জাবের স্বাধীনতা বজায় রাখিবেন। এইরূপ ক্ষুব্ধ-হৃদয়, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও সর্দ্দার ছত্র সিংহ ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি সন্ধির নিয়ম যথাবৎ রক্ষা করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ব্রিটীষ্ সিংহের অব্যবস্থিততা ও অবিচারে এই প্রয়াস সফল হইল না। প্রত্যুত ছত্র সিংহ উহার চাতুরী-জালে জড়িত হইয়া ঘোরতর অপদস্থ ও অপমানিত হইলেন; এই অপদস্থতা ও অপমানই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ কারণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্দ্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কাপ্তেন আবট্ নামক জনৈক ব্রিটীষ্ সৈনিক, রেসিডেণ্টের সহকারী রূপে তথায় তাঁহার ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা দাতা হয়েন। কাপ্তেন আবট্ নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। অনুচিত বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার হৃদয় এরূপ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি এদেশীয় সকলকেই বিষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেন। বর্ত্তমান বর্ণনীয় ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে আবট্ দেওয়ান জোয়ালাসাহি নামক এক জন শিখশ্রেষ্ঠের প্রতি সন্দেহ করিয়া নিতান্ত অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাৎকালিক রেসিডেণ্ট সার হেন্‌রি লরেন্স আবটের এই কার্য্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণর জেনারেলকে লিখেন:—"কাপ্তেন আবট্ একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, কিন্তু তিনি সমুদয় বিষয়ই বিরুদ্ধভাবে দেখেন। আমি বোধ করি, তিনি না বুঝিয়া দেওয়ান জোয়ালাসাহির প্রতি অন্যায় করিয়াছেন।" এই দেওয়ান জোয়ালাসা-

হির সম্বন্ধে হেন্‌রি লরেন্‌স্‌ লিখিয়াছেন, "আমি কেবল একজন এতদ্দেশীয়কে ভাল বলিয়া জানি। শিক্ষা অভিজ্ঞতা, ও সময় অনুসারে তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন সম্মানার্হ ও সক্ষম ব্যক্তি(২১)" কেবল জোয়ালাসাহির বিষয়েই কাপ্তেন আবটের অত্যাচার তিরোহিত হয় নাই। সার ফেড্‌রিক কারির সময়ে অন্যতম শিখসেনাপতি ঝণ্ডাসিংহও আবটের বিষনয়নে পতিত হয়েন। সার ফেড্‌রিক এতন্নিবন্ধন আবটকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (আবটের) সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। যে সর্দ্দারের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে, তিনি একান্ত মনে ও সাবধানতাসহকারে আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন (২২)"। এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত পরদ্বেষী ব্যক্তি বৃটীষ্‌ রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ হঠ-প্রকৃতি অধীর-স্বভাব ব্যক্তির হস্তে গুরুতর রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত মন্ত্রণার ভার সমর্পিত হইয়াছিল!!

নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, স্বভাব সমুদয় গুণ অতিক্রম করিয়া মাথায় উঠিয়া থাকে। কাপ্তেন আবট ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ স্থল। সার হেন্‌রি লরেন্‌স্‌ ও সার ফেড্‌রিক কারির নিকট তিরস্কার পাইয়াও আবটের চরিত্রদোষ অপগত হয় নাই। মুলতান-হাঙ্গামার অব্যবহিত পরে কাপ্তেন আবটের সন্দিগ্ধহৃদয়ে আবার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি বিশ্বাস করিলেন, সর্দ্দার ছত্র সিংহ মুলরাজের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এই সন্দেহ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ছত্রসিংহকে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বাসস্থান ছত্র সিংহের আবাসবাটীর ৩৫ মাইল দূরে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদয় আলাপ বন্ধ করিয়া দিলেন (২৩)।

সর্দ্দার ছত্রসিংহ প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত সাধু-প্রকৃতি ছিলেন। সার জন লরেন্স (এক্ষণে লর্ড লরেন্‌স্‌) একদা বলিয়াছিলেন, "ছত্রসিংহ নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব প্রাচীন ভাল মানুষ (২৪)।" কিন্তু কাপ্তেন আবট্‌ যাহার প্রতি সন্দেহ করেন,

(২১) Retrospects and Prospects of Indian Policy p. 113 Comp: Empire in Asia, p. 344.

(২২) Ibid, 114. Empire in Asia, p. 345. Panjab Papers, 1849, p. 328.

(২৩) Retrospects and Prospects of Policy, p. 113. Empire in Asia, p. 345. Panjab Papers, 1849, p.p. 279, 285.

(২৪) Retrospects. p. 114. Empire in Asia p. 3.45. Panjab Papers, p. 334.

তাঁহার সচ্চরিত্রতাসম্বন্ধে সহস্র নজীর থাকিলেও তিনি তাহাতে আস্থাবান্ হয়েন না। সুতরাং ছত্রসিংহের প্রতি আবটের যে বিদ্বেষভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, লরেনস্ প্রভৃতির নজীরে তাহা বিনষ্ট হইল না।

এক দল সৈন্য মুলতান-যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছত্র সিংহের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পক্লি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তেন আবট্ অতর্কিত রূপে, শাসন কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে, হাজরার সশস্ত্র মুসলমান চাষাদিগকে দলবদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া উক্ত সৈন্যদলের গতি-রোধ করেন। ৬ই আগষ্ট এই রণ-দুর্ম্মদ মুসলমান সৈন্য ছত্র সিংহের বাসস্থান হরিপুর অবরোধ করে (২৫)। ছত্র সিংহের অধীনে কাপ্তেন কানোরা নামক একজন মার্কিনদেশী হাজরার সেনাপতি ছিল। ছত্র সিংহ আক্রমণকারিদিগকে শাসন করিতে তাহাকে আদেশ করেন। কানোরা বলিল, কাপ্তেন আবটের অনুমতি ব্যতীত সে উহাদিগের বিরুদ্ধে যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়বার আদেশ হইল, বলা হইল "কাপ্তেন আবট অবগত নহেন, কামান সকল বিদ্রোহিগণের করতলস্থ হইয়া কিরূপ অনর্থ ঘটাইবে।" এবারেও অবাধ্য সেনাপতি শাসন কর্ত্তার বাক্যে তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিল। কানোরার অসম্মতিতে দুই দল শিখ পদাতিক সর্দ্দারের আদেশ প্রতিপালনার্থ প্রেরিত হইল। কানোরা আপনার কামান সকল গোলা রাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া, হাবিলদারদিগকে উহা ছুড়িতে অনুমতি দিল। হাবিলদারগণ অসম্মত হইল। কানোরা তাহাদিগের একজনকে স্বীয় তলবারের আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া স্বয়ং গোলা-পূর্ণ কামানে আগুণ দিল, সৌভাগ্য ক্রমে কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। কানোরা পুনর্ব্বার দুই জন শিখ সৈনিকের প্রতি পিস্তল ছুড়িল। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া গুলি করিয়া কানোরাকে নিহত করিল (২৬)। অপক্ষপাতী বিচারক মাত্রেই কানোরার এই শাস্তি ন্যায়-সঙ্গত বলিবেন। কিন্তু কাপ্তেন আবট্ ইহা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় নিতান্ত নৃশংস গুপ্ত হত্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (২৭) এবং হত্যাকারী বলিয়া ছত্র-সিংহের স্কন্ধে সমুদয় দোষ চাপাইয়া রেসিডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন।

(২৫) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 115.—116. Comp : Empire in Asia, p. 345.

(২৬) Retrospects and Prospects of Indian Policy, P. 116. Empire in Asia, 345. Panjab Papers, 1847, PP. 280, 301, 303.

(২৭) Ibid, P. 116, Panjab Papers, P. 304. যে কএক ব্যক্তি রণজিৎ সিংহের দায়াদ বলিয়া পঞ্জাবের সিংহাসন প্রার্থনা করেন, পেশোরা সিংহ তাঁহা-

সার ফেডরিক কারি উপস্থিত বিষয়ে আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশিষ্ট ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে কাপ্তেন অ্যাবটের অভিযোগ অসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তিনি অ্যাবটকে স্পষ্ট লিখিলেন "উপস্থিত বিষয় আপনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্দ্দার ছত্রসিংহ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্য তাঁহার অধীনে আছে। শিখ সৈন্যদলের সমুদয় কর্ম্মচারীই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি প্রকারে কানোরার হত্যা পেশোরা সিংহের ন্যায় ঘোর নৃশংসকর গুপ্ত হত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন" (২৮)। যখন হাজরার গোলযোগের সম্বাদ মুলতানে পৌঁছিল, তখন পিতার প্রতি কাপ্তেন আবটের দুর্ব্ব্যহারের সম্বাদে "সের সিংহ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। মেজর এড্‌য়ার্ডস্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন, সের সিংহ তাঁহার পিতার পত্র দেখাইয়া এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ধীরতা সহকারে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, এবং তাহার পিতা এ বিষয়ে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন" (২৯)। রেসিডেণ্টের এই প্রাথমিক ধীরত্ব ও অপক্ষপাতিতায় বোধ হইয়াছিল, তিনি বরাবর এইরূপ ধীরতা ও অপক্ষপাতিতা বজায় রাখিয়া সর্দ্দার ছত্রসিংহকে উপস্থিত গোলযোগ হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং সর্দ্দার ছত্রসিংহ আত্মরক্ষার্থ বিদ্রোহীদিগের দমন জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া ন্যায়ের সুবর্ণ দণ্ড চালনা করিবেন। কিন্তু বিট্রীষ রাজনীতির অলৌকিক মাহাত্ম্যে ঈদৃশ কোন অব্যাহতি ছত্রসিংহকে দেওয়া হইল না ঈদৃশ কোন বিচার রেসিডেণ্ট হইতে নিষ্পন্ন হইল না। ছত্রসিংহ ধীরতার পরিবর্ত্তে অধীরতা, অপক্ষপাতিতার পরিবর্ত্তে পক্ষপাতিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিতান্ত অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া উঠিলেন।

দিগের অন্যতম। ইনি ১৮৪৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে লাহোর দরবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এতন্নিবন্ধন ছত্র সিংহের অধীনস্থ সৈন্যগণ ইহাঁকে অবরুদ্ধ করে। মহারাণী ঝিন্দনের ভ্রাতা জহোর সিংহের আদেশে ইহাঁকে কারাগারে বধ করা হয়। এই হত্যা সম্বন্ধে সর্দ্দার ছত্র সিংহ কোনরূপে দোষী নহেন। Trotter's History of India, Vol. 1, P. 42.

(২৮) Retrospects and propects of Indian policy, p. 117. Panjab Papers 1849. p. 313.

(২৯) Ibid 123—124. Panjab Papers 1849. p. 294. Empire in India p. 349.

সার ফ্রেডরিক কারির নিয়োগ অনুসারে কাপ্তেন নিকল্‌সন্‌ উপস্থিত ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন আবটের পুচ্ছধারী হইয়া ২০ এ আগষ্ট রেসিডেণ্টকে লিখিলেন, "সর্দ্দার ছত্রসিংহের ব্যবহার নিতান্ত ভয়ঙ্কর ও শঙ্কা-জনক। আমার বিবেচনায়, নিজামতি হইতে খারিজ ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করাই তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। আমি বোধ করি আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত এক মত হইবেন।"

রেসিডেণ্ট বিনা আইনে বিনা বিচারে এই কঠোর শাস্তির অনুমোদন করিয়া ২৩এ আগষ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের নিকট পত্র লিখিলেন, সুতরাং দণ্ডানুসারে ছত্রসিংহকে নিজামতি হইতে খারিজ ও তাঁহার জাইগীর বাজেয়াপ্ত করা হইল (৩০) !!

এইরূপে বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহ ব্রিটীষ্‌ রাজনীতির দুরবগাহ কৌশলে জড়িত হইয়া কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইলেন। যে দিন রেসিডেণ্ট কাপ্তেন নিকলস্‌নের প্রস্তাবিত দণ্ডের অনুমোদন করেন, সেই দিনই তিনি মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্‌কে লিখিয়াছিলেন, "সর্দ্দার ছত্রসিংহ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কেবল কাপ্তেন আবটের অবিশ্বাস ও ভয়ে কৃত হইয়াছে। অন্য কোন কারণে নহে। লেফ্‌টেনেণ্ট নিকলসন্‌ ও মেজর লরেন্‌স্‌ ও এবিষয়ে আমার সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন" (৩১)। তিনি ইহার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতিকে ও লিখেন—"লেফ্‌টেনেণ্ট নিকলসন কানোরার মৃত্যু, হত্যার মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন। তাঁহার মতে ছত্র সিংহই এই হত্যাকারিগণের অধিনায়ক। ইহাতে আমার বোধ হয়, তিনি কানোরার মৃত্যুর যথাবৎ বৃত্তান্ত অবগত নহেন" (৩২)। এতদ্ব্যতীত যে দিন রেসিডেণ্ট ছত্র সিংহের কর্ম্মচ্যুতির অনুমোদন করিয়া নিকলসনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন, তাহার পর দিন (২৪এ আগষ্ট) আবার কাপ্তেন আবট্‌কে এক খানি পত্র লিখেন। এ পত্রেও তিনি কাপ্তেন আবটের কার্য্যের অনুমোদন ও কানোরার মৃত্যু গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই (৩৩)। রেসিডেণ্ট এক দিকে সর্দ্দার ছত্রসিংহকে নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন, অপরদিকে নিকলসনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন। এরূপ চাতুরী কখন ও মার্জ্জনীয় নহে।

(৩০) Retrospects and Prospects of Indian policy p. 126. Panjab papers 1849. p. 295, 299.

(৩১) Ibid. p. 126 Ibid p. 297.

(৩২) Ibid, 126. Ibid p. 286.

(৩৩) Retrospects and Prospects of Indian policy p. 126. Panjab Papers, p. 316.

৫ই সেপ্টেম্বর রেসিডেণ্ট-প্রস্তাবিত বিষয় প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টে লিখেন—"আমি ছত্রসিংহকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে ও সম্মান রক্ষা করিয়া তদীয় কার্য্য পদ্ধতির যথাবৎ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম" (৩৪)। যাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রধান সেনাপতি ও কাপ্তেন আবট্ প্রভৃতির নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি আবার কিরূপে প্রাণদণ্ডার্হ হইলেন যে, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে উক্ত দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন? যাঁহার প্রতি হঠাৎ এরূপ গুরুতর দণ্ড প্রয়োজিত হইল, সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যের অনুসন্ধানই বা কিরূপে হইল? অধিক কি, ছত্রসিংহকে এরূপ কথাও বলা হইল না যে, যদি তিনি আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে (৩৫)। প্রস্তাবিত বিষয়ে সার ফ্রেডরিক, কারির প্রত্যেক কার্য্যই এইরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিরুদ্ধ, প্রত্যেক কার্য্যই তিনি এইরূপ চাতুরী খেলাইয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীর :—

(৩৪) Ibid p. 127. Panjab Papers 1849. 329

(৩৫) Retrospects. p. 127.

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(কপালকুণ্ডলার বিমোহিনী দেবমূর্ত্তি বঙ্কিমবাবু এরূপ কৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যদ্দ্বারা সেই রূপের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। নবকুমার একাকী সমুদ্রকূলে অন্য মনে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন এমত সময় প্রদোষ-তিমির আসিয়া সাগরের কাল জলের উপর ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারও মন সহস্র ভাবনার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পৃথিবী তমোময়, মনও তমোময়, এমত সময়ে সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অমনি সহসা তাঁহার তমসাচ্ছন্ন মনে যেন সৌদামিনীরেখা প্রভাসিত হইল। "নবকুমার, অকস্মাৎ সেই দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দ-শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক শক্তি রহিত হইল; স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।" যিনি নবকুমারের অবস্থায় সমুদ্রের

জনহীন তীরে প্রদোষ সমাগমে কখন এরূপ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সে মূর্ত্তির মোহিনী শক্তি অনুভূত করিতে পারেন না। তখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নিকট আশার প্রদীপ রূপে উদিত হইলেন। তাঁহার দেবমূর্ত্তিতে যে সৌন্দর্য্য ছিল তাহা পাঠক সহানুভূতি হেতু নবকুমারের অবস্থায় পতিত হইয়া অবলোকন করেন, সুতরাং তাঁহার দেবমূর্ত্তি দ্বিগুণ শোভায় প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু আর এক স্থলে বঙ্কিম বাবু অধিকতর কৌশলে কপালকুণ্ডলার রূপের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রথমে মতি বিবির রূপ পাঠকের নিকট বর্ণনা করিলেন; মতি বিবিকে সুন্দরী সাজাইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রভা অলঙ্কার রাশিতে বর্দ্ধিত করিলেন। যে বিমোহিনী রূপে মতিবিবি সম্রাটেরও মনোহরণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবু মতিবিবিকে একবার সেইরূপে লোকলোচনের সমক্ষে প্রদর্শন করিলেন। এই সম্রাড়ীশ্বরী সুন্দরীর রূপে পাঠকের মন মোহিত হইল। বঙ্কিম বাবু তখন সেই সুন্দরীকে কপালকুণ্ডলার নিকট লইয়া গেলেন। কপালকুণ্ডলা বন্য বেশে পান্থনিবাসের আর্দ্রমৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বন হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার রূপ স্বভাবহস্তে এখনও নবীন অথচ সরল ও অপরিষ্কৃত রহিয়াছে। সেই বন্য প্রকৃতি-সুন্দরীর নিকট পৃথিবীর অলোকসামান্যা সুন্দরী উপস্থিতা হইলেন। সম্রাড়ীশ্বরী আত্মরূপের গরিমায় পরিপূর্ণ। তিনি জানিতেন আমি অসামান্যা সুন্দরী বঙ্কিমবাবু সেই রাজ প্রাসাদের গর্ব্বিতা সুন্দরীকে আনিয়া সরলা বনবাসিনী বালিকাকে দেখাইলেন। রাজেশ্বরী বনবাসিনীকে দেখিবা মাত্র চমৎকৃতা হইলেন। কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। "ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন মতিবিবির পূর্ব্বকার হাসি হাসি ভাব দূর হইল; অনিমিক্ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন নাঃ—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।" মতিবিবি নীরবে পরাজিতা হইলেন, কপালকুণ্ডলা নীরবে অলোকসামান্যা সুন্দরীর উপর জয়ী হইলেন। রাজোদ্যানের পারিজাত সুন্দরী বনশোভিনীর নিকট পরাজিতা হইলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা সে জয় বুঝিতে পারিলেন না। মতিবিবি বুঝিলেন আর পাঠক বুঝিলেন। পাঠক নীরবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও রূপবতী। নহিলে ক্ষণেক পরে মতি কেন "আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন।" তখন নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিতেছ?' মতি কহিলেন 'দেখুন না।' মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন।

কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন 'ও কি হইতেছে?' মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

"অলঙ্কার-সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, 'আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন, এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন, কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

রমণী সহজে অন্য রমণীর রূপের প্রশংসা করে না। মতিবিবি আবার সুন্দরী—আগ্রার রাজেশ্বরী, আত্মরূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা। সেই মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সরল রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃতা হইতেছেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্ম-অলঙ্কার রাশি সেই বরাঙ্গেরই উপযুক্ত বলিয়া পরাইতেছেন। এই দৃশ্যটি কি সুন্দর, কেমন নীরব, সরস, অর্থপূর্ণ ভাবোদ্দীপক চিত্র! এই নীরব চিত্রে কপালকুণ্ডলার রূপ যেমন উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইল, সহস্র বর্ণনায় তাহা হইতে পারিত কি না সন্দেহ।) কিন্তু এই নীরব চিত্রের আর একটি গুরুতর অর্থ আছে। সে অর্থ মতিবিবির বর্ত্তমান হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রকাশিত হইবে। এই হৃদয়ভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব বঙ্কিম বাবু মতিবিবিকে উপন্যাস মধ্যে কি সাজে সাজাইয়াছেন।

লুৎফ উন্নিসা আপন বুদ্ধি ও রূপবলে একদা আগ্রার রাজেশ্বরী হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বেগমের সখী বটে, কিন্তু পরোক্ষে যুবরাজ সেলিমের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ওমরাহ এবং বাজী প্রভৃতি সম্রাটের অন্যান্য পারিপার্শ্বিকগণের ষড়যন্ত্রের তিনি মর্ম্ম ভেদ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক সেলিমের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। "সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল যে লুৎফউন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল।" তিনি অনেক সাধে সেই আশা মনে মনে পোষিত করিতেছিলেন। লুৎফউন্নিসার পরম উন্নতি—ইহাই তাঁহার বহুকালের উচ্চ অভিলাষ। তিনি একদা পৃথিবীর অতি নীচতম প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। রূপ ও গুণবলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও পদের ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সেই পৃথিবীর অতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবেন বলিয়া মনে মনে কত আশা ও কত কল্পনাই পোষণ করিয়াছিলেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইলেই তিনি সকল সাধ পূর্ণ করিবেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে আশার শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। তিনি আনন্দের জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছিলেন এমত সময়ে সহসা তাঁহার হৃদয়াকাশের এক কোণ

হইতে এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে কাদম্বিনীজালে প্রসারিত হইল। জ্যোৎস্না ডুবিল! সেলিম একদা মেহেরউন্নিসাকে দেখিলেন। সেলিমের মনে আর এক চন্দ্রের উদয় হইল। একই গগণে দুই চন্দ্রের উদয় কখনই সম্ভব নহে, লুৎফউন্নিসা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। মহতী আশার বিস্তারিত স্বপ্ন হইতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অলোকসুন্দরী কমলিনীব প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তাহা দেখিয়া যামিনী সুন্দরী কুমুদিনী কাজেই মুদিতা হইতে লাগিলেন। ভ্রমর কমলিনীর আশায় কুমুদিনীকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। যে পর্য্যন্ত আকবরসাহ বর্ত্তমান, লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন সেই পর্য্যন্ত ভ্রমর কমলিনীতে বসিতে পারিবে না। এক বাব সেলিম সিংহাসনে আরূঢ় হইলেই মেহেরউন্নিসা তাঁহারই হইবে। সম্রাটের ইচ্ছার কে প্রতিরোধ করিবে? লুৎফউন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন। আশার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে তাঁহার হৃদয় ভূপতিত হইল। হৃদয়দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেল, ভাঙ্গিয়া শতধা হইল। নৈরাশ্য শত গুণ বাড়াইবার জন্যই যেন, শতধা দর্পণ হইতে পূর্ব্বকার উচ্চাভিলাষের পুত্তলি শতরূপী হইয়া একবার দেখা দিল। লুৎফউন্নিসা আর একবার বহুকাল-পোষিত উচ্চাশাকে আণুবীক্ষণিক চক্ষে দর্শন করিলেন। নৈরাশ্য দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয়বেদনায় বৃদ্ধি করিল। ক্রমশঃ নৈরাশ্য চিত্তময় হইল। হৃদয় কালীময় হইল। আবার নৈরাশ্যের বেদনা ক্রমে কমিতে লাগিল। মানবের মন কখন চিরকাল নৈরাশ্যকে পোষণ করে না। আবার আশাদেশে চাহিতে থাকে। ঘোর নৈরাশ্য হইতেও আশা সমুদ্ভূত হয়। লুৎফউন্নিসা আবার আশাকে মনে স্থান দিলেন। তাঁহার মনে অন্য আকাঙ্ক্ষা উদিত হইল। পূর্ব্বকার পাপাচরণে ঘৃণা জন্মিল, রাজভোগে ঘৃণা জন্মিল। ভাবিলেন "যদি রাজপুরী মধ্যে সামান্য পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতি-পুষ্প-বিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।"

লুৎফউন্নিসার মনে এই প্রতিঘাত হইল। বিলাস, পাপাচরণ ও রাজভোগ হইতে তাঁহার মন একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। লুৎফউন্নিসা পঙ্কিল বিলাসিতা হইতে, গৃহস্থের বিশুদ্ধ সুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনে একটি নূতন-ভাব উদিত হইল। তিনি এই নূতন ভাবে অধিকতর সুখ জ্ঞান করিলেন। পূর্ব্বজীবনের সকল সুখ নিতান্ত অসার ও বিস্বাদ বোধ হইল। ধর্ম্মের বিমল সুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে সুখের নির্ম্মল স্রোত ধীরে ধীরে বহিতেছে। চারিদিকে

উর্ব্বর তীরভূমি হরিৎ শোভায় হাসিতেছে। স্রোতস্তীরে বৃক্ষ সকল মুঞ্জরিত ও ফলভরে অবনত হইয়া ছায়া প্রদান করিতেছে। পক্ষি সকল মধুরস্বরে গান গাহিতেছে। আহা কি সুরম্য দেশ! কি মধুময় নিকেতন! তিনি এতকাল কোথায় কণ্টকীবনে এবং উত্তপ্ত মরুভূমে ভ্রমণ করিয়াছেন! এই সুখময় দেশ দেখিয়াও দেখেন নাই! আর তিনি সে দেশে যাইবেন না! তিনি এই নূতন সুখময় দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন!

লুৎফউন্নিসার মনে এই প্রতিঘাত হইল। তিনি গৃহস্থের স্থির সুখের প্রত্যাশিনী হইলেন। এইরূপ প্রতিঘাত স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষার অত্যুচ্চ শিখর হইতে পতিত হইলে প্রবৃত্তির স্বাভাবিকই এইরূপ প্রতিঘাত জন্মে। এই প্রকার প্রতিঘাত বশতঃ অনেকে সংসারে বিরাগী হইয়া একেবারে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের লুৎফউন্নিসা কখন সংসারিণী হন নাই। তিনি চিরকাল দুশ্চারিণী হইয়াছিলেন। এই জন্য পাপাচারে ঘৃণা জন্মিয়া একবার সংসারিণী হইতে তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইল।

এই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি উপায় দেখিতে লাগিলেন। কৌশলময়ী লুৎফউন্নিসা কখন উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থা নহেন। তিনি একটি কল্পনা স্থির করিলেন। বেগমকে কল্পনায় প্রবৃত্ত করিলেন। প্রবৃত্ত করাইয়া দেখুন কৌশলপূর্ব্বক কেমন প্ররোচন বাক্যে আপনারই কথা বেগমের মুখ দিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইতেছেন!

লু।—"আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

"বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন 'তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চহাজারি মন্সবদার হইবেন।"

"লুৎফউন্নিসা সন্তুষ্টা হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল" এই উদ্দেশ্য সাধনজন্য তিনি যে উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরউন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহারও প্রতিশোধ সাধিত হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে নবকুমারের সহিত ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নবকুমারের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন নবকুমার তাঁহার স্বামী। জানিলেন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নববিবাহিতা পত্নী। জানিলেন নবকুমার এত কালের পর আবার পাণিগ্রহণ করিলেন।

সহসা তিনি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার হৃদয় মন তখন অন্য ভাবে বিচলিত ছিল। একটি

প্রকাণ্ড ব্যাপারের ঘোর ঘটনাজাল ও পরিণাম তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি তাহারই জন্য বিব্রত হইয়া আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে অনতিকাল পূর্ব্বের দুর্ঘটনাও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনাকেও সেই বৃহৎ কাণ্ডের আনুষঙ্গিক ঘটনা বলিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহা বহন করিয়া যাইতেছিলেন। এমত সময় অকস্মাৎ তাঁহার স্বামীকে ও কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হৃদয়কে অধিক বিচলিত করিতে পারিল না। লুৎফউন্নিসা কি করিলেন? কেবল কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে চাহিলেন। স্বাভাবিক কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, তিনি আত্মস্থানীয় নবকুমার-পত্নীকে কেবল দেখিতে চাহিলেন। সুন্দরীকে দেখিব—সে কেবল ব্যপদেশ মাত্র। সেই ব্যপদেশে তিনি স্বীয় সপত্নীকে দেখিতে চাহিলেন। গিয়া কপালকুণ্ডলার রূপ দেখিয়া একেবারে চমৎকৃতা হইলেন। তখন তাঁহার মনে সপত্নীর ভাব কিছুই উদয় হয় নাই। তিনি নবকুমারকে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে সময় পান নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, ইহাঁরা সকলেই পর হইয়া গিয়াছেন। (তিনি যবনী হইয়া ওমরাহগণের বিলাসিনী হইয়াছেন, নবকুমারের সহিত তাঁহার দূরতা বিলক্ষণ অনুভব হইতেছিল। তিনি নবকুমারকে গ্রহণ করিতে যাইবেন—সে ভাব এখনও মনে উদয় হয় নাই। সুতরাং তিনি কপালকুণ্ডলাকে সপত্নী বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং কপালকুণ্ডলার সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সে ব্যবহারে যে কবিত্ব আছে তাহা কেবল স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিরই উপলব্ধি হইবে।)

(বঙ্কিম বাবু অপেক্ষা ন্যূনতর স্বভাবজ্ঞ কবির হস্তে, লুৎফউন্নিসা এই স্থানে হয় ত অন্যবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু জানিতেন লুৎফউন্নিসার হৃদয় উচ্চাশয়ে ক্রমশঃ এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে কোন ক্ষুদ্র পদার্থ সে হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক করিতে পারে না। ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিলে সে হৃদয়ে বরং অনুকম্পার সঞ্চার হইতে পারে। ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা তাহা কখন অধিকৃত হইতে পারে না। লুৎফউন্নিসার হৃদয় এখন এই রূপ ছিল। সুতরাং নবকুমারের ব্রাহ্মণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি তজ্জন্য অবিচলিত চিত্তে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে যাইলেন। ক্ষণিক দেখিয়া মন কিছু বিচলিত হইল। দেখিলেন কপালকুণ্ডলা সুন্দরী—নবকুমার যেরূপ পত্নী হারাইয়াছেন, তদপেক্ষাও বরাঙ্গিণীকে লাভ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে মনে একবার কথঞ্চিৎ

আত্মীয়তা ও অঙ্গাঙ্গী ভাবের সঞ্চার হইল। কপালকুণ্ডলাকে সপত্নীভাবে না দেখিয়া ভগিনী ভাবে দেখিলেন। সপত্নী ভাবে দেখিবেন,—ততদূর সাহসিনী হন নাই, ততদূর আত্মীয়তাভাব এখনও মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে,—কেউ যেন আপনার আপনার—এই পর্য্যন্তই অস্পষ্ট জ্ঞান হইতেছিল। এই জ্ঞানে ভগিনীর সুন্দর অঙ্গে, অনায়াসলব্ধ অলঙ্কার রাশি পরাইতে তাঁহার মনে মনে বড় সাধ হইল। পরাইয়া সে সাধ মিটাইলেন। হৃদয়ের আত্মীয়তা ভাবের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। কারণ লুৎফউন্নিসা কখন হৃদয়ভাব দমন করিতে শিখেন নাই। নবকুমারের কাছে থাকিলে তিনি নিজে যে সাজে সাজিতেন, কপালকুণ্ডলাকে একবার সেই সাজে সাজাইয়া দেখিলেন। নবকুমারের কাছে ব্রাহ্মণী হইয়া থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাশা যে বহুমূল্য অলঙ্কারদামে শোভিতা হইয়া থাকিত, কপালকুণ্ডলাকে একবার সেই অলঙ্কারে শোভিতা করিয়া কল্পনায় তৎস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন আমিও এইরূপ সাজিতাম। অপর্য্যাপ্ত অলঙ্কার আছে বলিয়া আপনার ভগিনীর অঙ্গ হইতে সে অলঙ্কার রাশি মোচন করিতে আর ইচ্ছা হইল না। প্রকাশ্যে নবকুমারকে কহিলেন, "এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম।" নবকুমার তাহাই বুঝিলেন।

লুৎফউন্নিসা একেবারে সকল আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বহুকাল ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষিত থাকে তাহা শীঘ্র হৃদয়মন্দির পরিত্যাগ করিতে চাহে না। থাকিয়া থাকিয়া আবার সেই আশা মনে উদিত হয়, উদিত হইয়া আবার মনকে উত্তেজিত করিতে থাকে। লুৎফউন্নিসা ভাবিয়াছিলেন যদি জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে না পান, তবে আমাকেই গ্রহণ করিবেন। জাহাঙ্গীর তখন মেহেরউন্নিসাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু মেহেরউন্নিসার মন কি জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রলুব্ধ আছে? তিনি মেহের-উন্নিসার প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন; জানিতেন যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগিনী না থাকেন তবে জাহাঙ্গীর কিছুতেই মেহের উন্নিসাকে লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব একবার মেহের-উন্নিসার মন পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি বর্দ্ধমানাভিমুখে মেহের-উন্নিসার নিকট যাইতেছিলেন। নবকুমারের সহিত পরিচয়ের পর তিনি আবার সেই বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ কিছু শিথিল হইতেছিল। আর একটি প্রিয়তর ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। প্রণয়ভাজনের সহিত তাঁহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তখনকার প্রণয়সঞ্চারের বিষয় বিশেষ জানিতে পারেন নাই, কিন্তু তখনই বীজ রোপিত হইয়া রহিল। অসাক্ষাতে নব-

কুমারের মুখমণ্ডল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। "স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল।" তিনি পথিমধ্যে নির্জ্জনে সন্ধ্যার সময় চটীতে বসিয়া আছেন আর নবকুমারকে ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে সহসা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

("পেষমন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে? সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

সমগ্র ওমরাহমণ্ডলী মধ্যে যাঁহার কাহাকেও সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরে নাই, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার আজি সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরিয়াছিল। প্রণয় ও আত্মীয়তা এইরূপ প্রণয়-ভাজন ও স্বজনের মুখচ্ছবিকে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখায়। লুৎফউন্নিসা নবকুমারকে সুন্দর দেখিলেন। হৃদয়ভঙ্গ-জনিত নৈরাশ্যের পর প্রেমের প্রতিঘাত জন্মিল। কিন্তু এখনও এ প্রতিঘাত অতি মৃদু ও দুর্ব্বল। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে এতকালের পর প্রেম প্রবেশ করিবার উপক্রম হইতেছে। তিনি যে পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন কোন ভদ্র ব্যক্তির সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়, এক্ষণে সেই ভদ্র ব্যক্তিকে স্থির করিলেন। ভাবিলেন যদি আমার স্বামীই সেই ব্যক্তি হন তবে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বটে। কিন্তু সে পথে অনেক অন্তরায় আছে, এখন স্বামীকে লাভ করা বড় সুসাধ্য নহে।) একবার বর্দ্ধমান দেখিয়া আসা উচিত, পরে নবকুমারের কথা। এই জন্য তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন। যাইয়া মেহেরউন্নিসার হৃদয়কবাট কৌশল পূর্ব্বক উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন তথায় জাহাঙ্গীরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। মেহেরউন্নিসা কহিল:—জাহাঙ্গীর সিংহাসনে—আমি কোথায়? লুৎফ-উন্নিসা মনে মনে উত্তর করিলেন, তুমিও সিংহাসনে যাইবে। লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন, যতদিনে হউক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইবে। যতদিনে হউক হীরক, গলকন্দার তিমিরময় খনি হইতে উন্মুক্ত হইয়া রাজমুকুটের শিরোভূষণ হইবে। যতদিনে হউক মেহেরউন্নিসার উজ্জ্বল রূপ দিল্লীর সিংহাসনে প্রভাসিত হইবে। আর কেন সে সিংহাসনের জন্য আশা? লুৎফউন্নিসার হৃদয় কথঞ্চিৎ উঠিয়াছিল, এক্ষণে প্রবল বেগে আর একবার নিপতিত হইল। তিনি এই বারে মনে মনে সকল আশা বিসর্জ্জন দিলেন। "কিন্তু তাহাতে কি মতিবিবি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্ত-প্রসাদ জন্মিল তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।")

(বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে নবকুমারের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি সিংহাসন লইয়া কি করিবেন? "দিল্লীর সিংহাসন-

লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল।' তিনি নবকুমারের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। "দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল।" তিনি রাজা, রাজধানী, রাজ-সিংহাসন সকলই বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। রাজসিংহাসন অপেক্ষাও হৃদয়ের প্রেম প্রতিমাকে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে হৃদয় পূর্ব্বে পাষাণবৎ ছিল, যে হৃদয় সেলিমের "রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন মুগ্ধ" করিতে পারে নাই, এখন সেই পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। কীট প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নবকুমারের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিল। লুৎফউন্নিসা সেই প্রতিমূর্ত্তির চরণতলে রাজসিংহাসন বিক্ষেপ করিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আগ্রায় উপনীত হইয়া লুৎফউন্নিসা দেখিলেন এখন আর সে আগ্রা নাই। সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। সকলই পরিবর্ত্তন, সকলই বিরূপ। এখন রাজপ্রসাদে ক্ষণিক অবস্থান করিতেও তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ত্বরায় জাহাঙ্গীরের নিকট বিদায় লইলেন। জাহাঙ্গীর ও কণ্টক কাটিলেন। তখন লুৎফউন্নিসা, যেখানে হৃদয় গিয়াছে, সেই থানে যাইতে লাগিলেন। লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে এখন ঘোর প্রতিঘাত জন্মিয়াছে—প্রেমের দিকে। নৈরাশ্যের পর প্রেম প্রতিঘাত জন্মিলে হৃদয়ের ভাব কিরূপ হয়, লুৎফউন্নিসায় বঙ্কিম বাবু তাহারই চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন। এই প্রেম-প্রতিঘাত যিনি বুঝিতে পারিবেন তিনিই লুৎফউন্নিসার হৃদয় কবাটের চাবি পাইয়াছেন। আমরা এত বড় হৃদয়-প্রতিঘাতের চিত্র কুত্রাপি দেখি নাই। এই হৃদয় প্রতিঘাত জন্য লুৎফউন্নিসাকে এত পবিত্র জ্ঞান হয়। হৃদয়প্রতিঘাত বারবিলাসিনীকেও পবিত্র করে; কারণ ইহা মানব-প্রকৃতির গৌরব। ইহাতে মানব প্রকৃতিকে দেব তুল্য করিয়া তুলে। মানবপ্রকৃতি ইহাতে পবিত্র হয়। ত্রিবেণীর জল ইহারই জন্য পবিত্র হইয়াছে। গঙ্গা ভগীরথের সহিত সাগরাভিমুখে যাইতে যাইতে একবার ত্রিশূলীকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ হইবামাত্র একবার হিমালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। শুদ্ধ ফিরিয়া চাহিলেন না দুই পদ অগ্রসরও হইলেন। ত্রিবেণী পবিত্র হইয়া গেল। গঙ্গার হৃদয় স্রোত প্রতিঘাত পাইয়া ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল। সেই ত্রিধারাধারিণী ত্রিবেণী তীর্থস্থান হইলেন। এই থানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল। যাহাতে ত্রিবেণী পবিত্র হইয়াছে, তাহা লুৎফউন্নিসাকেও পবিত্র করিয়াছে। পবিত্র হইয়া পাপময় সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে কুটীরে যাইতেছেন। সম্রাটের প্রতি পাদবিক্ষেপ করিয়া তিনি একজন সামান্য ব্যক্তির পদরেণুর প্রত্যাশিনী হইয়াছেন। পৃথিবীর প্রলোভন

পূর্ণ রত্ন ভূষিত পাপময় বিলাসধামকে হেয় জ্ঞান করিয়া তিনি এক্ষণে সংসারীর নির্ম্মল সুখ-পূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। তিনি এখন হিন্দু পতি-পরায়ণা পদ্মাবতী হইয়াছেন। হিন্দু রমণীর পতিপরায়ণতা তাঁহার মনে জাগরিত হইয়াছে। এখন নবকুমারকে তিনি আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। সেই আপনার স্বামীর জন্য তাঁহার হৃদয় প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাবিতেছেন পৃথিবীর সকলই পর; একবার আপনার স্বামীর নিকটে গিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইবেন। (আপনার স্বামী পরভোগ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাহা এখন তাঁহার অসহ্য বোধ হইতেছে। যে প্রকারে হউক আপনার ধনকে আপনার করিয়া লইবেন এই আশয়ে লুৎফ-উন্নিসা এখন প্রবল হৃদয়বেগে নবকুমারের পানে ধাবিতা হইতেছেন। তিনি বিলাসিনীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, বড় সাধ, একবার সাংসারিক সুখে সুখিনী হইবেন) (কপালকুণ্ডলাও সংসারে নূতন প্রবেশ করিতেছেন। একজন বনবাস হইতে সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য জন সংসারের বহির্দ্দেশে বহুকাল উদ্ভ্রান্ত হইয়া এক্ষণে তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছেন। দুই জনেই জানেন না সংসারে কি সুখ। বনবাসিনী সে সুখের কখন আস্বাদ পান নাই, বারবিলাসিনীও সাংসারিক সুখে কখন সুখিনী হন নাই। এইখানেই দুই জনে সমান, কিন্তু আর কিছুতেই সমান নহেন। তাঁহাদিগের এ সাদৃশ্য কেবল প্রতারণা মাত্র। কপালকুণ্ডলা ঠিক সংসারে প্রবেশ করিতেছেন না, সংসার নিজে তাঁহার নিকট উপস্থিত, সংসারে তাঁহাকে পবিত্রা জ্ঞানে সংসারিণী করিতে চাহেন। লুৎফ-উন্নিসার ভাব সেরূপ নহে। লুৎফ উন্নিসা যেন কোন মরুদেশ হইতে মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণাতুরা হইয়া কুরঙ্গিনীর ন্যায় সংসারের দিকে ধাবিতা হইতেছেন। তিনি সংসারকে চাহেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে চাহেন না। তিনি নিজ ইচ্ছায় সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, কপালকুণ্ডলা ঘটনাক্রমে সংসারে প্রবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। সংসার কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চিরবনবাসিনী কখন সংসারপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবার নহে। তিনি ত্বরায় সে পিঞ্জর ভঙ্গ করিলেন। লুৎফউন্নিসা পতিপ্রেমে দৃঢ়-অনুরাগিণী ও পবিত্রা হইয়া সংসার প্রবেশ করিলেন, সংসার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন না, কারণ সংসার এখনও তত পরিশুদ্ধ ও উন্নত হন নাই।) এই খানে আমরা একদা সংসারের নীচতা এবং লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের উচ্চতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ করি। লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র হৃদয়-ভাব ও প্রগাঢ় অনুরাগকে অশ্রদ্ধা করিতে আমাদিগের অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না। তন্মধ্যে মানব-প্রকৃতির যে উচ্চতা ও গৌরব উপলব্ধ হয় তাহা সংসারে বড় দুর্ল্লভ। সেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগিণী রমণী-মণ্ডলীর রত্ন-স্বরূপ। বিশে-

যতঃ যে রমণী পাপপথ হইতে ঘৃণায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এইরূপ পরিশুদ্ধ প্রেমপথে পদার্পণ করিতেছেন—এই রূপ দৃঢ় অনুরাগের সহিত একান্ত মনে পতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেছেন, সে রমণীতে যে স্বেচ্ছাকৃত দৃঢ় পতিপরায়ণতা ও পবিত্রতা আছে, তাহা সংসারের জড়ভাবাপন্ন পতিব্রততা ও সঙ্কীর্ণ পবিত্রতা হইতে নিশ্চয় গরীয়ান্। সংসারের অন্যূন এতদূর উন্নত হওয়া চাই, যেন সে প্রকার পবিত্রতার গৌরব বুঝিতে পারেন। লুৎফ-উন্নিসাকে যখন সংসার গ্রহণ করিলেন না, তখন আমরা লুৎফ উন্নিসার জন্য নিতান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া ক্রন্দন করিলাম; সংসারকে ধিক্কার দিলাম। সংসার লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন না। শুদ্ধ লুৎফ-উন্নিসার জন্য ক্রন্দন করিলাম না—একবার সমগ্র রমণী জাতির দুরবস্থা ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। ভাবিলাম লুৎফ উন্নিসা যদি পুরুষজাতীয় হইতেন আজি সংসার কি তাঁহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতেন? লুৎফ-উন্নিসার সমবস্থ রমণীরত্নকে পরিত্যাগ করিতে কেমন হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই দেখাইবার জন্যই যেন কবি, লুৎফ উন্নিসাকে প্রেমের পূত বারিতে পবিত্র করিয়া সংসারের নিকট আনিয়া দিলেন, আনিয়া দিয়া যেন কহিলেন দেখ সংসার! তুমি এত নীচ হইও না, যে আমার অনুতাপিনী লুৎফ-উন্নিসাকে পরিত্যাগ কর। নীচ সংসার তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাগ করাতে কি হইল?—লুৎফউন্নিসারই গৌরব-বৃদ্ধি হইল। যিনি একান্ত মনে সংসারের শরণাপন্ন হইলেন, সেই সংসারের এমন সহৃদয়তা নাই, যে শরণাপন্নকে গ্রহণ করিয়া লন। সেই নীচ সংসার মানবের ন্যায় পাপ-পুণ্যময় প্রাণীর বাসযোগ্য নয়। অথবা রমণীজাতি কোন উচ্চতর সংসারের উপযোগিনী। লুৎফউন্নিসার দৃষ্টান্তে আমরা কি শিক্ষা পাই? আমরা শিক্ষা পাই, সংসারের পবিত্রতাভাব, মানবপ্রকৃতির পবিত্রতার অনুসারী হওয়া চাই। সংসারের পবিত্রতাভাব যেন অস্বাভাবিক না হয়। সে পবিত্রতা অস্বাভাবিক হইলে অনেক লুৎফউন্নিসার স্বাভাবিক ভাব বিধ্বংশ হইবে। অনেক অনুপাতিনী, অস্বাভাবিক পাপপথে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিতা হইবেন। তাঁহাদিগের আর উদ্ধারের পথ নাই। পৃথিবীতে পাপিনীর পুণ্যবতী হইবার উপায় নাই। অতএব সংসারের ধর্ম্ম-নিয়ম অস্বাভাবিক। তাহা মানবের স্বভাব অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা ধর্ম্ম নিয়ম নহে। যে ধর্ম্ম নিয়ম পাপীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, তাহা মানব সমাজে ধর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া প্রচলিত থাকা নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্ম-নিয়ম যদি মানব-প্রকৃতির গৌরবের অনুসারী না হয়, সে ধর্ম্ম নিয়ম পরিত্যজ্য। সে ধর্ম্ম-নিয়ম পরিত্যজ্য, তথাপি

লুৎফউন্নিসা পরিত্যজ্যা নহে। নবকুমার যখন লুৎফউন্নিসাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন লুৎফউন্নিসা যেন এই সমস্ত উদ্বোধন বাক্যে সংসারকে উপদেশ দিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীপূ——

ভারতের ভাবী পরিণাম।

হতভাগ্য ভারতবাসীর অদৃষ্টে এ দুঃখ কতকাল থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? আজ প্রায় সহস্র বর্ষ হইতে চলিল দিল্লী-সমরে পৃথুরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর সহিত ভারতের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে! মহম্মদ ঘোরী হইতে লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত অসংখ্য আক্রান্তা যে ভারত-ক্ষেত্রে আপনাদিগের রণনৈপুন্য ও বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন—বীরত্ব ও ধূর্ত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিয়াছেন;—সে ভারত যে এখনও জীবিত আছে, সে ভারতের অধিবাসীবা যে এখনও আত্মস্বত্ব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ব্রিটিশ জাতির সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য! যে ভাবতবর্ষীয় আর্য্যেরা একদিন বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন; যাঁহাদিগের দর্শন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞান, যাঁহাদিগের সাহিত্য—এখনও জগতের বিস্ময়োদ্দীপক রহিয়াছে;—সেই আর্য্যজাতিব সন্ততিগণ এক্ষণে ব্রিটিশসিংহের প্রতাপে কম্পিত-কলেবর! তাঁহাদিগের তেজ, বীরত্ব, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলি একে একে সমস্তই অস্তমিত হইতেছে। জগল্ললামভূতা যে আর্য্যললনা একদিন অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই আর্য্যললনা এক্ষণে পুত্রকন্যাদিগেরও শৌর্য্য বীর্য্যের প্রকাশের প্রতিকূল। অস্ত্রধারণ, যুদ্ধে গমন ও অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতরণ এক্ষণে তাঁহাদিগের গভীর ভীতির কারণ। পুত্র কন্যাগণ কোনও দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হন ইহা তাঁহাদিগের একান্ত অনিচ্ছা। যাহা অল্পায়াসসাধ্য, যাহা বিপদ্‌সঙ্কুল নহে, এরূপ নিরীহ কার্য্যে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ফলেও পরিণত হইয়াছে। নিরন্তর মসীমর্দ্দনে, গ্রন্থভারবহনে, জিহ্বাসঞ্চালনে, ও শ্বেতাঙ্গ-চর্ম্ম-পাদুকা-প্রহার সহনে ভারত-সন্ততিগণের এক্ষণে সুখে দিনাতিপাত হইতেছে। অভ্যাস ক্রমে প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে আর্য্যজাতি এক সময়ে পরের ভ্রূকুটী মাত্রও সহিতে পারিতেন না, এক্ষণে পরের চরণরেণু সেই আর্য্যজাতিব শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। দাসত্ব, অপমান এক্ষণে তাঁহাদিগের

অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে যে প্রবলপরাক্রম মুষলমাণেরা একসময় হস্তিনাপতি পৃথু-রাজের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া গভীর নিনাদে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, বীরদর্পে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতকে কম্পমান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন,—মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় সেই মুষলমাণেরা একে একে দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া বিজিত আর্য্যদিগের সহিত সমদশাপন্ন হইলেন। ব্রিটিশ সিংহের প্রবলপ্রতাপে জেতা ও বিজিত এক সমান হইয়া গেল। বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে যেমন গোব্যাঘ্র ও ভেকসর্পে একত্র বাস করে, সেইরূপ জেতা বিজিত এক্ষণে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে রাজনৈতিক সম্বন্ধে হিন্দু ও মুষলমাণ এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ।

ভারতবাসীগণ মুষলমাণদিগের অধীনে নানা কষ্ট, নানা যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা সে সমস্ত কষ্ট, সমস্ত যন্ত্রণা এই বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ধন দেশের বাহিরে যাইতেছে না। তাঁহাদিগের মনে এই সান্ত্বনা ছিল, যে সিংহাসন ব্যতীত ভারতের আর সমস্ত পদই তাঁহাদিগের অধিগম্য। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদিগের বীরবল, তাঁহাদিগের তোদরমল্ল, তাঁহাদিগের মানসিংহ—দিল্লীশ্বরের সখিত্ব, মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব পদ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। রাজ-সিংহাসনের নিম্নে ঐ গুলিই সর্ব্বোচ্চ পদ। তাঁহারা জানিতেন উপযুক্ত হইলে তাঁহারা যখন সেই সর্ব্বোচ্চ পদেও অধিরোহণ করিতে সক্ষম, তখন অন্যান্য পদ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের করতলস্থ। তাঁহারা জানিতেন যে মুষলমাণেরা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, যতই কেন প্রজাশোষক হউন না, তাঁহারা এক্ষণে ভারতের অধিবাসী, সহবসতিতে ভারতবাসী আর্য্যদিগের ভ্রাতা; তাঁহাদিগের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে—তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে গঠিত হইবে—তাঁহাদিগের অতুল সম্পত্তি ভারতক্ষেত্রেই ব্যয়িত হইবে। এই আশা—এই সান্ত্বনা—ভারতবাসী আর্য্যদিগের নয়নজল মুছাইয়া দেয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ অপনীত করে, এবং অধীনতাশৃঙ্খল কিঞ্চিৎ মসৃণিত করে। তাঁহারা জানিতেন যে ভারতকে দরিদ্র করা, ভারতের অধিবাসীদিগকে হীনাবস্থায় রাখা, মুষলমাণদিগের স্বার্থবিরোধী। তাঁহারা জানিতেন যে মুষলমাণদিগের ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ ছিল না, যে দেশকে অলঙ্কৃত করা, যে দেশকে অর্থভারে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন করা, মুষলমাণদিগের প্রাণপণ চেষ্টার বিষয়ীভূত হইতে পারে। মুষলমাণেরা ভারতের ধনে ধনী—ভারতের মানে মানী—ভারতের সুখে সুখী। সুতরাং যে ভারতের ধনে তাঁহারা ধনী, যে ভারতের মানে তাঁহারা মানী,

এবং যে ভারতের সুখে তাঁহারা সুখী, সে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত অপমানিত ও অসুস্থিত করায় মুষলমানদিগের কোন প্রলোভন হইতে পারে না—এই জ্ঞান তদানীন্তন ভারতবাসীদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্য ভারতবাসী মুষলমানেরা ভারতের অধিবাসীদিগের ততদূর বিদ্বেষের ভাজন হন নাই। তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের শাসন প্রণালী, তাঁহাদিগের বিধি, তাঁহাদিগের ব্যবহারবিজ্ঞান দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের সর্ব্বদোষনাশী এক গুণ ছিল—তাঁহারা ভারতবাসী ছিলেন! তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব এই দেশেই ছিল; তাঁহাদিগের লুণ্ঠন সংগৃহীত ধন এই দেশেই ব্যয়িত হইত। তাঁহারাও প্রজাশোণিত শোষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই শোণিতে ভারতক্ষেত্রকেই উর্ব্বরা করিতেন; এই জন্য প্রজারা বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতেও ততদূর কাতর হইত না।

কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজজাতির অধীনে আমাদিগের কি সান্ত্বনা, কি প্রবোধ? সত্য, তাঁহাদিগের লৌহবর্ত্ম শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে ক্রমে পরস্পর-সন্নিকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের তড়িৎবার্ত্তাবহ সংবাদদানে দূর-বিক্ষিপ্ত বন্ধু বান্ধবদিগের বিচ্ছেদ দুঃখ কথঞ্চিৎ অপনীত করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের বাষ্পীয়পোত দেশ দেশান্তরের ও দ্বীপ দ্বীপান্তরের অধিবাসীদিগের সহিত ভারতের অধিবাসীদিগের সখ্যভাব সংস্থাপিত করিতেছে, নানা স্থানের নানা দ্রব্য আনিয়া ভারতের ভোগ-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; সত্য—তাঁহাদিগের সাহিত্য, তাঁহাদিগের দর্শন, তাঁহাদিগের বিজ্ঞান, তাঁহাদিগের ইতিহাস, তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের সমাজনীতি আমাদিগকে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের প্রচণ্ড গোলক ভারতকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের কঠিন দণ্ডনীতি তস্করতা প্রভৃতিকে প্রায় শ্রুতিমাত্র-পর্য্যবসায়িনী করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালী ভারতে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের শিল্প ভারতের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু সে সহস্র গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে—ইংরাজেরা বিদেশী! বিদেশী বিজেতার প্রতি বিদেশী বিজিতের কখনই সহানুভূতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন, জাতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, অশন বসন ভিন্ন, রীতি নীতি ভিন্ন, বল বুদ্ধি ভিন্ন—এরূপ জাতির সহিত ভারতবাসীর সহানুভূতি কত-দূর সম্ভব জানি না। এরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতিক জাতিদ্বয়কে পরস্পর সখ্যসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না।

শ্বেতদ্বীপের প্রতিপরিবার ভারত দ্বারা কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইতেছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের

প্রত্যেক নগর হইতে প্রতিমাসে অসংখ্য মুদ্রা শ্বেতদ্বীপে প্রেরিত হইতেছে! ভারতের সমস্ত উচ্চ পদই প্রায় শ্বেতপুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে! ভারতের সবিশেষ লাভকর বহির্বাণিজ্য প্রায়ই শ্বেত পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে! ক্ষুদ্র সূচিকা ও সামান্য দেসলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমাদিগের সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্য আমাদিগকে শ্বেতপুরুষদিগের শ্বেত চরণে প্রতিদিন কোটী কোটী মুদ্রা অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে! কত কোটী টাকা ভারত হইতে প্রতিমাসে শ্বেতদ্বীপে যাইতেছে তাহার সংখ্যা করিতে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভারতের ভাবী পরিণাম কি হইবে ভাবিতে গেলে আমাদিগের বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয়া যায়! ভারত দিন দিন কঙ্কালাবশিষ্ট হইতেছে! ভারতের শিল্পীরা অন্নাভাবে তনুত্যাগ করিতেছে! ভারতের কৃষকেরা আপনাদিগের পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হইতেছে! ভারতের মধ্যশ্রেণীর লোকেরা দারিদ্র্যভরে ক্রমে রসাতলে যাইতেছে! ভারতের উচ্চশ্রেণী ইংরাজ-তুষ্টিবিধানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে কৌপীনধারী হইতেছে! বোধ হইতেছে যেন ভারতে প্রলয়কাল উপস্থিত! বোধ হইতেছে যেন বিধাতা ভারতের ধ্বংশবিধানের নিমিত্ত শ্বেতপুরুষদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন! যে জাতি দ্বারা ভারতের এতাদৃশী দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সে জাতির সহিত ভারতের সখ্যভাব প্রার্থনীয় হইলেও কখন বদ্ধমূল হইবে কি না জানি না!

মুষলমাণদিগের সময়ে ভারত অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক জমিদার এক এক স্বাধীন রাজা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগকে বৎসরে বৎসরে মুষলমাণ রাজাদিগকে কিছু কিছু কর দিতে হইত বটে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগের নিজের সৈন্য ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিচারালয় ছিল, তাঁহাদিগের নিজের দণ্ডবিধি ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিধি ব্যবস্থাপনের শক্তি ছিল, প্রজাদিগের দেহ প্রাণের উপর তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। প্রজারা স্বজাতীয় রাজার অধীনে সহস্র গুণে অধিকতর সুখী ছিল। এক্ষণে ব্রিটনের প্রচণ্ড শাসনে রাজা প্রজা সকলই থরহরি কম্পমান। স্বাধীনতার ভাব সকলেরই অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ব্রিটনের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই! বোধ হয় যেন ভীষণ ব্রিটিশ কামান আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে! বোধ হয় যেন শাণিত ব্রিটিশ বেয়নেট আমাদিগের প্রতি ভ্রূকুটী করিতেছে! বোধ হয় যেন আমরা চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি! যেন শ্বেতপুরুষেরা আমাদিগের সেই প্রকাণ্ড কারার প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন! আমরা তাঁহাদিগের সেই ভীষণ মূর্ত্তিই সতত দেখিতে পাই।

তাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণ গুলি আছে কি না তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ উপায় নাই। এরূপ জাতির সহিত ভারতের সখ্যভাব সংস্থাপনের চেষ্টায় কিছু ফলোদয় হইবে কি না বলিতে পারি না।

ব্রিটিশ দণ্ডবিধির ন্যায়পরতা, ব্রিটিশ বিধিসকলের লক্ষ্যের উদারতার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি। আমরা জানি ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা বিজিত শূদ্রদিগের প্রতি এবং ভারতবর্ষীয় মুষলমানেরা বিজিত হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অপক্ষপাতিতা ও এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেই নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ভারতের ভবিষ্য পুরুষের নিকট ব্রিটনের গৌরব পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু যে প্রণালীতে ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাগণ সেই দণ্ডবিধির পরিচালন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নরাকার রাক্ষস বলিয়া বোধ হয়, নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র ভল্লূকের সমশ্রেণীক বলিয়া প্রতীতি হয়। চট্টগ্রামের কার্‌ড্‌. এলাহাবাদের লীড্‌স, মালদহের মোস্‌লী, রাজসাহীর ডয়লী ও ক্লেপ্রভৃতি তাহাদিগের আদর্শ। এই নরমাংসলোলুপ রাক্ষসেরা দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগকে মানবকুলের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পাষণ্ডেরাই ইংলণ্ডের বিপুল যশে কলঙ্কারোপ করিতেছে। আমাদিগের দেহ প্রাণ, ধন মান এই কুলাঙ্গারদিগেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে। ইহারাই আমাদিগের প্রকৃত রাজা—প্রজাবন্ধু ভক্তিভাজন মহারাণী সাক্ষী-গোপাল মাত্র। ইহাদিগেরই দোষে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি অচলা; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ডের বিশ্বপ্রেমিক মনীষিগণের সহিতও আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আমরা মিল্‌, ফসেট্‌, ব্রাইট্‌ প্রভৃতিকে দেখিতে পাইনা; তাঁহাদিগের মানবপ্রেম, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ, তাঁহাদের ভারত-হিতৈষিতা আমরা সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করি মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? প্রতিদিন অসংখ্য ভারতবাসী যে এই সকল যথেচ্ছাচারী পাষাণ-হৃদয় শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের তাঁহারা কি করিবেন? রাজচন্দ্রের দুর্বিষহ কারাযন্ত্রণার তাঁহারা কি করিবেন? লালচাঁদের অবমান তাঁহারা কেমন করিয়া নিবারণ করিবেন? নয়ন-তারার নয়নের জল তাঁহারা কেমন করিয়া মুছাইবেন? কত সহস্র রাজচন্দ্র, কত সহস্র সইস, কত সহস্র লালচাঁদ, কত সহস্র নয়নতারা যে ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতিদিন ঐরূপ অদৃষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাদের জন্য তাঁহারা কি করিতে পারেন? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে আর তাহাদের ক্রন্দন, তাহাদিগের মৃত্যুশয্যায় রোদন—সেই মনীষীদিগের কর্ণগোচর

হইবে না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কই? আর কর্ণগোচর হইলেই বা তাঁহারা কি করিতে পারেন? পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহারা সততই হীনবল! পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভাই ভারত বিষয়ে হয় উদাসীন নয় বিদ্বেষপরিপূর্ণ। সুতরাং ভারতবাসীদিগের অশ্রুমোচনে তাঁহাদিগের কয়েক জনের সামর্থ্য কি? তাঁহাদিগের কয়েক জনের গুণাগুণে ভারতবাসীদিগের সুখ দুঃখের সম্ভাবনা কি? ভারবাসীর সুখ দুঃখ প্রধানতঃ ভারতবাসী ইংরাজদিগের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ নূতন কার্য্যবিধির বলে আজকাল ম্যাজিষ্ট্রেটরাই ভারতের প্রকৃত রাজা। সুতরাং ভারতবাসীর সুখ দুঃখ সেই ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের গুণাগুণেরই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। সেই মহাপ্রভুরা কিরূপ গুণশালী তাহা আমরা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিতেছি। প্রতিদিন সংবাদপত্রযোগে তাঁহাদিগের অতুল গুণের বিপুল পরিচয় পাইতেছি। যে ইংরাজজাতি সভ্যতা বিষয়ে জগতের আদর্শস্থল, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক; সেই ইংরাজজাতির প্রতি আমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি, সেই ইংরাজজাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা—এই মহাত্মাদিগের জন্যই দিন দিন অধিকতর বলবতী হইতেছে। এই বিদ্বেষ এবং এই ঘৃণার পরিণাম কি হইবে ভাবিতে গেলে আমাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়! যত দিন এই ঘৃণা ও বিদ্বেষানল ভারতবাসীদিগের অন্তরে প্রধূমিত থাকিবে, ততদিন ইংরাজজাতির প্রতি ভারতবাসীর মনকে প্রীতিপ্রবণ করার চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণনিক্ষেপের ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের দর্শন এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিক্ষপ্রণালী স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দূষিত না হইলে এতদিন আমরা আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার চার্ল্‌স উড্ ভারতবর্ষের শিক্ষা বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট ডেস্‌প্যাচ্ প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুসরণ করিতেছেন না। তাঁহারা লোকসাধারণের শিক্ষাবিধানচ্ছলে উচ্চ শিক্ষার পথে অনেক কণ্ঠক রোপণ করিতেছেন। লোকসাধারণের শিক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যে ইতিহাস পাঠে লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়—স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়; যে বিজ্ঞান পাঠে বহির্জগতের উপর মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা জন্মে; যে দর্শনপাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়; যে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হয়; এবং যে সাহিত্যপাঠে হৃদয়ের

কোমলতর বৃত্তিসকল তেজস্বিনী হয়;—সে ইতিহাস, সে বিজ্ঞান, সে দর্শন, সে সাহিত্য ও সে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা হইতে জনসাধারণ একবারে বঞ্চিত। সাহিত্যের মধ্যে বর্ণপরিচয়, অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে গণিতের মূলসূত্র—তাহাদিগের পাঠনার আদি ও অন্ত। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে এক কোটীরও অল্প লোক এইরূপ জঘন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটীর মধ্যে এক লক্ষ লোক ও উচ্চশিক্ষা পাইতেছে কিনা সন্দেহস্থল। সেই উচ্চ শিক্ষা আবার এরূপ জঘন্য প্রণালীতে সম্পাদিত হয় যে তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেও লজ্জা বোধহয়। যে সকল গ্রন্থ ইংলণ্ডীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রের ভূষণ বলিয়া পরিগণিত, তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় অসার পুস্তকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা এক্ষণে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থায় উৎকর্ষ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের কার্য্যের দোষ দেখাইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজ-পূজারূপ পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা এক্ষণে মানুষ হইতে শিখিয়াছেন। এ সুখসমাচার শ্বেতপুরুষদিগের অসহনীয়। শ্বেতপুরুষেরা ষড়যন্ত্র করিলেন যে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিতে দেওয়া হইবে না! শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদবীস্থিত কতিপয় শ্বেতপুরুষ অপার জলধিপারে আসিয়া অতি ক্লেশে বিপুল অর্থব্যয়ে কতিপয় অসার গ্রন্থ প্রসব করিলেন, অমনি সিন্‌ডিকেটের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল! স্বজাতিপক্ষপাতিতায় ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হইল! সেই অসার গ্রন্থ গুলি আপনারা ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, স্বজাতিপক্ষপাতিতানলে আহুতি প্রদান করেন, এরূপ সাধ্য নাই! এই জন্য হতভাগ্য ভারত যুবকের উপর সেই গুলির ক্রয় ভার অর্পিত হইল! শুদ্ধ ইহাতেই নিস্তার নাই—হতভাগ্য ভারতযুবক সেই অসার তুষরাশি উদরস্থ করিতে আদিষ্ট হইলেন! ভারতবর্ষীয় যুবকের ক্ষীণ মস্তিষ্ক এই গুরুভারে প্রপীড়িত হইল, অর্দ্ধাশনে জীর্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটী অসার কঙ্কাল বাহির হইল! শিরোবেদনায় অস্থির—গৃহিণী পীড়ায় প্রপীড়িত একটী অকালবৃদ্ধ বিদ্যালয় হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত হইল! চিররুগ্ন, জীর্ণকলেবর, অন্নচিন্তায় সমাকুল, নিরুৎসাহ ও দয়ার পাত্র এই

ভারত-যুবক হইতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা ?

ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে দশ কোটীর অধিক স্ত্রীজাতি। সেই দশাধিক কোটীর প্রায় সমস্তই অনক্ষর। যে দুই চারি জন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদিগেরও কেহই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীকুল যে ভারতের কলঙ্ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানবকুলের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী স্ত্রীজাতির পূর্ণ শিক্ষা বিনা জগতের কোনও গুরুতর মঙ্গল সংসাধিত হইবার যে সম্ভাবনা নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতের ললনাকুল অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা থাকিতে ভারতের যে কোনও শুভ নাই তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাঠশালা, অসংখ্য স্কুল ও অনেক কালেজ সংস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে রমণীকুলের জন্য নহে—মানবকুলের প্রবলতর শাখার জন্য। আজ শতাধিক বৎসর ভারতে সভ্যম্মানী ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তথাপি—লজ্জার কথা—ভারতে আজ পর্য্যন্ত রমণীকুলের জন্য একটীও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল না! যে কয়েকটী পাঠশালা ও যে কয়েকটী সামান্য স্কুল তাহাদিগের জন্য এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গুলি মাত্রে গণনীয়! যাঁহারা ভারতের ভাবী বংশধরগণের জননী, যাঁহারা বর্ত্তমান ভারত-সংস্কারকদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহারা ভারতের গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, যাঁহারা দুঃখভার-প্রপীড়িত ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের একমাত্র জ্যোৎস্না—সেই ভারত-ললনার অন্তর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা ?

ভারত! আর্য্যজাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলসনভূমি! রামভার্গব, কর্ণার্জ্জুন, ভীমকৃষ্ণের বিচিত্রবীর্য্য প্রদর্শনাঙ্গন! ব্যাস বাল্মীকি ও কালিদাস ভবভূতির কবিত্বসরোজ-সরোবর! শঙ্কর ভাস্করের ক্রীড়াস্থল! মনু পরাশর ও বুদ্ধ চৈতন্যের জন্মভূমি! লীলাবতীর লীলাস্থল! দুর্গাবতী ঝান্সীর বীরত্ব-রঙ্গভূমি! বেদের জননী! জগতের আরাধ্য! মানবকুলের উপদেশক! তোমার অদৃষ্টে শেষে কি এই ছিল? তোমার ভাবী পরিণাম কি হইবে এই ভাবিয়া আমাদিগের হৃদয় আকুল! যে ঘোর দুর্দ্দশাপঙ্কে তুমি এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে তোমায় উদ্ধার করে এমন লোক কই ?

জননী! আমরা তোমার অন্নে প্রতিপালিত, তোমার শোণিতে পরিপুষ্ট, তোমার মৃত্তিকায় গঠিত, তোমার মলয়পবনে অনুপ্রাণিত, তোমার নির্ম্মল জলে অভিসিক্তিত, তোমার বিশ্বব্যাপী ধবলযশে উজ্জ্বলিত—কিন্তু আমরা অক্ষম! সেই অনন্ত উপকারের একটীরও প্রতিশোধ করিতে অক্ষম! অক্ষম—কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি! সেই অসংখ্য উপকারের প্রতিশোধ করিতে না পারি তাহার জন্য

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নহি। জননী! সহস্র বৎসরের দাসত্বে আমাদিগের শোণিত শুষ্কপ্রায়, দেহ মৃতপ্রায়, মন ভগ্নপ্রায়। জননী! সহস্র বৎসরের দাসত্বে তোমার বিপুল দেহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তোমার অবগণ্ড সন্তানদিগের ক্রন্দনে আকুলিত! চতুর্দ্দিকে শকুনি গৃধিণী, শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট শব্দ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ঘোর বিপৎকালে তাহারা কাহার শরণাপন্ন হইবে? যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করা বলবানের স্বধর্ম্ম। বলবানের প্রতি উৎপীড়ন করে কাহার সাধ্য? জননী! তোমার দুর্ব্বল সন্ততিগণের বলাগমের উপায় কি? জননী! বহুকালব্যাপী দাসত্বে জীর্ণ কলেবরে প্রকৃত বলাগমের অনেক বিলম্ব। সে বিলম্ব অসহনীয়। এক্ষণে দাসত্বের অবস্থায় বলাগমের উপায় কি? জননী! তবে আমাদিগের কি কোন আশা নাই? যেন কোন দেবতা গম্ভীরস্বরে আমাদিগের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "আছে"। কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিলেন "একতা ও আত্মত্যাগ।"—ভারতের উদ্ধার সাধনের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ—ভারতের জীর্ণদেহে বলসঞ্চারের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।' তৃণেরও সমষ্টি দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়। বিংশতি কোটী ভারতবাসী একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইলে কাহাকে ভয়? বিংশতি কোটী ভারতবাসী স্বদেশের মঙ্গলসাধন-ব্রতে আত্মবিসর্জ্জন করিলে ভারতের কি অভাব? বিংশতি কোটী ভারতবাসীর নয়নের জলেও শ্বেতদ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইতে পারে। বিংশতি কোটী ভারতবাসীর দীর্ঘ নিশ্বাসেও ভারতের শ্বেত পুরুষ কয়েকটী উড়িয়া যাইতে পারে। সমস্ত ভারত সমবেত হইলে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি? দুর্ব্বলের আবার অস্ত্রধারণ কি? দুর্ব্বলের মহাস্ত্র ক্রন্দন! আমরা বিংশতি কোটী দুর্ব্বল ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের উপর জয়লাভ করিব! আমরা বিংশতি কোটী ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব! হিন্দু, মুষলমাণ,—পারসী, য়িহুদী—ফিরিঙ্গী, সাঁওতাল—সীক, বৌদ্ধ—আমরা সমস্ত ভারতবাসী এক তানে কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব ভিক্ষা করিব! আমাদিগের ঐকতানিক ক্রন্দনে ইংলণ্ডের ভারতসিংহাসন টলিবে! যে জাতি স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত; যে জাতি আত্ম-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেহ প্রাণ, ধন মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত; যে জাতির রণতরি অসভ্য আফ্রিক, তাতারদিগেরও দাসত্বমোচনে সতত সুসজ্জিত,—সেই জাতি যে—সভ্যতার শৈশবদোলা সরস্বতীর জন্মভূমি—ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর ক্রন্দনে বধির থাকি-

বেন বিশ্বাস হয় না! ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী যদি প্রত্যেকে স্বাধীনতাব মূল্য বুঝিতে শিখেন; যদি প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যদি প্রত্যেকে ভারতের একোন বিংশতি কোটী অধিবাসীকে সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যদি সকলে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; তাহা হইলে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ইংলণ্ড পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় উপযুক্ত সন্তানদিগেব হস্তে তাহাদিগের আত্মশাসন ও আত্মপালন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া এই গুরুতর পালনকার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন! যে দিন ইংলণ্ড ভারতের প্রতি এই উদার ও নিরভিসন্ধি ব্যবহার করিবেন, সেই দিনই ইংলণ্ড ভারতবাসীদিগেব প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত কৃতজ্ঞতার আধার হইবেন! সেই দিনই ইংলণ্ড ও ভারত এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবে! পরস্পরের দুঃখে পরস্পর দুঃখী হইবে! পরস্পরের সুখে পরস্পর সুখী হইবে! পরস্পরের বিপদে পরস্পরে প্রাণ দিবে! স্বাধীনতা ও সমতা ব্যতীত সে সহানুভূতি ঘটে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এক পক্ষে সমতা ও স্বাধীনতার অভাব রহিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় সে সহানুভূতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যাহাতে ভাবতেব বিংশতিকোটী অধিবাসী পরস্পবের প্রতি পবস্পর সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী একবাক্যে স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটনের নিকট আত্মদুঃখ ব্যক্ত করিতে শিখেন; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত—জননী ভারতভূমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাচিহ্ন স্বরূপ—১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আলবার্ট হলে "ভারত-সভা" নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন! এইদিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল! পারলৌকিক ধর্ম্ম পৃথক্ হউক, জাতি পৃথক্ হউক, সমাজ পৃথক্ হউক, তথাপি এ ধর্ম্মের একতা পরিরক্ষিত হইবে। এ ধর্ম্মে হিন্দু, মুষলমাণ; বৌদ্ধ, জৈন; সেশ্বর, নিরীশ্বর; সাকার, নিরাকার; খ্রীষ্টান্, হীদেন—সকলই সমান। সকলেই নির্ব্বিরোধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটী মাত্র নিয়ম আছে—দীক্ষিতদিগের প্রত্যে-

কেই ভারতবাসী হওয়া চাই। ইহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহা সাম্যবাদী। এই ধর্ম্মই ভারতসভার মূলভিত্তি। এই জন্য ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুষলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, সীক। আপনারা সকলেই আসিয়া এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন ভারতের সুখসূর্য্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে। বৎসরে বৎসরে ভারতের প্রতি গৃহে যেন এই দিন উপলক্ষে মহান্ উৎসব হয়। যেন এই দিনে হিমালয় হইতে সিংহল, এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ ভারতের যশোগান করে! ভারত এক দিন জগতের সভ্যতামার্গের নেতা ছিলেন, একদিন সমস্ত জগতের শিক্ষক ছিলেন, এক দিন ইহাঁর বীরত্বে মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল, আবার এমন দিন আসিবে—সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যে দিনে ভারত আবার জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইবেন, যে দিনে ভারত আবার সমস্ত জগতের শিক্ষক হইবেন, যে দিনে ভারতের বীরত্ব জগতে পুনর্ব্বার উদ্ঘোষিত হইবে!!! ভারতসভা! এই গভীর লক্ষ্যসাধনের ভার তোমার অনতিপ্রৌঢ় মস্তকে অর্পিত রহিল! দেখিও যেন এই গুরুভার—ও এই গভীর বিশ্বাসের অপব্যবহার না কর।

মেহের আলি।

দশম অধ্যায়।

বঙ্গ-উপসাগরে আন্দামন নামক কতিপয় দ্বীপ বিখ্যাত আছে। বৃহৎ আন্দামন ক্ষুদ্র আন্দামন প্রভৃতি বড় বড় দুই একটীর নামকরণ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন কএকটী ছোট ছোট দ্বীপ আছে অদ্যাপি তাহার নামকরণ হয় নাই। বৃহৎ আন্দামনের দক্ষিণভাগে আজকাল দ্বীপান্তরবাসীদের আবাস হইয়াছে; তৎকালে পোলোপিনাঙ্গ বন্দীদের উপনিবাস ছিল এবং আন্দামন জঙ্গলময় ছিল। বৃহৎ আন্দামনের নিভৃততম প্রদেশে অরণ্যবাসী কতিপয় জাতি আছে তাহারা সময়ে সময়ে নরমাংসও ভোজন করিয়া থাকে।

বৃহৎ আন্দামনের পূর্ব্বভাগে ৮।১০ ক্রোশ ব্যবধানে দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, উহা জনশূন্য এবং বিরল। উত্তরাংশের ক্ষুদ্র দ্বীপটী সমুদ্র হইতে অতি সামান্য এক খানি দূর্ব্বার চটীর ন্যায় দেখা যায়। নিকটে আসিলে বালির চড়া, বেতস বন ও কণ্টকারণ্য মধ্যে অগণ্য ঝাঁড়ি দেখা যায়। দূর হইতে সুনীল আকাশ ও সুশ্যাম সাগর জলের দৃশ্য-মধ্যে নারিকেলবৃক্ষশীর্ষ অতি শোভমান হই-

য়াছে। কে যে বৃক্ষগুলি রোপণ করিল বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে বড় বড় গাছ ও ঝোঁপ আছে।

তালতরু-তুল্য তরঙ্গ চারি দিক্ হইতে যেন দ্বীপকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। চড়া ও কূলের নিকটে আসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যেন শীকার গ্রাস-গত হইল না ব'লে তরঙ্গ-নিচয় মহা আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছে। অনবরত হুহুঙ্কার শব্দে কর্ণ বধির হয়। আবার যখন প্রবল প্রবাহ কূলে নিপতিত হয়—বোধ হয় যেন শত শত হর্ম্ম্য ভূপতিত হইল, এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। জলসীমা মুহুর্ম্মুহু চড়ার উপর উঠিতেছে ও নামিতেছে—উপকূল তোলপাড়। একটু কি বিশ্রাম নাই? আবার মধ্যে মধ্যে ফেণরাশি তুলার গাদার ন্যায় বালির উপর স্তূপাকার হইতেছে। সমুদ্র হইতে এই আমোদ দেখা অসম্ভব। পাঁচগড়ে অর্থাৎ সারি সারি পাঁচটি তরঙ্গ যে কূল হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে নৌকা গেলে আছাড়িয়া মারে, এবং জাহাজ যাইবার জল থাকে না। আর সমুদ্র-গর্ভ থেকে তাহার গর্জ্জন শুনা যায় না। কূলে চড়ে দাঁড়াইলে শিকতাময় সুদৃঢ় উপকূলে সাগর-তরঙ্গ-নিপাত দেখিতে ও সমুদ্র গর্জ্জন শুনিতে অতি ভয়ঙ্কর অথচ রমণীয়। যিনি একবার দেখেছেন আর জন্মে ভুলেন না।

দ্বীপের উপকূলে এক ব্যক্তি শুভ্রবেশ ধারী দাঁড়াইয়া আছেন, নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সমুদ্র দেখিতেছেন—কি তটস্থ লহরী লীলা দেখিতেছেন, তিনিই জানেন। এক একবার ক্ষুদ্র শ্মশ্রু বাম মুষ্টিতে ধরিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন, এক এক বার ঐ শ্মশ্রু দন্তে আবদ্ধ করিয়া অধোমুখ হইতেছেন। প্রাতঃকাল। সূর্য্য সুবর্ণ কলস রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে কৃষ্ণজলে অবগাহন করিয়া উঠিতেছেন। বালার্ক ঢল ঢল তরল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় রঞ্জিত হইয়াছে। চক্রটী জল হইতে প্রায় সমুদায় উঠিয়াছে। দুই চারি অঙ্গুলি মাত্র জল মধ্যে আছে। সেই অংশ অদৃশ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে উত্থিত চক্রের কিয়দংশ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুবর্ণকলস-স্কন্ধের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কবি কালিদাস সমুদ্র হইতে সদ্যোত্থিত সূর্য্যকে "সুবর্ণ কলস" বর্ণন করিয়াছেন। উহা সুবর্ণ কলসই বটে, যিনি একবার সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখেছেন অনায়াসে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তীরস্থ শুভ্রবেশী ব্যক্তি কিন্তু সে দিকে আকর্ষিত না হইয়া ক্ষুদ্র এক তরণী যে কূলে কূলে আসিতেছে এবং এক খাঁড়ির মুখে প্রবেশ করিল, তাহাই দেখিতেছেন। নৌকা বেতস বনে অদৃশ্য হইলে, তটস্থ ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে গেলেন।

খাঁড়ির কূলে একটী বড় গাছের তলে এক ফকীরের আস্তানা আছে। তটস্থ ব্যক্তি ঐ আস্তানার ফকীর হইয়া বসিলেন এবং তরি হইতে উত্থিত দুই জন যুবা পুরুষ ফকীরকে সেলাম করিয়া

সম্মুখে দাঁড়াইল। ফকীর এক জনকে আলিঙ্গন ও স্নেহ-সূচক সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "কহ রেঙ্গুণের বার্ত্তা কি?" সেই ব্যক্তি কহিল "চাচা আপনি যাহা যাহা শুনিয়াছেন সত্যই বটে, কারণ মেহের-আলি রেঙ্গুণে রোয়ানজা মগের বাটীতে কর্ম্ম করিত এবং অবশেষে তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রোয়ানজা তাহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন, এ অঞ্চলে আসিলে তাঁহার গুপ্ত চর অবশ্যই তাহাকে ধরিবে ও রোয়ানজা স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করিবেন। আমার প্রতি তিনি বড়ই সদয় হইলেন। আমার সাহায্যে জাহাজ দিতে চাহিলেন যদি মেহেরকে ধরে দিতে পারি। তিনি এদিকে আমাদের সহায় রহিলেন।"

ফকীর কহিলেন, "খোদা! আর বেশী ক্লেশ করিতে হইবে না, এই দ্বীপের নিকটেই মেহেরআলি এক জাহাজে আছে, শীঘ্র এই দ্বীপে তাহাকে আনাইতেছি; তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" ফকীর, আসগরআলি মোক্তার; ও যুবা পুরুষ ফজরআলি, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। ফজরআলি সহর্ষভাবে আপন খুল্লতাতের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন, এবং মেহেরকেই বা কিরূপে পাইলেন বলুন, আমার বড়ই ঔৎসুক্য হইতেছে।" আসগরআলি কহিলেন, "বৎস! যে দিন রমজা ঝবঝব্যা বটতলা হইতে এক নাবিককে আনিল ও নাবিক বলিল সে মেহেরআলির জাহাজ হইতে আসিতেছে, মেহের আলি শ্রীহট্টের সেখ মোবারকের পোষ্য পুত্র হইয়াছে এবং সে রেঙ্গুণ কূল হইতে পলায়ন করে এসেছে, আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইল সেই মেহেরআলির কথা বলিতেছে। সন্দেহ ভঞ্জন জন্য তোমাকে রেঙ্গুণে রোয়ানজা মগের বাটীতে পাঠাইলাম—দেখিতে যে, যে মেহেরআলি তাঁহার বাটীতে কর্ম্ম করিত ও তথা হইতে পত্র পাঠাইত সে সেআশ্রয় ছেড়েছে কি না? তাহা হইলে নিশ্চয় সেই মেহের আলি, সেখ মোবারকের পোষ্য হইয়াছে।

ফজর। হাঁ নিশ্চয় তাই বটে।

আসগর। সেই দিনের সপ্তাহ পরে আমি রকিমন্নিসার জাহাজ লইয়া নোয়াখালি রওনা হইলাম। জাহাজ তথায় রেখে শ্রীহট্টে গেলাম এবং মেহের আলির সন্ধান পাইলাম। মেহেরআলি সেখ মোবারকের জাহাজ লইয়া অবিলম্বে চট্টগ্রামে আসিবে এবং সঙ্গে প্রভূত ঐশ্বর্য্য যাইবে শুনিলাম। খোদা! তখন যে কত আশঙ্কা হইতে লাগিল কি বলিব? যদি এই ক্ষুদ্র মস্তকে কৌশল ভরা না থাকিত এতদিনে সব বিফল হইত!"

ফজর কহিলেন, "বল বল চাচা কেমন করে সে বেগ ফিরাইলেন?"

আসগর শ্মশ্রু দন্তে ধরিয়া কহিলেন "কেমন করে? শুন। আমি জানি মেহের দয়ার বশ। জোর করিলে এখন তাহাকে আটকান যাইবে না, তাই

তাহার দয়ার উপর কৌশল খেলা গেল। নোয়াখালি হইতে একটী হিন্দুস্থানীকে অর্থ দিয়া বশ করিলাম, তাহাকে শিখাইলাম যে সে নৌকা করে মেহেরের জাহাজের পথে থাকে। জাহাজ দেখিলেই, তাহাকে ধরে এবং মেহেরের পায়ে ধরে কেঁদে বলে তাহার স্ত্রীকে এক জাহাজের লোক কেড়ে লযে মান্দ্রাজে গেছে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহার নাম শঙ্কর সিং। শঙ্কর পটু বটে, সেই কৌশলে মেহেরকে জাহাজ শুদ্ধ মসুলী পাটমে* আনিল। আমিও জাহাজ সহ ঐ বন্দরে এসেছিলাম। এখন মেহেরকে বিপদে ফেলাইবার জন্য, শঙ্করকে শিক্ষা দিলাম যে কোন এক ভদ্র পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী ব'লে এক স্ত্রীলোককে দেখায় ও ধরায় এবং আপনি গোএন্দা হয়ে আবার মেহেরকে ধরাইয়া দেয়।"

ফজর। তার পর তার পর।

আসগর। তার পর, শঙ্কর সিং তাহাই করিল। বিখ্যাত চারিলু নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবন হইতে এক কুলবধূকে বাহির করা হইল, এবং রাজকর্ম্মচারী মেহেরকে জাহাজ শুদ্ধ বন্দী করিল। শঙ্কর সিংহ দ্বারা প্রমাণ করাইলাম—মেহেরের উক্তি সকল মিথ্যা, সে এইরূপ পরস্ত্রী হরণ ক'রে বেড়ায়। কিন্তু চারিলু-বধূ মেহেরের পক্ষে স্বাক্ষ্য দিল, তাহার সরলতা ও ক্রন্দন দেখে রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাস করিল এবং মেহের মুক্তি পাইল।

ফজর। আবার ত বিপদ—তার পর তার পর।

আসগর। পলাইবে কত বার? মেহের শঙ্কর সিংকে দণ্ড দিবার জন্য মাসেক তথায় রহিল। শঙ্করকে গোপন করে রেখে, গুপ্তচর দ্বারা মেহেরকে শঙ্কর প্রাপ্তির লালসা দেখাইয়া কিয়ৎকাল মসুলীপট্টনে আটকাইলাম। তদবসরে ঐ অপহৃতা স্ত্রীর স্বামী চারিলুকে মেহেরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলাম এবং সে রাজী হইয়া ছদ্মবেশে মেহেরের জাহাজে উঠিল। কৌশলে সে জাহাজ এই দ্বীপে এসেছে; আমিও এখানে এসেছি। পরে তোমার সংবাদ পাইয়া তোমাকে আনাইলাম; এখন সমবেত হইয়া মেহেরকে এবার নাশ করিতে হইবে।

ফজর। আর ভাবনা কি? যাহা বলিবে ফজর প্রস্তুত আছে,—বল ত রজনীতে ছোরা লইয়া মেহেরের গলায় বসাইয়া আসি।

আসগর। উঁহুঁ! সে বড় সতর্ক ও বলবান্, আর জাহাজের লোক সব তাহার অনুগত।

ফজর। তবে কি হইবে?

আসগর। "চিন্তা কি? চারিলুর সঙ্গে আমার এক চর আছে; শঙ্কর সিংও

---

* বিগত বারের উপাখ্যানাংশে শ্রীরঙ্গপট্টন স্থানে মসুলীপট্টন পড়িতে হইবে।

আমার সঙ্গে আছে।. ঐ চর চারিলুকে উত্তেজিত করিতেছে এবং অবিলম্বে চারিলু মেহেরকে লইয়া আমার কাছে আসিবে। আমরা ৪। ৫ জন হইব, ধরে মেহেরকে নাশ করিব।” হা হা করিয়া আসগর হাস্য করিল।

পর দিবস প্রাতে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র তীরে থেকে সমুদ্র দেখিতে লাগিল। একটী জাহাজের বোটে তিন ব্যক্তি আরোহী মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল এবং অবিলম্বে তরীটী বেতসবনাবৃত খাঁড়িতে প্রবেশ করিল। ,তৎক্ষণাৎ আসগর আলি আস্তানায় ফকীর হইয়া বসিলেন এবং ফজর পার্শ্বস্থ এক ঝোপে লুকাইল। নৌকা হইতে একজন আসিয়া প্রথমে ফকীরকে সংবাদ দিল— অভিলষিত ব্যক্তিদ্বয় আসিতেছে তৎপরে দুই যুবা পুরুষ উপনীত হইল। উভয়েই ভদ্রবেশধারী, সবলকায়, ও স্বরূপ। একজন মুসলমান, একজন মান্দ্রাজী হিন্দু। মুখশ্রীতে তেজ, সাহস, সরলতা ও ঔদার্য্য বিলক্ষণ প্রতীয়মান। উভয়ে নতশীরে ফকীরকে সেলাম করিয়া বসিল।

ফকীরও মন্দ দেখিতে নহেন। পরিচ্ছদ বহুবর্ণ সাততালি আলখাল্লা ও টুপি। গলে স্ফাটিকমালা। হস্তে তস্‌বী। দাড়ীটি ছোট কিন্তু সুপক্ক বটে। ফকীর একখানি ছেঁড়া কাপড় পেতে বসে আছেন। পার্শ্বে আসবাবের মধ্যে এক কাঁথা, মাটীর বদনা এক, কুর্ত্তি এক, ও মালা ক’রে কএকটী চাউল মাত্র। যুবাদ্বয় চমকিত হইয়া ফকীর ও তাঁহার স্থান ও আসবাব দেখিতে লাগিলেন। ফকীর আরবীর মত কএক কথা বীজবীজ করে বকিয়া কহিল—“আল্লা তুম্‌কো সেলামৎ রাখে! কাঁহাসে আতা হায়?”

১ম যুবা। মহাশয়! আমরা মান্দ্রাজ হইতে মগের মুল্লুক ,যাইতে ছিলাম, বাণিজ্যার্থ ও কোন ব্যক্তিকে অনুসন্ধানার্থ; এই জনহীন দ্বীপে জন-শব্দ প্রাপ্তে আশ্চর্য্য হইয়া এবং রাহী লোকের কাছে মহাশয়ের স্থান এইখানে শুনিয়া সেলাম দিতে আসিয়াছি।

ফকীর। “খয়ের! বাবা তু কাঁহাসে ক্যাওয়াস্তে আয়া?” দ্বিতীয় যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

২য় যুবা। মহাশয়! শুনেছি আপনি ভবিষ্যৎ বক্তা আপনি কি জানেন না?

ফকীর ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল— “হাম্‌কো বড়াও মৎ, হজরৎশাকো পুছ্‌নেসে সব মালুম হোতা হায়! তোম্‌ক্যা মাঙতা হায় কহো—হজরৎশাকো আরজ করুঙ্গা, জবাব মিলেগা।”

১ম যুবা। প্রথম প্রশ্ন এই যে এই নির্জ্জন দ্বীপে অরণ্যে আপনি কিরূপে কাল যাপন করেন ও আহারাদি প্রাপ্ত হয়েন?

ফকীর। “লেড়কা ক্যা তরে পুছা। ইসজাগহা মে খোদা হায় নেহি? খোদা রহনেসে খানা মিল্‌না ক্যা মুস্কিল হায়? যো জাহাজ হিয়াঁসে যাতা হায়, মুসলমান ইয়ানে হিন্দু সব আদমী খুদা মাঙ্গনে

আত হায়—আওর বন্দায়ে—খোদাকো খানা দেযাতা হায়।”

২য় যুবা। মহাশয় কত কাল এখানে আছেন?

ফকীর। “দেড়শোয়া বরষ্‌সে জেযাদা হোগা—হজরত্‌ শা ইস্‌ জাগ্‌হামে হামকো বৈট্‌লায়া।” যুবারা চখোচখি করিলেন।

২য় যুবা। এখন আমাদের জন্য “দুয়া মাগ” ও আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির কি হইবে?

ফকীর। “থোড়া সবুর করো বাবা। হজরৎকো পুছ্‌লেঁ।” ফকীর মহা আড়ম্বর করিয়া নমাজ পড়িলেন ও বৃক্ষের উপর চাহিয়া রহিলেন। উপর হইতে বৃক্ষশীর্ষ ভয়ঙ্কর নড়িয়া উঠিল—পাতা পড়িয়া সম্মুখে স্তূপ হইল। যুবারা বিশেষতঃ হিন্দু যুবা কিছু ভয়চকিত হইলেন। পরে ফকীর কহিলেন—“ডরো মৎ বাবা, হজরত্‌ খফা করেগা নেহিঁ—হাম্‌কো মালুম হুয়া তোম লোক ক্যা ওয়াস্তে আয়া হায়।” ১ম যুবাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, “তু এক আদমীকো পানে মাঙ্গতা, সজাকে ওয়াস্তে, এক আদমীকো মাঙ্গতা হায় পেয়ারকে ওয়াস্তে। হজরত্‌ ফরমাতা হায়, পহেলা আদমী ইস্‌চড়মেঁ হায়,—লেখেন্‌ তুমকো হাত লগেগা নেহি—হজরত্‌ উস্‌ বাত্‌ মেঁ খফা হুয়া; আউর দুসরা চাটগাঁউমেঁ হায়,—উও তুমকো নেহি মাঙ্গতা।” দ্বিতীয় যুবাকে সম্বোধিয়া কহিলেন—“তোমারা ইরাদা জলদী পুরা হোগা—তুম দুনোঁ ইস্‌ জাগহামেঁ তিন রোজ রহেনেসে হোগা।”

প্রথম যুবাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ফকীর কহিলেন—“কুছ্‌ খতর হায় নেই, বাবা, হজরৎকোঁ দুয়া মাঙ্গনেসে ঠাণ্ডা কর্‌ শক্তা হায়। হজরত্‌ ফরমানে সে এভি হাত লগেগা ওসকা ভি দিল্‌ ফিরেগা।”

যুবা আশান্বিত হইয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে?” “তিন রোজ ইহাঁ সেরেফ্‌ পানি পীকে পড়া রহনা হোগা—হামকো ভি উসি সুরতসে দুয়া মাঙ্গনে হোগা।” যুবা সহসা এমত দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিবেন কি না ভাবিয়া কহিলেন—“অদ্য যাই কল্য আসিব।” যুবাদ্বয় নৌকা বাহিয়া সমুদ্রে গেলেন। তথায় গিয়া জাহাজ দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহাজ নাই কেন এবং তাঁহাদের সঙ্গী কোথা গেল? ফকীর কহিলেন—“হজরৎ খফা হুয়া—তুম্‌ চলা গিয়া; জাহাজ ও আদমী ইধার আন্দামন তরফ্‌ চলা গিয়া—অভি যাও, নেহি ত জাহাজ মিলেগা নেহি।” ফকীরের নির্দ্দেশ মতে যুবারা আন্দামানের দিকে গেলেন।

বেলা অপরাহ্ণ হইল, পশ্চিমাকাশে ছিন্ন ছিন্ন মেঘমালা সুবর্ণ পাটীর ন্যায় শোভমান হইয়া নীলজলে লাল আভা প্রদান করিল; ক্রমে অস্তগামী রবিথাল

জলে প্রবেশ করিল এবং একবার দেখা গেল যেন সোণার, মালসাটি, পরে দেখা গেল যেন সরাটী ভাসিল। যুবাদ্বয় অনাহার। নৌবাহনে কাতর হইয়া প্রকৃতিশোভা দেখিবার অনাস্থাপন্ন হইয়াছেন। সমস্ত দিবস সুবায়ু ছিল, এজন্য সন্ধ্যা কালে একটী কূল দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া যাইতেছেন। রজনী উপস্থিত. সহসা কূল অদৃশ্য হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে একটী আলোক দেখা গেল। আলোক দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় উল্লাসে যুবাদ্বয় তদুদ্দেশে চলিলেন। রজনী প্রহর গত হয় নাই এমত সময়ে কূল প্রাপ্ত হইলেন এবং আলোকটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া কৃষকাবাস জ্ঞানে তাহার দিকে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন দুইজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বসিয়া আছে। সম্মুখে গিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারা কে, দুই জন কাল পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া সহসা এক এক লগুড় দ্বারা যুবা দ্বয়ের মস্তকে এমনি আঘাত করিল যে তাঁহারা অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন কৃষ্ণ পুরুষেরা উঁহাদিগকে বনলতা দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভূমে ফেলিয়া রাখিল। কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে, হতভাগ্য যুবারা দেখিলেন তাঁহারা আবদ্ধ হইয়াছেন এবং অগ্নিকুণ্ড হইতে একটী অর্দ্ধ-দগ্ধ নর-দেহ লইয়া আততায়ীরা উল্লাসে ভোজন করিতে লাগিল। যে চেতনা জন্মিল পুনঃ পুনঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। নিশ্চয় মৃত্যু-গ্রাসে পড়িয়া উভয়ে মনে মনে সংসার হইতে বিদায় লইলেন। এক রকম প্রস্তুত হইয়া দেখিতে লাগিলেন রাক্ষসেরা কিরূপে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতেছে। দেখিব না মনে করিলেও এক এক বার দেখিতে হইল। এবং যাহা দেখেন তাহাতে তাঁহাদের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। চক্ষু মুদিলেও কখন হড়্ডিকা ভঞ্জন ও চর্ব্বণ শ্রবণে নিজ নিজ অস্থি ভঙ্গ কল্পনায় যন্ত্রণা বোধ করেন। যখন রাক্ষসেরা অঙ্গুলি চিবাইতেছে, যুবারা বোধ করিতেছেন যেন তাঁহাদের অঙ্গুলি খাইতেছে এবং তদ্রূপ যন্ত্রণার সহিত; এক এক বার আপন আপন অঙ্গ দেখিতেছেন আছে কি না। এইরূপ রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রাক্ষসেরা দগ্ধ নর-দেহের ত্রিচতুর্থাংশ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। অবোধ্য কএকটী কথা কহিয়া এবং বধ্যগণের প্রতি তাকাইয়া ঐস্থান হইতে প্রস্থান করিল। বোধ হইল কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া তাহাদেরও ভোজন করিবে, অথবা অন্য কোন স্থলে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

যে দ্বীপে যুবারা পড়িয়াছেন উঁহা আন্দামন দ্বীপ। ঐ স্থলের অরণ্যবাসীরা তৎকালে নরদেহ ভোজন করিত; এবং যুবাবা তাহাদেরই হস্তে আপনাদিগকে ফেলিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন—বিগত চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে সম্পাদকের বিজ্ঞাপনীতে এই মর্ম্মভেদী সংবাদ দৃষ্ট হইল—"চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল"। "জলবুদ্বুদ বঙ্গদর্শন জলে মিশাইল"—জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু সংবাদে যে যাতনা, এই সংবাদে আজ আমাদিগের সেই যাতনা উপস্থিত হইল! আজ সার্দ্ধ দ্বিবৎসর কাল আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের সহযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের প্রতিযোগিতা করা আর্য্যদর্শনের কথনই লক্ষ্য ছিল না। বিশেষতঃ আর্য্যদর্শনের সম্পাদকের ও লেখকগণের অনেকেরই বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অন্যান্য লেখকগণের সহিত আত্মীয়তা থাকায়, আর্য্যদর্শন—বঙ্গদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা প্রদর্শন করিতে কথনই ত্রুটী করে নাই। বঙ্গদর্শনও আর্য্যদর্শনের প্রতি সোদরোচিত স্নেহ প্রদর্শন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ, উভয়ের প্রতি উভয়ের মমতা, দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিতই হইতেছিল। এমন সময় কাল আসিয়া সেই স্নেহের অন্যতর আধারকে ছিন্ন করিল। হায়! জগতের কোন সুখই চিরস্থায়ী নহে!

আজ চারিবৎসর বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। আজ চারিবৎসর বঙ্গের প্রতিগৃহে, প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রতি কার্য্যালয়ে—বঙ্গদর্শনের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ধনী ও নির্ধন, উচ্চ ও নীচ, অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ, স্ত্রী ও পুরুষ এবং বাল ও বৃদ্ধ—সকলেই বঙ্গদর্শনের পাঠকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাঁহার মনোবৃত্তির যেরূপ পরিণতি তিনি ইহাতে তদুপযোগী পাঠনার বিষয় পাইতেন। কাহাকেও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া প্রত্যাহত হইতে হইত না। কল্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা সকলকেই পূর্ণকাম করিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্যেতিহাসে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটী নূতন যুগের প্রারম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আজি চারিবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে এক নব জীবন সংক্রামিত হইয়াছে। যখন বঙ্গদর্শনের প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সেই অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই গুরুভার একজনের মস্তকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে ভাবিয়া আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের সহযোগিতায় অগ্রসর হইলেন। বঙ্গদর্শন কিছুদিন একত্র সেই ভার বহন

করিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই গুরুভার সহযোগিত্রয়ের মস্তকে অর্পণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতেছেন। চতুর্ব্বাহনবাহ্য বঙ্গীয় সাহিত্যদোলা ত্রিবাহনে কিরূপে সংবাহিত হইবে জানি না। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে কনিষ্ঠভ্রাতৃত্রয় দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে জানি না। তবে এই এক আশা ও এই এক সান্ত্বনা—যে বঙ্কিম বাবু এই গুরুভার হইতে অবসৃত হইয়া এক্ষণে একাগ্রচিত্তে আখ্যায়িকা রচনায় নিমগ্ন হইতে পারিবেন। আখ্যায়িকারচনায় তাঁহার পারদর্শিতা ভাবতে অতুলনা। তাঁহার বিষবৃক্ষ, তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী, তাঁহার কপালকুণ্ডলা অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া খ্যাত। যদি এই অবসরে তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় দুই চারিখানি আখ্যায়িকা প্রসূত হয়, তাহা হইলে সহস্র বঙ্গদর্শনের বিরহ আমরা আহ্লাদসহকারে সহ্য করিব! এক্ষণে আমরা অন্তরের সহিত বঙ্কিম বাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আমাদিগের আশা আমাদিগের বিশ্বাস—বুদ্ধির পরিপুষ্টি ও বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী হইতে এক্ষণে বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, ও কপালকুণ্ডলা অপেক্ষাও অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিণত আখ্যায়িকা প্রসূত হইবে!

পরিমিতি—বর্গপরিমাণ ও জরিপ। নর্ম্যাল, বর্ণাকুলার, ও মাইনর স্কুলসমূহের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। নিউ স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥৴০ আনা মাত্র। পরিমিতি বা ক্ষেত্রব্যবহার বিষয়ে অদ্যাপি এক খানির অধিক পুস্তক ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। নৃসিংহ বাবুর পরিমিতি ক্ষেত্রব্যবহার বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক। প্রথমোক্ত পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বিধায় নৃসিংহ বাবু হণ্টর, টডহণ্টর প্রভৃতি নানাবিধ ইংরাজী ও ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে সমুদয় নিয়ম সরল ভাষায় সুচারুরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণও বহুসংখ্যক প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার প্রণয়ন বিষয়ে নৃসিংহ বাবু পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটী করেন নাই। এক্ষণে আমাদিগের একান্ত কামনা যে তিনি যে উদ্দেশ্যে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য যেন অচিরাৎ সফল হয়।

ইউক্লিডের জ্যামিতি—প্রথম অধ্যায়। টীকা ও বহুসংখ্যক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞাসমেত বর্ণাকুলার, মাইনর ও লোয়ার বর্ণাকুলার স্কুলসমূহের ব্যবহারার্থ, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা নিউ স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৶৹ আনা মাত্র। এখানি বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক অনুবাদিত জ্যামিতির সংস্কার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যে যে স্থলে ব্রহ্মমোহন বাবুর অনুবাদের দোষ ছিল, যে যে স্থলে তাঁহার পারিভাষিক শব্দগুলি অস্ফুটার্থ ছিল, সেই সেই স্থলে নৃসিংহ বাবু ইহার সংস্কার সাধন করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতির বাঙ্গালা অনুবাদকে অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিয়াছেন। নৃসিংহ বাবুর ব্যাখ্যাগুলি অতিশয় বিশদ হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ যে তাঁহারা এই পুস্তকখানি নর্ম্যাল, বর্ণাকুলার ও মাইনর স্কুল সমূহের পাঠ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া যেন নৃসিংহ বাবুর পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করেন।

মহাপুরুষের নাম।

আমরা অদ্য বঙ্গীয় কুলতিলক মহোদয়গণের একটী তালিকা দিব, তাহা দর্শন করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে কোন্ কুলে কত জন মহামতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে কোন্ কোন্ মহাত্মার বংশ কোথায় আছে। এবং কোন্ কোন্ মহাত্মা এককালে নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহাদিগের বংশাবলী নাই)।

	গোত্র।	বংশ।	নিবাসস্থান।	জিলা বা প্রদেশ।	বংশের ধারা আছে কি না।
১।	ভরদ্বাজ গোত্র	শ্রীহর্ষের বংশ	কঙ্কগ্রাম *	রাঢ়দেশ	আছে।
২।	ঐ	শূলপাণি	সাহুড়ীগ্রাম *	ঐ	ঐ

শূলপাণির স্মৃতি সর্ব্বত্র আদৃত আছে। ইনি রঘুনন্দনের অনেক কালের লোক। সাহুড়ীগ্রাম আদিশূর দত্ত ষট্‌পঞ্চাশত্ গ্রামের একতম।

৩।	ঐ গোত্র	রায় পরমানন্দ	ডিংসাই *	ঐ দেশ	বংশ আছে।

ইনি হোসেন সা বাদসাহের সময় উজীর (প্রধান মন্ত্রী) পদে অভিষিক্ত ছিলেন। প্রথমে ডিংসাই, গৌণকুলের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তৎকালে ডিংসাই কন্যা গ্রহণে কুলীনগণের কুলচ্যুতি ঘটিত। রায় পরমানন্দের যত্নে ইহাঁরা কষ্ট শ্রোত্রিয় হইতে মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তদবধি ইহাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত। শত ডিংসাই ও জন ডিংসাই। শত ডিংসাই-কন্যা গ্রহণে এক্ষণে কুলীনগণের এককালে কুল ধ্বংস হয় না। কিন্তু কুলমর্য্যাদার ক্রটি হয়। ৫৬ গ্রামের একতম। ডিংসাই শত প্রসিদ্ধ। কলের নবগ্রহ স্বরূপ। রায় পরমানন্দ ঐ গোষ্ঠী সম্ভূত ছিলেন।

৪।	ভরদ্বাজ	গন্ধর্ব্ব	রাই গাঁই *	রাঢ়দেশ	বংশ আছে।

রাই গাঁই নিতান্ত অচল ছিল। পরে গন্ধর্ব্বরাই কুলক্রিয়া করিয়া কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হয়েন। তদবধি ইনি কুলীনগণের নিকট প্রসিদ্ধ। রাই গাঁই ৫৬ গ্রামের একখান।

* এ সকল গ্রামগুলি এক্ষণে খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদিগের পরিবর্ত্তে অন্য নাম হইয়াছে।

৫। ভরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশে কৃত্তিবাসের জন্ম। কৃত্তিবাস পণ্ডিত লক্ষীধর হালদারের সমসাময়িক লোক। এবং জ্ঞাতি খুড়ুততঃ ভাই। লক্ষীধর হালদারের সময় সর্ব্বদ্বারি বিবাহ লোপ হয়। এই কালকে মেলসন্ধি বলে। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা। মুরারি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মুরারি শ্রীহর্ষ হইতে ২০ বিংশ পুরুষ অধস্তন। মুরারির পৌত্র লক্ষীধর হালদারেব সহিত কৃত্তিবাসের সমান পর্য্যায়। অর্থাৎ শ্রীহর্ষ হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ অধস্তন। কৃত্তিবাসেরা ছয় সহোদর। যথা—মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, মাধব, শান্তি, শ্রীকণ্ঠ, (চাকা) চক্রপাণি ও বলভদ্র। মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র মালাধব, মালাধরের সময় মেল বদ্ধ হয়। মালাধর স্বনাম-প্রসিদ্ধ, মালাধর খাঁনী মেল প্রাপ্ত হয়েন। কৃত্তিবাস মেল বন্ধনের পূর্ব্বের লোক, সুতরাং কৃত্তিবাস নিজ-রচিত কাব্যে মেলের উল্লেখ করিতে পাবেন নাই যথা——

বাঙ্গালা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।
স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ } অরণ্যকাণ্ড।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ } কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

৬। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের আদ্যোপান্ত বংশাবলীর মধ্যাংশ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষের উপরে মদনমোহন নাম দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ সংখ্যায় স্থিরতা নাই। তিনি ভুরুসিটে গ্রামে ভঙ্গ হয়েন। মদনমোহন, রামনৃসিংহ ও দ্যাকর। কাঁচানার মুখুটী এই নৃসিংহের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র বংশজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া নিজের বংশাবলীর বিশেষ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। কুলীনের কুলধ্বংস হইলে ঘটকেরা আর বংশাবলী লেখেন না। সুতরাং মদনমোহন অবধিই কুল-পুস্তকে দেখা যায়। সেই হেতু বশতঃ মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র রায় নিজবংশের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই। যথা—

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত কংস ভুরুস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভাবতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥ অন্নদামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র রায়ের বংশধরগণ মূলাজোড়ে অবস্থান করিতেছেন। বংশাবলী যথা—

ভূপতি রায়—ভারতের পিতামহ } ভুরুসুটে বাস।
|
নরেন্দ্র রায়—ঐ পিতা
|
ভারতচন্দ্র রায় মূল * } * ভারতচন্দ্র হইতে মূলাজোড়ে বাস।
|
(১) ভগবতীচরণ (২) অজ্ঞাত (নিঃসন্তান) (৩) রামতনু (পুত্রগণ।)
|
তারক (পৌত্র।)
|
অমরনাথ (প্রপৌত্র।)
|
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র (বৃদ্ধ প্রপৌত্র।)

৭। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর কৃত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিশেষ প্রসিদ্ধ॥ ইহাঁরা ফুলিয়া খড়দহ উভয় মেলে মিশ্রিত। ইহাঁর বংশাবলী অদ্যাপি উলা্য গ্রামে বিরাজ করিতেছে। যথা—

নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি গোষ্টীপতি পতি যারে বলে।
তাঁহার অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ ফুলে সার বশিষ্ট তুলনা যার জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তার শিব শিবা অবতার ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাহার তনয় দীন দুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ দয়া দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষা গান রচিবারে স্বপনে কহিলা ভগবতী॥
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার কথাগুলি রচিতে লাগিলা।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

৮। পাশ্চাত্য বৈদিককুলে ভরদ্বাজগোত্রে নিমাই বিশ্বম্ভর পরে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। ইহাঁর বিষয় সকলেই অবগত আছেন। ইনি সামবেদী বৈদিক-কুল-সম্ভূত শ্রীহট্টনিবাসী। নবদ্বীপে এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি রচিত হইবার সময় বিশ্বম্ভর এক খানি স্মৃতি রচনা করেন। তাহার রচনা এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে উহা প্রচারিত হইলে রঘুনন্দনের স্মৃতি কদাচ লোকসমাজে আদৃত হইত না। রঘুনন্দন অবসর বুঝিয়া চৈতন্য দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন অদ্য তোমার গৃহে ভোজন করিব। ভোজনকালে কহিলেন তুমি বল যে আমার স্মৃতি প্রচার বিষয়ে তুমি কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না। এবং ইহার

বিরুদ্ধে যদি তোমার কোন বিশেষ মত থাকে তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে ভোজন করিব নচেৎ ভোজন করিব না। চৈতন্য তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং নিজ-রচিত স্মৃতির প্রচার বিষয়ে হতাদর হইলেন। কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণির বিরুদ্ধেও এই কথা কহেন যে তাঁহার দিধীতি গ্রন্থ অপেক্ষা চৈতন্যের ন্যায়শাস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল শুনিয়া কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) চৈতন্যকে তাঁহার কৃত ন্যায়শাস্ত্র প্রচারে বিমুখ করেন! যাহাই হউক উভয় কথাতেই চৈতন্যের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' ইনি নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়াছেন।

৯। ভরদ্বাজ গোত্রে অদ্বৈত। ইনি শান্তিপুর-নিবাসী কুবের আচার্য্যের পুত্র। পঞ্চাননের পৌত্র। নৃসিংহ লাড়ুলীর অধস্তন সপ্তম * নৃসিংহ লাড়ুলী শ্রীহট্টের পাহাড়ে বাস করিতেন। তিনি বরেন্দ্র বংশের মধ্যে কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। নৃসিংহ লাড়ুলী নিজেও তাম্বুল বিক্রয় করিতেন। তদনুসারে তাঁহাকে দীনভাবে ও হীন মর্য্যাদায় কালক্ষয় করিতে হইত। তাঁহার কন্যা মধু মৈত্রে দানাবধি নৃসিংহ লাড়ুলীর বংশীয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় হয়েন। অদ্বৈত পরম পণ্ডিত ও কবি ছিলেন তাঁহার কৃত রচনা অনেক আছে। ইহাঁর বংশাবলী অতি বিস্তৃত। ইনিও রাঢ়ীয় নিত্যানন্দ উভয়ে মিলিয়া ছত্রিশ জাতি শিষ্য করেন। তদবধি এই দুই গোস্বামীরা কুলীনদিগের করে সম্প্রদান করিয়া সমাজে চলিতেছেন। কুলীন-পুত্রেরা গোস্বামীর দৌহিত্র সুতরাং কুলীনগণকে মাতামহের পাদুকা বহন করিতে হয়, তদপেক্ষা গোস্বামীর পক্ষে আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? অদ্বৈত ইত্যাদিরূপে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন।

অদ্বৈত প্রভুর বংশ যেখানে যেখানে আছে তাহা দেখ——

---

* শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামী মহাশয়েরা কহেন অদ্বৈতমঙ্গলের শিব নৃসিংহ লাড়ুলীকে কহিতেছেন যে আমি তোমার অধস্তন সপ্তম পুরুষে অদ্বৈতনামে জন্ম গ্রহণ করিব। রাজসাহী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত কলীতিহাস নামক লঘু ভারতে নৃসিংহ লাড়ুলীকে যে তিনি অদ্বৈত প্রভুর পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাঁরা তাহা ভুল বলিয়া থাকেন। কলীতিহাস কাপোপাখ্যান দেখ। সম্বন্ধনির্ণয়ের অদ্বৈত প্রকরণ কলীতিহাসের অনুসারে লিখিত।

স্থান।	জেলা।
১ শান্তিপুর—	জিলানবদ্বীপ
২ কুমারখালী	ঐ
৩ গোবরঘাট	ফরিদপুর
৪ গোপালপুর	ঐ
৫ নারায়ণপুর	ঐ
৬ দামুদে	ঐ পদ্মানদীর ধার
৭ চণ্ডীপুর	ঐ
৮ সলিমারী	ঐ
৯ মিলেপাড়া	ঐ
১০ মৈষেডাবা	ঐ
১১ বাহাদুরপুর	ঐ
১২ সালবাড়ী	ঐ
১৩ ছাওয়াল ভাটী	ঐ
১৪ খোসর পাড়া	মুর্সিদাবাদ
১৫ মৃজাপুর	ঐ
১৬ জিলাবাড়ী	মালদা
১৭ জিগাবাড়ী	ঐ
১৮ সেনপাড়া	ঐ
১৯ বাবলা	ঐ
২০ সেরপুর	বগুড়া
২১ গোঁসাইরামপুর	পাবনা
২২ গয়াসপুর	ঐ
২৩ ফুলবাড়ী	ঐ,
২৪ জাইপাই	পাবনা
২৫ হাড়িয়া	ঐ
২৬ স্থল	ঐ
২৭ হানাকুড়	ঐ
২৮ উথলী	ঢাকা
২৯ ঢাকা	ঐ
৩০ নাটাখোলা	ঐ
৩১ মালুমপাড়া	বর্দ্ধমান

এই সকল স্থানের অদ্বৈত সন্তান গণকে শান্তিপুরের গোস্বামীরা অদ্বৈত সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যত্রের লোক অদ্বৈত বংশের পরিচয় দিলে সহসা বিশ্বাস করেন না। আদোপান্ত পরিচয় দিতে হয়।

অদ্বৈতের বংশাবলী দেখ। অদ্বৈতের জননীর নাম লাভাদেবী।— অদ্বৈতের ছয় পুত্র যথা অচ্যুত, রূপ, জগদীশ, বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল দাস। অচ্যুত অকৃতদার, পিতার সঙ্গী— যথা "অচ্যুতের যেইমত সেই মোর সার। আর সব পুত মোর হৌক ছার খার॥"

অদ্বৈতবাক্য।

রূপ ও জগদীশ পিতৃপরিত্যক্ত। বলরাম পাল দাস ও কৃষ্ণমিশ্র স্বস্থানে ছিলেন!

কৃষ্ণমিশ্রের বংশাবলী শান্তিপুরে আছে। শান্তিপুরে অদ্বৈতের যত পুরুষ হইয়াছে তাহারই একাদেশ দেখান গেল। যথা

(১) অদ্বৈত

(২) কৃষ্ণমিশ্র

(৩) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী — দোলগোবিন্দ

(৪) যাদবেন্দু — মাধবেন্দু — (৪) চাঁদ — কন্দর্প — গোপীনাথ

(৫) রামদেব — জয়দেব — মদনগোপাল

(৬) নন্দকিশোর — আন্দীরাম — শ্যামচাঁদ — রসিকানন্দ

(৭) কুঞ্জবিহারী — রামশরণ

(৮) মোহনচন্দ্র (ইনি ষষ্ঠ) মোহনেরা সাত ভাই।

(৯) নবকান্ত (ইনি জ্যেষ্ঠ) অন্য তিনজন নিঃসন্তান।

(১০) রাধাকিশোর

(১১ যদুনাথ — মদনগোপাল

(১২) চিদানন্দ।

কোন কোন বংশে অদ্বৈত হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাও শ্রবণ করা যায়।

ক্রমশঃ।

মেহের আলি।

একাদশ অধ্যায়।

যে দ্বীপে ফকীর ছিল উহার অন্য নাম না থাকায় তাহাকে ফকীর-দ্বীপ বলিতে পারা যায়। সেই ফকীর-দ্বীপ মধ্যে অত্যুচ্চ এক স্থল আছে, তাহা দ্বীপের পশ্চিম কূলে। জাহাজ হইতেই ঐ স্থল দেখা যাইত, কেবল কএকটী বৃক্ষের অন্তরাল বশতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কূল হইতে এই স্থল অতি সন্নিকট। একদা অতি প্রত্যূষে

এই স্থলে দুই যুবা ক্ষুদ্র এক নৌকা বাহিয়া উপনীত হইলেন। উভয়ের হস্তে এক এক ছুরিকা। উভয়ে বদ্ধ-পরিকর হইয়া কি যেন সন্ধান করিতেছেন, জন্তু হউক মনুষ্য হউক কোন শীকার সন্ধান করিতেছেন। উভয়ে সেই উচ্চ বালু প্রান্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর এক জন বীর অপরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "সম্মুখ হইয়া দাঁড়াও আমাকে যুদ্ধ দাও।"

অপর যুবা হাসিয়া কহিলেন "কাজে কাজেই যাহাকে চাহ পাইলে না ত আর কি করিবে? যাহা হউক এখানে না থাকে চল সেই বটতলায় দেখিগে, বিলম্ব সহে না; পাষণ্ড আমাদের প্রাণনাশের পন্থা করিয়াছিল এবং ফকীর বেশে দস্যু-বৃত্তি করিয়া থাকে; তাহাকে কিছু দণ্ড দেওয়া আবশ্যক।"

১ম যুবা। তুমি আমার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইলে যথা ইচ্ছা যাইও ও যাহাকে ইচ্ছা দমন করিও, এখন আমাকে যুদ্ধ দাও।

২য় যুবা। কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহি-লেন "সে কি! তুমি ক্ষিপ্ত হইয়াছ না কি? যুদ্ধ আবার কেন? আমি এমন যুদ্ধ দেই না।"

১ম যুবা এই কথায় সহসা দ্বিতীয় যুবার উরুদেশে পদাঘাত পূর্ব্বক কহিল "ভীরু, দে, ইশ্বর আপন প্রাণ দে;" জানিস্ না তুই আমার পরম শত্রু; তোরই প্রাণনাশ জন্য আমি এতদূর এসেছি, আজ কখনই ছাড়িব না। কাপুরুষের ন্যায় স্বার্থ সাধন করিলে এত দিন করিতাম; কিন্তু যদিচ তুই অতি হীন ও অন্ত্যজের কার্য্য করিয়াছিস্, আমি অত নীচ হইতে চাহি না। তোর ও হস্তে যেরূপ অস্ত্র আমারও তদ্রূপ, আয় দেখি কাহার শোণিতের কত তেজ? কাহার শোণিতের কত পবিত্রতা?" বলিয়া মস্তকোদ্দেশে ছুরিকা প্রহার করিল।

অপর যুবা পদাঘাতে ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক ছুরিকা হস্তে দাঁড়াইয়া কহিল, "নিতান্তই যদি তোর কুবুদ্ধি হইয়াছে, আয় তোর বীরত্ব দেখি।" যুবা আত্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আততায়ী যে প্রহার করিল তাহা অনায়াসে বিক্ষেপ করিলেন। পরে উভয়ে ঘোরতর নিঃশব্দ যুদ্ধ হইতে লাগিল; কেবল মধ্যে মধ্যে অস্ত্রে অস্ত্রের আঘাত শব্দ ও যোদ্ধাদের পদ চারণ শব্দ উত্থিত হইল। কখন কখন যোদ্ধাদের উভয় অঙ্গে ও কখন বা পার্শ্বস্থ তরুশাখায় অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। উভয় অস্ত্র রক্তাক্ত এবং উভয় দেহও ক্ষত বিক্ষত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথম যুবা বলিলেন, "আমি বেন্‌কাটী চারিলু, আমার সহধর্ম্মিণীর তুই ধর্ম্মনাশ করেছিস্, তোর জীবন থাকিতে আমার ক্ষোভ যাইবে না। যে রমণীর সতীত্ব দস্যু-ভাবে হরণ করে, সে কি ঘৃণ্য কাপুরুষ!"

এই কথায় সহসা স্তম্ভিত হইয়া অপর যুবা কহিলেন, "যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, আর

নহে—আমার কথা শুন, আমি তোমার শত্রু নহি। চারিলু। তোমার পত্নীর সতীত্ব কেহ নাশ করে নাই; এবং আমি যথার্থই শঙ্কর সিংহের স্ত্রী ব'লে তাহাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম; কিন্তু যাথার্থ্য প্রকাশে নিতান্তই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি।"

চারিলু কহিলেন "আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আর যদিচ তাহা সত্য হয় এতদিন অসহায়া যুবতী রমণী তোমার কাছে আছে তাহাকে কি অক্ষত রেখেছে?"

অপর যুবা আর কেহ নহে, মেহের আলি। মেহের কহিলেন, "হাঁ তিনি অক্ষত আছেন।" চারিলু কহিলেন "কাপুরুষ! একথা প্রাণ-ভয়ে বলিতেছিস্,—কখনই তাহা সম্ভব নহে। আয় যুদ্ধ করি।"

মেহের নিজ অস্ত্র ভূমে ফেলিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলেন ও কহিলেন 'আমি অজ্ঞাতে হউক—অনিচ্ছায় হউক—দুষ্ট শঙ্কর সিংহের দুরভিসন্ধিতে হউক—তোমার পত্নীকে অপহরণ করাইয়াছি; তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে ও তোমার কাছে অপরাধী হইয়াছি, এবং এই অপরাধ জন্য যদি আমাকে নাশ করিয়া তোমার ক্ষোভ যায় আমি বাধা দিতে চাহি না। আমি কখনই যুদ্ধ করিব না। চারিলু অস্ত্র ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া নিষ্ফল হইলে কহিলেন "নিতান্তই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যদি প্রাণ দিবে এস—আমার অপরাধ নাই" বলিয়া মেহেরের বামহস্তে অস্ত্রাঘাত করিল। অস্ত্রাঘাতে ঝুঁঝিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেহের ঈষৎ হাসিয়া নীরব রহিলেন।

চারিলু লজ্জিত হইয়া এবং নিরস্ত্র সমকক্ষের উপেক্ষাদৃষ্টিতে চমকিতহইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "মেহেরআলি! শপথ করিয়া বলিতে পার আমার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হয় নাই"। মেহের কহিলেন "পারি, এবং তুমি এতদিন যে জাহাজে ছিলে তাহার কি কোন চিহ্ন দেখ নাই? একভ্রমে আমি তাঁহার সর্ব্বনাশ করেছি, আর তাঁহার ক্ষতি করিতে কি আমার মন চায়? তিনি নিজে কতবার নিষেধ করেছেন—তথাপি কতক্লেশে তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু পৃথক্ আহার পৃথক্ পাক ও পৃথক্ বাস সংরক্ষণ করেছি—দেখনাই?"

চারিলু বিশ্বস্ত হইয়া অপ্রস্তুত হইলেন এবং আপনিও নিরস্ত্র হইয়া মেহেরকে কহিলেন "মেহের! ভাই! অপরাধ করেছি ক্ষমা কর। আমি মনে করেছিলাম যে তুমি যথার্থ দস্যু এবং শঙ্কর সিংহ নিরপরাধী, এখন বুঝিতেছি তোমার দোষ নাই—শঙ্কর সিংহ সকল অপরাধের মূল।" মেহের কহিলেন "শঙ্করসিংহকে পাইলে আমি আপন প্রতিশোধ লই, তাহারই জন্য আমি এতদূর এসেছি, সে আমাদের উভয়েরই শত্রু।" উভয়ে পরস্পর [illegible] বন্ধন করিয়া আস্তে ২ নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিলেন।

পরক্ষণেই ঐ যুদ্ধস্থলে আসগর আলি, ফজর আলি, শঙ্কর সিংহ ও চারিলুর সঙ্গী ব্যক্তি আসিয়া রক্ত-চিহ্ন ও ছুরিকা দৃষ্টে ইতস্তত অনুসন্ধান করিল, কেহ আছে কিনা। চারিলুর সঙ্গীর নাম দুর্গাপতি। দুর্গাপতি কহিল "উহারা এত প্রত্যুষে আসিবে জানিতে পারি নাই,—হয়ত এক-জন বিনষ্ট ও একজন জাহাজে গিয়াছে—কিম্বা উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। জাহাজে গেলেই জানা যাইতে পারিবে।"

আসগর। দুর্গাপতি! মেহের চারিলু ত আন্দামানে গিয়াছিল, জাহাজেই বা কিরূপে আসিল এবং এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কি পরামর্শ হইল বল দেখি, ভবিষ্যৎ উপায় স্থির করি।

দুর্গাপতি। চারিলু আমাকে বিলক্ষণ বিশ্বাস করেন ও তাবৎকথা বলিয়াছেন। আপনার আদেশে আমি চারিলু ও মেহের আলিকে সেদিন এখানে আনি এবং আপনারই সঙ্কেতে জাহাজে গিয়া বলি উহাঁরা পশ্চিম দিক্ দিয়া উঠিবেন। জাহাজ তথায় গেল, সহজে কি যায়? আমি বলিলাম ঐ দিক্ দিয়া যাতায়াতের সুবিধা হইবেক। আন্দামানের দিকে যাইতে বলেছিলাম উহারা গেলনা,—কিন্তু এই জন্যই যখন উহাঁরা ফিরে এলেন—আমার প্রতি সন্দেহ না করে বুঝিলেন আমি তাঁহাদের অনুসন্ধান জন্য জাহাজকে আন্দামান যাইতে বলিয়াছিলাম।

শঙ্কর সিংহ। আন্দামান হইতে উহারা কবে কিরূপে আসিলেন? তথায় রাক্ষসের ভয় জানিয়াই ফকীরজী তাঁহাদের পাঠান।

দুর্গা। হাঁ রাক্ষসে উঁহাদের এক অগ্নি কুণ্ডের নিকট বাঁধিয়াছিল, উহারা কিন্তু গড়াইয়া গড়াইয়া অগ্নি দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদ করত পরস্পর বন্ধনমুক্ত হয়েন এবং রজনীতেই রাক্ষসেরা পুনরাগমন করিতে না করিতে নৌকা চালাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে জাহাজ দেখিয়া জাহাজে উঠিলেন।

আসগর। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরামর্শ কি হইল?

দুর্গা। চারিলু বলিলেন "মেহেরকে এত কৌশল করে ধরা আবশ্যক নাই, আমি নিজেই তাহার প্রাণবধ করিব, কাপুরুষের ন্যায় নহে, যুদ্ধে।" আমি কহিলাম যদি আপনার অত্যাহিত হয়। তিনি হাসিলেন ও কহিলেন "এই ভুজ দ্বয়ে কি বল নাই? আর সত্যের, ধর্ম্মের কি পরাজয় আছে?" আমি কহিলাম সাবাস সাবাস!

ফজর। অদ্য এখানে কিরূপে আসিল?

দুর্গা। চারিলু আমাকে কহিলেন "বন্ধু একটী পরামর্শ দিতে পার কিসে মেহেরকে অসন্দিগ্ধচিত্তে দ্বীপে লইয়া যাইতে পারি?" আমি কহিলাম "সহজ সহজ! মেহেরকে বুঝাও যে ফকীর দুরভিসন্ধি করিয়া আপনাদিগকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছে—তাহার প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক, সে অবশ্য দস্যু হইবে। এবং তাহার শাসন জন্য উভয়ে অস্ত্র লইয়া দ্বীপে যাইবেন।"

ফজর। বেশ পরামর্শ দিয়াছিলে। যদি দুই জনে চাচাকে পাইত সর্ব্বনাশত করিত ?

দুর্গা। সেই জন্যত গত রজনী শেষ হইতে না হইতে বিশেষ প্রয়োজন ব'লে দ্বীপে আসিলাম ও ফকীর জীকে সতর্ক করিলাম। মনে করেছিলাম আমরা সকলে অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ দেখিব এবং যদি মেহেরের জয়ী হইবার উপক্রম দেখি সকলে পড়ে তাহাকে বধ করিব।

আসগর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আল্লা! এমন দিন কি হইবে? আঃ আর কতকাল এই বৃদ্ধ বয়সে দুস্‌মন্ সঙ্গে বেড়াইব? দুর্গাপতি যদি একটু অগ্রে সংবাদ দিতে। বিসমুল্লা!—আসগর দাড়ী ধরিয়া ঘাড় কাঁপাইলেন।

শঙ্কর সিংহ। এখনও যাবে কোথা, দেখ দেখি উহারা জীবিত আছে কি নাই।

সকলে সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে আসগর দুর্গাপতিকে কহিল—জাহাজে সন্ধান লও। দুর্গাপতি জাহাজে গেল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল যদি যোদ্ধাদের কাহারও শরীর প্রাপ্ত হয়। বেলা এক প্রহর হইলে দুর্গাপতি ফিরিয়া আসিল। তাহার বদনে মলিনতা চিহ্ন দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইল। দুর্গাপতি কহিল "পলাও পলাও, নিস্তার নাই।"

সকলে কিছু না কহিয়া এক দূরস্থ নিভৃততম জঙ্গল উদ্দেশে পলাইল এবং তথায় দুর্গাপতি বলিল, "আমি জাহাজে গিয়া জানিলাম চারিলু ও মেহেরআলি উভয়ে রক্তারক্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন, বন্য জন্তুতে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত করেছে—জাহাজে জনরব। দেখিলাম উভয়ে এক কক্ষে শয্যায় শায়িত। আমি দেখিয়া দুঃখ ও অনুভূতি প্রকাশ করিলাম ও কারণ জিজ্ঞাসু হইলাম। মেহের নিদ্রিত ছিলেন। চারিলু কহিলেন "বন্ধু ইহার কারণ আমাদের ভ্রম। মেহের আমার শত্রু নহেন যথার্থ শত্রু শঙ্কর সিংহ। যদি তাহাকে দেখাইতে পার পরম উপকার লাভ হইবেক।" আমি কহিলাম "তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? আপনার মনে নাই ফকীর কহিয়াছিল মেহের আলি যাহাকে 'সন্ধান করেন, সে ঐ চড়ে আছে? শঙ্কর সিংহ সেই ত উনি সন্ধান করিতেছিলেন।"

এ কথায় চারিলু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দুর্গাপতি তুমি নিতান্ত ভুলিয়াছ, সেই ফকীর প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী ও দস্যু; তাহার কথাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছিল।" আমি কহিলাম "হ'তে পারে কিন্তু বোধ হয় শঙ্কর সিংহকে এই চড়ে আমি দেখেছিলাম। ঐ ফকীরের সঙ্গে সেও থাকিতে পারে।"

শঙ্কর। বিলক্ষণ তুমিত মজার লোক!

ফজর। কি আশ্চর্য্য! তুমি কেবলই আমাদের দলের সর্ব্বনাশ করিতে আছ।

দুর্গা। না ভাই! আমি তা হলে তোমাদের বলিতে আসিব কেন?

ফজর। এমন তোমার বলেই বা লাভ কি? তুমি কেন একথা বলিলে?

দুর্গা। আমার অভিপ্রায় শুন তার পর রাগ করিও?

আসগর। কি অভিপ্রায়?

দুর্গা। আমি মনে করিলাম এই লোভে উহারা আমার সঙ্গে দ্বীপে আসিবে এবং তোমাদের পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করে রেখে উহাদের প্রাণ বিনাশ চেষ্টা করিব। এজন্য আমি বলিলাম "চারিলু! মহাশয় যদি আপনারা একদিন আমার সঙ্গে আসেন শঙ্কর সিংহকে দেখাইয়া দিতে পারি।" এই কথায় চারিলু মেহেরকে ডাকিয়া কহিলেন—"মহাশয়! শঙ্কর সিংহের সন্ধান পাওয়া গেল—এই চড়ে আছে।" মেহের সুপ্তোত্থিত হইয়া শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না। পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া সারেঙ্গকে ডাকাইলেন ও সারেঙ্গ আসিলে কহিলেন—"সারেঙ্গ! আমাদের অমঙ্গলের হেতু একমাত্র শঙ্কর সিংহ—সে এই চড়ে আছে,—এক্ষণে লোক লইয়া তাহাকে ধরিয়া আন এবং ফকীর ও তাহার দল আমার শত্রু, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবে, দুর্গাপতি তোমাদের পথ দেখাইবে।" মাল্লারা সসজ্জ হইয়া চড়ে আসিল—আমাকে অগ্রে পাঠাইল, আমি সংবাদ দিতে অগ্রসর এসেছি।

ফজর। বেশ! এখনও একথা বল নাই আমরা ৪। ৫ জন বৈত নয়—আক্রমণ করিলে উপায় কি?

দুর্গা। তাহাদের জোট হইতে দেরী আছে—আপনারা আপনাদের জাহাজে উঠুন, বলে এদিকে জাহাজ আনাইলাম।

সকলে তীরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং যাইতেছে এমত সময়ে শব্দ শুনা গেল। স্থির হইয়া শুনাগেল,

"দুর্গাপতি হই হো ও ও ও। কি ধার গিয়া হো ও ও ও।"

সকলে দুর্গাপতিকে নীরব থাকিতে বলিল ও ঊর্দ্ধশ্বাসে তটাভিমুখে চলিল। পরে দ্বীপের উচ্চভাগ হইতে শব্দ হইল।

"দুর্গাপতি হই, উল্লুক, কাঁহা তেরী শঙ্কর সিং আউর ফকীর।" পুনঃ দুর্গাপতি নীরব রহিল এবং দলবল নৌকায় উঠিল। দুর্গাপতি, তখন ফিরিয়া শুনিল, "ভালা! কিস্‌কো নেক্রি মিলে তোম্‌কো লেঙ্গাউঙ্গা, জুয়াচোর!" ঐ কথা শুনে দুর্গাপতির ভয় হইল—নৌকাবাহীদের ডাকিল তাহাকে লয়ে যায়—তাহারা এল না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

দুর্গাপতি অনেক কৌশল করিল যে তিনি শঙ্কর সিং ও ফকীরকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে অনুসরণ করিতেছিলেন পরে তাহারা নৌকা বাহিয়া গেল। মাল্লারা তাহা বুঝিল না তাহাকে জুয়াচোর বলিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। একে দ্বিপ্রহর রৌদ্র তাহাতে অনাহার ও নিষ্ফল যাত্রা, মাল্লাদের আক্রোশ দেখে কে? দুর্গাপতি যথোচিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বন্দীবেশে মেহেরআলির কাছে নীত হইলেন।

দুর্গাপতি কাপুরুষ, কাপুরুষ না হইলে কি কেহ গুপ্তচর হইতে পারে? প্রাণ নাশ আশঙ্কায় মেহেরআলির পদানত হইল এবং কহিল "আমাকে ক্ষমা করেন ত আমি সকল কথা জ্ঞাপন করি। সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ করি।"

মেহের। তথাস্তু, ভয় নাই, কি বল। তোর ক্ষুদ্র প্রাণ মেরে আমার কি হইবে? দুর্গাপতি কহিল "মহাশয়! আপনি বড়ই সদাশয়! আমি নিতান্ত অর্থগৃধ্নু তাই একর্ম্মে প্রবেশ করেছিলাম—এক্ষণ বিলক্ষণ জ্ঞান পাইলাম। জন্মে ভুলিব না।" মেহের ও চাবিলু পরস্পর চাহিলেন ও মেহের কহিলেন "কি হইয়াছে সব বল ত ক্ষমা করিব নচেৎ নহে।"

দুর্গা। "মহাশয় আর গোপন করিবা কি হইবে?" দুর্গাপতি আদ্যোপান্ত ইতিহাস কহিতে লাগিল।

"মহাশয় আমার বাটী মসুলীপট্টনের কিঞ্চিৎ উত্তরে। আমাকে এক দিন এক জন অর্থাগমের উপায় বলিয়া এক মোসলমানের কাছে লইয়া যায়। মোসলমান মসুলীপট্টনের বন্দরে এক জাহাজে ছিল, তাহার নাম পরে শুনিলাম বকিমুন্নিসার জাহাজ।"

মেহের শিহরিলেন ও কহিলেন "অধিপতি কে?"

দুর্গা। শুনিলাম—আসগর আলি নামক এক মুসলমান।

মেহের, অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন।

দুর্গা। আসগর আলি আমাকে অনেক অর্থ দিয়া ক্রমে বশ করিয়া কহিলেন "সে দিন যে মকদ্দমা হইল—বেন্ কাটী চাবিলু, জান?" আমি কহিলাম "জানি।" "তাহাকে বল যে মুসলমান যুবা তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে ও সতীত্ব নাশ করিয়াছে—তাহার যদি দণ্ডাকাঙ্ক্ষা থাকে এই পরামর্শ করে।" "কি?" "সে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে সদাগর হইয়া মেহের আলির জাহাজে উঠে এবং তাহাকে বলিয়া কহিয়া আন্দামানের এই দ্বীপের নিকট আসে। তথায় এক ফকীর আছে সেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ করিবেন।"

চাবিলু। হাঁ সত্য বটে আমাকে এই রূপে এই পাষণ্ড লওয়াইয়াছিল।

দুর্গা। শঙ্কর সিংহ ঐখানে গিয়াছে, মেহেরকেও অন্য লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া আসগর আমাকে চাবিলুর সঙ্গী করেন। আমি আন্দামনে আসিয়া দ্বীপে আসগরকে ফকীর বেশী ও শঙ্কর সিংহকে দেখিলাম। মেহের আপন হৃদয়ে হস্ত দিয়া আকাশ পানে চাহিলেন ও চাবিলুকে কহিলেন "পরে জানিবেন ঐ আসগর আমার বিষম শত্রু।"

দুর্গা। আসগরের পরামর্শে আমি আপনাদের ফকীরের কাছে লইয়া যাই। ফকীর উভয়কে বিপদে ফেলিবার জন্য জাহাজ অন্য স্থলে রাখাইতে আমাকে সঙ্কেত করেন এবং স্বয়ং উভয় যুবাকে নির্জীব করিতে চেষ্টা করেন। চাবিলু মহৎ লোক, নীচ ভাবে আমাদের সহিত

যোগ দিবেন না জেনে আমরা উভয়কে দুর্ব্বল করিতে সচেষ্ট ছিলাম।"

চাবিলু ও মেহেব পরস্পব তাকাইলেন।

দুর্গা। পবে যখন আপনাবা আন্দামান হইতে নিরাপদ আসিলেন, আমিই চাবিলুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উৎসাহ দেই; এবং লওয়াই।

চাবিলু। এখন দুরভিসন্ধি বুঝিতেছি কিন্তু আমাব নিজেবও ঐ অভিপ্রায় ছিল।

দুর্গা। "পবে আপনাবা যুদ্ধে যাইবাব অগ্রে আমি আসগর কে সংবাদ দেই ও আমবা সকলে ৫ জনে যুদ্ধস্থলে আসি, যে কোন মতে মেহেবকে বধ কবিতে পারি।"—মেহেবকে দেখিয়া কহিলেন "গোলাম পদানত ক্ষমা করুন।" মেহেব রোষ দমন কবিয়া কহিলেন "বল বল।"

চাবিলু। ৫ জন কে কে ছিলে?

দুর্গা। আসগব আলি ফকীব, আমি, শঙ্কব সিং, ফজর আলিও আর একটী নাম জানি না।

মেহেব হাঁসিযা কহিলেন "এত লোকেও আমাদের মাবিতে সাহস হইল না?"

দুর্গা। মহাশয়। আপনাদেব তেজ দেখে ভয হয়। যাহা হউক আমবা আপনাদের না দেখে ও বক্তাক্ত ছুবিকা দেখে ভাবিলাম, আপনাদের কেহ মবিযাছেন। পরে আমি জাহাজে প্রকৃত সংবাদ পাইয়া চেষ্টা করিলাম যাহাতে পুনশ্চ আপনারা ঐ দ্বীপে যান, যে আমাদেব ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হয়। তাহাব ফল এই হইল—এখন আমাকে মারুন আর কাটুন।

মেহের। তাহাবা কোথা গেল?

দুর্গা। আপন জাহাজে উঠিল—আমি ডাকিলাম তথাপি আমাকে লইল না।

চাবিলু। "খুব হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

মেহেব। জাহাজ কোন্ দিকে গেল জান?

দুর্গা। জাহাজ গঞ্জাম যাইবে কহিল—কারণ আমাকে বলিয়াদিল যে শঙ্কর সিং গঞ্জাম গেল বলিবে ও আপনাদের সেই থানে লইয়া যাইতে বলিল।

মেহেব কহিলেন "দুর্গাপতি, তোমাব অপবাধ কঠিন, কিন্তু অভয় দিয়াছি ভয় নাই।" পবে সাবেঙ্গকে ডাকিয়া কহিলেন মাস্তুলে লোক উঠাইযা দেখ আব একটী জাহাজ দেখা যায় কি না ও কোন্ দিকে যাইতেছে। ঘবে এই দুষ্টকে কএদ বাখ কষ্ট দিও না তবে ছাড়িয়াও দিও না। দুর্গাপতি ভয-কম্পিত হইয়া আপন ভাগ্য জিজ্ঞাসা করায় মেহেব কহিলেন "ভয় নাই তোমাকে গতপ্রাণ কালসর্পেব ন্যায় জঙ্গলে ছাড়িয়া দিব।" "তাহা হইলেও ত মবিব।" "আচ্ছা নয় হিন্দুস্থানের কোন গ্রামে ছাড়িয়া দিব।"

চাবিলু-পত্নী উভয় আহত ব্যক্তিবই রোগেব সেবা কবিতেন—চাবিলু বড় সেবা লইতেন না। চাবিলু একটু সুস্থ হইলে একদিন মেহের আলি তৎপত্নীকে কহিলেন "চাবিলু পত্নী, এই আমার বন্ধু কে এবং আমারা উভয়ে কেন আহত হইলাম জানেন?" চাবিলু-পত্নী আশ্চর্য্য হইয়া

কহিলেন "কেন, উনি এক সদাগর এবং আপনারা উভয়ে চড়ে বন্যজন্তুর আঘাতে আহত হইয়াছেন।" মেহের হাসিয়া কহিলেন "না।"

চারিলুপত্নী। তবে কি?

মেহের। আমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে আহত হয়েছি।

রমণী শিহরিয়া উঠিলেন।

মেহের।—আর উনিই আপনার স্বামী বেন্‌কাটী চারিলু।

রমণী একবার চারিলুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ও পরক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য আসিয়া জল সেচন ও বীজন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রমণী আপন স্বামীর চরণে মস্তক দিয়া অজস্র কাঁদিতে লাগিলেন। চারিলু কহিলেন "যাহা হইবার হয়েছে তোমার কপাল ও আমার কপাল।" মেহের উঠিয়া অন্যত্র গেলেন এবং চারিলুকে কহিলেন "মহাশয়! আমার এক অনুরোধ—প্রতিজ্ঞা করুন আপনি রমণীর প্রতি কোন অহিতাচার করিবেন না।" চারিলু কহিলেন "না এখন না।" "কখন?" "শঙ্কর সিংহকে দমন করে, বৈর-নির্যাতন করে, তার পর।" "তাহাও হইবে না আপনি জানুন আমার কি আপনার স্ত্রীর কণামাত্র দোষ নাই।" চারিলু কহিলেন "পরের কথা।"

এতক্ষণ রমণী ক্রন্দন স্রোতে ভাসিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন "প্রভু কপাল ভাঙ্গিয়াছে ত আমার একা ভাঙ্গুক আপনি কেন আর এ হতভাগিনীর নিমিত্ত দুঃখভাগী হয়েন? কেনই বা আপন প্রাণ সংশয় করেন এবং নিরপরাধী ব্যক্তির আততায়ীহয়েন।"

চারিলু। নিরপরাধী কে?

পত্নী। মেহেরআলি?

চারিলু! কিসে?

পত্নী। শঙ্কর সিং দুষ্টামী করে আমাকে ধরায়, এবং তাহার প্রবঞ্চনা জানিয়াই মেহেরআলি যৎপরোনাস্তি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত আমাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন।

চারিলু। সত্য বল—তোমার সতীত্ব—

পত্নী। আপনি গুরু আপনার অঙ্গ স্পর্শে দিব্য করিতেছি কোন পর পুরুষ আমাকে স্পর্শও করিতে সাহস পায় নাই।

চারিলু। সত্য?

পত্নী। চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষাও সত্য?

চারিলু। আচ্ছা তোমার মনে সতীত্ব ছিল কি না আছে কি না?

রমণী পুনঃ পদানত হইয়া কহিলেন অপরাধ মার্জ্জনা করেন ত বলি; আপনার কাছে কিছুই অগোচর রাখিব না। আর ভয়ই বা কি? আপনি আমাকে বিনাশ করিলেত আমি বাঁচি।

চারিলু। কি হইয়াছে বল? কেহ যদি অত্যাচারকরিয়া থাকে তাহার দণ্ড না দিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।

পত্নী। আমার শরীর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ; কিন্তু মন তত নহে।

চারিল্। সে কি?

পত্নী। বলিতে কি, আমি মনে করিলাম যে আর আমাকে তুমি লইবে না, আমাকে হয় মরিতে হইবে নয় কষ্টে জীবন-যাত্রা করিতে হইবে। পাছে কেহ আমার সতীত্ব নাশ করে এবং আমি সাধারণ লোকের ক্রীড়ার বস্তু হই এই ভয়ে মেহেরকে বিবাহ করিতে চাহি।

চারিল্ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলেন।

পত্নী। কিন্তু তিনি বিবাহ করিবেন না—আমাকে চিরকাল আপন ধর্ম্মে ও ইচ্ছায় সংরক্ষিত রাখা তাঁহার সঙ্কল্প জানিয়াছ।

চারিল্। এখন তোমার ইচ্ছা কি?

পত্নী। ইচ্ছা অতি উচ্চ কিন্তু সাহস হয় না।

চারিল্। কি?

পত্নী। যদি আপনি গ্রহণ করেন।—

চারিল্ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি উহঁাদের আর কথা হয় নাই, কিন্তু চারিলু-বধূর শেষ শুশ্রূষা ও সুনীতি দেখিয়া বেন্‌কাটীর হৃদয় অনেক নম্র হইল। গঙ্গাম যাইতে না যাইতে তাঁহার অনেকবার ইচ্ছা হইল—জাতি যাউক আর থাকুক—আপন পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ করেন। অবশেষে তাহাই হইল—এবং গঞ্জামে চারিল্ ও তৎপত্নী মেহের আলির নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং মেহেরও এই গুরু ভার হইতে মুক্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লুৎফউন্নিসার এই হৃদয় প্রতিঘাতে আর একটি ধর্ম্মোপদেশ নিহিত আছে। সে ধর্ম্মোপদেশ যদিও সামান্য, কিন্তু বঙ্কিমবাবু তাহা এরূপ উদ্দীপক বাক্য-পরম্পরায় এবং উপযুক্ত অবসরে সেই রমণীরত্নের মুখ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন যে তাহা নিতান্ত পুরাতন হইলেও আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করে। আমরা আর একবার লুৎফউন্নিসার দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হই। তাঁহার হৃদয়ের অনুতাপে আর একবার গলিয়া যাই। আর একবার পাপ-পথে ঘৃণা জন্মে। ঘৃণা জন্মে কেন?—লুৎফ-উন্নিসার জীবিত ও দগ্ধীভূত হৃদয়ের অনুতাপ দেখিয়া। বোধ হয় তাঁহার হৃদয় যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, সুবর্ণপ্রায়

উজ্জ্বলিত বিভায় ধর্ম্মজীবনে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়-প্রতিঘাত তদীয় হৃদয়ে এই অনুতাপ আনিয়াছে। এই দেখুন সেই অনুতাপ-পাবকে তাঁহার হৃদয় কেমন বিগলিত হইয়া পবিত্র হইতেছে!

"অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এতদূর করিলাম তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই তো পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করিলাম। যে ইন্দ্রিয়ের জন্য আর সকল ভোগই বিসর্জ্জন করিতে পারি, সে ইন্দ্রিয়ও অবাধে পরিতুষ্ট করিয়াছি। এত করিয়াও কি হইল? আজি এই খানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্ত জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্যে? এসকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন একদিনের তরেও সুখী হইতাম।

* * * * * * * *

তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুণের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুণ স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরা-ধমনী-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই?"

এই অনুতাপ-বাক্য-পরম্পরায় মতিবিবির হৃদয়-ভাব কেমন স্ফটিকবৎ প্রতীত হইতেছে! তাঁহার এই অনুতাপ দেখিয়া আমাদিগেরও ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। আমরা ভাবি যিনি লুৎফউন্নিসার ন্যায় বিলাসপথে আশার উচ্চ শৃঙ্গে উঠিতে যাইবেন, তাঁহাকে এক দিন লুৎফউন্নিসার ন্যায় অবশ্য কাঁদিতে হইবে। তিনি সম্পদ ও গৌরবের আস্পদ হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সুখ-সম্ভোগে তিনি বঞ্চিত থাকিবেন। পাপপথে যে কিছুই সুখ নাই, লুৎফউন্নিসা তাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

লুৎফ-উন্নিসা এই পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথে যাইলেন। সে কার্য্যের পরিণাম পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা একবার যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন তিনি সে পথ সহজে পরিত্যাগ করিবার পাত্রী নহেন। নবকুমার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি সহজে নবকুমারকে ছাড়িবার নহেন। তিনি

নবকুমারের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। বিসর্জ্জন দিয়া যে সংকল্পে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার তিনি একশেষ না করিয়া কখনই ছাড়িবেন না। তাঁহার চরিত্রে এই অটল অধ্যবসায়, ও উদ্যোগ সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান। তিনি আগ্রার সিংহাসনও সহজে ছাড়েন নাই। সেই সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষিনী হইয়া তাহা লাভার্থ তিনি কখন যত্নের ত্রুটি করেন নাই। যাহা তিনি ধরিতেন তাহাতে সিদ্ধ হইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন—এই তাঁহার চরিত্রের একটি অমূল্য গুণ। বুদ্ধিমতী ও কৌশলময়ী লুৎফ-উন্নিসা সম্পূণ উদ্যোগিনীও ছিলেন।

কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানে এই মতিবিবির চিত্র যেমন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, এমত কাহারই নহে। মতিবিবির চিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত, কপালকুণ্ডলার চিত্র বর্ণে মৃদুরঞ্জিত। মতিবিবির চিত্র সুস্পষ্ট উজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার চিত্র অস্পষ্ট মলিন। একের চিত্রে উজ্জ্বলতা আছে, অন্যের চিত্রে মৃদু মাধুরী আছে। একের চিত্রে সরলতা আছে, অন্যের চিত্রে বৈচিত্র্য আছে। মতিবিবি প্রভাময়ী, কপালকুণ্ডলা মুগ্ধকরী। মতিবিবির চিত্রে তুলিকারেখা বর্ণগৌরবে অলক্ষিত, কপালকুণ্ডলার চিত্র কতিপয় সরল রেখায় অঙ্কিত। মতি বিবি আমাদিগের মনে পূর্ণ বিভায় অঙ্কিত হয়েন, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনে ছায়ারূপে বিচলিত হইয়া বেড়ান। মতিবিবি কল্পনায় স্থির থাকেন, কপালকুণ্ডলা চঞ্চলভাবে এক একবার কল্পনাকে যেন বিমুগ্ধ করিয়া উদিত হয়েন। মতিবিবিকে কল্পনা স্থিরনয়নে দেখিতে পারে, তাহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে, তাঁহাকে আঁকিতে সাহসী হয়; কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে গিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে না, লিখিতে সাহস হয় না। একজন পার্থিব, অন্য জন কাল্পনিক। একজন মূর্ত্তিময়ী, অন্য জন ভাবময়ী। মতিবিবিকে এই জন্য অনেক সম্পূর্ণ দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য অনেক অসম্পূর্ণ দেখায়। মতিবিবি সুনিপুণ চিত্রকরের মূর্ত্তি, কপালকুণ্ডলা কবির কল্পনাময়ী মূর্ত্তি মতিবিবিকে কবি চিত্র করিয়াছেন, কপালকুণ্ডলাকে কবি কল্পনা করিয়াছেন। মতি বিবি কল্পনাকে পূর্ণ করেন, কপালকুণ্ডলা কল্পনায় ধারণা হয় না। এই জন্য মতিবিবিকে প্রকাণ্ড দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। মতিবিবি পার্থিব সুন্দরী, পৃথিবীকে গুণ-গৌরবে ও রূপ-প্রভায় আলোকিত করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলা সুরসুন্দরীরূপে মেঘাবলীর মধ্য হইতে যেন দেখা দিলেন, ক্ষণিক পৃথিবীকে মোহিত করিয়া আবার মেঘাবলী মধ্যে যেন অদৃশ্য হইলেন। মতিবিবির পার্থিব রূপ-রাজ্য পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিয়াছে, কপালকুণ্ডলা ক্ষণিক উদিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার রূপ-গরিমার যেন ক্ষণপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমবাবু মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে যে চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকদূর আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই দুই ললনারত্নের আপেক্ষিক ভাব ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেও ত্রুটি করি নাই। মতিবিবিকে গ্রন্থকার যে স্থলে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মতিবিবির জীবন কাব্যের এক নূতন সর্গের প্রারম্ভ মাত্র। কল্পনা এই সর্গকে প্রবৃদ্ধ করিতে চাহে। প্রবৃদ্ধ করিতে গিয়া তাহাকে কতপ্রকার নূতন ভাবে ও প্রেমময় সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ করে। মতিবিবিকে আমরা বাঙ্গালিনী পদ্মাবতী রূপে পুনর্জ্জীবিতা দেখি। তথাপি মতিবিবিকে লাভ করিতে ভয় হয়, কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিতে ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু মনে হয় কপালকুণ্ডলা সংসারাশ্রমের সুযোগ্যা পাত্রী নহেন। মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা উভয়েই অদমনীয়া ও সাহসিনী। মতিবিবি স্বীয়-তেজস্বিতায় সাহসিনী, কপালকুণ্ডলা অজ্ঞানতায় সাহসিনী। ইহাঁরা কেহই যেন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার নহেন, যেন স্বাধীন ও দুর্দ্দান্তভাবে বেড়াইতে চান। কিন্তু ইহাঁদিগের এই চরিত্র-সাদৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার পরিণাম। দুই জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া এক স্রোতে মিশিয়াছেন। মিশি-য়াই, ইহাঁদিগের উভয়েরই এমন স্বাধীন ভাব আছে, যে একত্রে কিছুকাল থাকিবার নহে। দুই স্রোত দুই দিকে প্রবাহিনী রূপে চলিয়া গেল।

কপালকুণ্ডলার উপন্যাস চিত্রে এই দুই অদম্যমনীয়া রমণীর অপর পার্শ্বে কাপালিক গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া রোষভরে যেন কটাক্ষপাত করিতেছেন। তাহার নিকট যেন ইহাদিগের শাসনদণ্ড রহিয়াছে। তাহার নিকটস্থ হইতে ভয় হয় তাঁহার মূর্ত্তি কি ভীষণ, তন্ত্রপ্রোক্ত ক্রিয়া কলাপ কি ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কঠোরতা ও মন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। সে মন্ত্রণার দারুণ নিষ্ঠুরতা হেতু, তাহা মতিবিবির মন্ত্রণার সহিত মিশিতে পারিল না। মতিবিবি তত নির্ম্মম হইতে পারিলেন না। এই কাপালিকের ভয়ঙ্কর চিত্র বঙ্কিম বাবু কেমন গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়াছেন। এই কাপালিকের সম্মুখে সাগর, চারিদিকে বনস্থলী, নিকটে শ্মশান ভূমি, সকলই ভয়ঙ্কর। তিনি সেই বনমধ্যে যেন দুর্জ্জয় শার্দ্দূলের ন্যায় বসিয়া থাকেন। মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে বলিদান দেন। তাঁহার গম্ভীর বাক্য ধ্বনি সাগর গর্জ্জনের ন্যায় বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি যখন নবকুমারকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছেন, এবং কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কর্ণে যখন বলিয়া গেল, "এখনও পলাও, এবং সেই কথা কাপালিক আকর্ণন করিয়া গম্ভীর ভাবে যেমন কহিলেন "কপাল-কুণ্ডলে!" তখন তাঁহার সেই স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ নবকুমারের কর্ণে এবং বনমধ্যে ধ্বনিত হইল। আবার দেখুন কি ভয়ঙ্কর চিত্র! "নবকুমার জিজ্ঞাসা

কহিলেন 'আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?'

কাপালিক কহিল 'পূজার স্থানে।'

নবকুমার কহিলেন 'কেন?'

কাপালিক কহিল 'বধার্থ।'

অতি তীব্র বেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছেন, তাহাতে সচরাচর লোকে হস্ত রক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গ মাত্রও হেলিল না—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাঁহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থি সকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। মুমূর্ষুর ন্যায় কাপালিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।"

আবার বলি কি ভয়ঙ্কর চিত্র। যম যেন নিজে নবকুমারকে মৃত্যুপার্শ্বে লইয়া যাইতেছেন।

বঙ্কিম বাবু উপন্যাসকারের যথারীতি অনুসারে এই কাপালিকের ইষ্টসিদ্ধি হইতে দেন নাই। কপালকুণ্ডলার দয়ার বারহারে নবকুমার মুক্ত হওয়াতে কাপালিকের কার্য্যকে অধিকতর ঘৃণার্হ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি ভঙ্গে পাঠক সন্তোষ লাভ করিলেন। কাপালিক তখন রোষ প্রজ্বলিত হইলেন। রোষ প্রজ্বলিত হইয়া একবার সাগরকূলে বৃহৎ বালিয়াড়ি স্তূপের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া ভীম কালাপাহাড়ের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, কোথা দিয়া শিকার ও কপালকুণ্ডলা পলাইয়াছে। কল্পনা এ চিত্রকে অনুমান করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়।

বঙ্কিম বাবু যখনই এই কাপালিককে দেখাইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে হয়তো এক ভয়ঙ্কর স্থানে, এবং এক এক ভয়ঙ্কর সময়ে উপস্থাপিত করিয়া আমাদিগের কল্পনাকে সহসা একেবারে আশঙ্কিত করিয়াছেন। এই কাপালিক যখন বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত, তখন দেখুন বঙ্কিম বাবু সহসা তাঁহাকে কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পাঠকের সম্মুখে আনিয়াছিলেন।

"কপালকুণ্ডলা দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। দ্রুত পদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে, দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন তাঁহার চিত্তভ্রান্তি জন্মিয়াছে। অতএব দ্রুত পদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলি

লেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহ প্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়াইলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল সেও যেন দৌড়াইল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ, এবং অশনিসম্পাত শব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গনভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গনের দিকে সম্মুখ করিলেন। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গন ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক!”

আর আমরা পাঠকের সম্মুখে এত বিভীষণ চিত্র ধরিতে চাহি না। তাঁহার নাম করিলেই আমাদিগের ত্রাস হয়, আমাদিগের কল্পনা ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। এই কাপালিককে অধিকতর ঘৃণার্হ করিবার জন্য কবি তাঁহাকে—নির্দ্দোষিণী, সরলা, দয়াশীলা কপালকুণ্ডলার বধার্থ সপ্তগ্রামে আনিয়াছেন। কাপালিক যখন সেই নির্দ্দোষিণী ললনারত্নের নিধন সাধনার্থ ফিরিতে লাগিলেন, তখন কাহার না রক্ত শিরায় শিরায় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে? কে না কল্পনায় কাপালিকের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন?

কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, ও মতিবিবি, বঙ্কিমবাবুর এই তিনটি বৃহৎ চরিত্র কার্য্যশীল। নবকুমার লক্ষ্য। এই তিন জনের মধ্যে যিনি যখন কার্য্য করিতেছেন, একাকী কি সমবেত হইয়া, সে কেবল নবকুমারের হৃদয় ব্যথিত করিবার জন্য। নবকুমারের হৃদয় বৃহৎ ক্ষেত্রময়, সকল প্রহরণ, সকল আঘাত সেই ক্ষেত্রে আসিয়া লাগিতেছে। যে প্রহরণে তিনি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। নবকুমারের হৃদয় যদি উগ্রভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে উক্ত চরিত্রত্রয়ের কার্য্য সকলের সহিত সেই হৃদয় বিঘর্ষিত হইত। একবার উগ্রভাব ধারণ করিয়া চরণলগ্ন লুৎফ উন্নিসার হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিল। লুৎফউন্নিসা যবনা না হইলে বোধ হয় এস্থলেও নবকুমার উগ্রভাব ধারণ করিতেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু সে আঘাত লুৎফউন্নিসার হৃদয়স্রোতকে ফিরাইতে পারিল না। তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়স্রোত দ্বিগুণ বেগে বহিল। নহিলে নবকুমারের হৃদয় অতি কোমল ও দুর্ব্বল। তিনি প্রতি বায়ু ফুৎকারে বিচলিত হন। তাঁহার হৃদয় মৃৎপিণ্ডবৎ। সে হৃদয়ে সকল প্রহরণের অঙ্কপাত হয়। তাঁহার হৃদয়ের সুকুমার ভাব এত প্রবল, যে তাহাতে

তাঁহার বিমৃশ্যকারিতাও দুর্ব্বল হইয়াছে। তিনি অবস্থার দাস ; ঘটনাস্রোতের তৃণ। ঘটনার প্রতিবোধে দাঁড়ান তাঁহার সাধ্য নহে। তিনি ঘটনায় নীয়মান না হইলে কপালকুণ্ডলার উপন্যাসজাল বিনাস্ত ও বিজড়িত হইত না। বঙ্কিমবাবু নবকুমারকে এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ না করিলে অপর চরিত্রত্রয় কার্য্য করিতে পারিত না।

কপালকুণ্ডলার পুরুষ পাত্রগণ যে অতি যৎসামান্য তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিই প্রধানা। বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই স্ত্রীপ্রধান। তিনি স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ও চরিত্র, অন্ত ও বাহ্য সৌন্দর্য্য, এবং মাধুর্য্য ও কমনীয়তা যেমন চিত্রিত করিতে পারেন যদি অপর জাতির পৌরুষ ভাব তদ্রূপ অঙ্কিত করিয়া স্বদেশীয়গণের সম্মুখে তাহার চিত্র ধরিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাসাবলি দ্বারা দেশের আর একটী উপকার সাধিত হইত। লোকে পুরুষত্বের গৌরব জানিতে পারিতেন। এক একটী উপন্যাসের চিত্র তাঁহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তাঁহারা সেই উপন্যাসের পাত্রগণকে অনেক সময়ে হয়তো অনুকরণ করিতে যাইতেন। বাঙ্গালীর জড় জীবনে তাহা হইলে কথঞ্চিৎ ঔপন্যাসিক পুরুষকার প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। বঙ্কিম বাবু তাহা হইলে শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, দেশীয় লোকের চরিত্রেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন। বাঙ্গালী চিরকাল স্ত্রৈণ; তাঁহার নিকট স্ত্রীজাতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্ত্রীজাতীয় সুকুমার ভাব সমূহ বিশেষ প্রবল। তাঁহার নিকট আর স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য বিকাশের প্রয়োজন নাই; কারণ বাঙ্গালী জাতি সমুদায়ই স্ত্রীজাতি। হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকলের সৌন্দর্য্য-প্রকাশক চিত্রে তাঁহাদিগের আবশ্যক নাই। এই প্রকার চিত্র তাঁহাদিগের নিশ্চয় মনোহরণ করিবে সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহারা চিরকাল হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রকার চিত্র-বিশিষ্ট উপন্যাস তাঁহাদিগের সুপ্রিয় হইবে তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে কি স্বদেশীয়গণের প্রয়োজনীয় গুণ সকলের উন্মেষ হইবে? তাঁহাদিগের রুচির কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে? তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি স্রোত কি কার্য্যক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত হইবে? যাহাতে এরূপ ঘটে আমরা এখন তাহাই চাই। সাধারণ লোকে না চাউক, যে মনীষিগণ সাধারণজনগণের হৃদয়-রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহারা সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি-স্রোতকে তাড়িত অথবা প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের উচিত সেই হৃদয়কে বিহিত মত শাসিত ও চালিত করেন এবং সেই স্রোতকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত প্রণা-

নীতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দেন। সেই প্রণালী ধরিয়া স্রোত বহিতে থাকে।

বঙ্কিম বাবু রমণী হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকল অতি নিপুণতার সহিত বর্ণন করিতে পারেন। রমণী-হৃদয় সুকুমার ভাবে বিগলিত হইলে সেই ভাব কার্য্যে কিরূপে ঈষৎ প্রকাশিত, ঈষৎ অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি চিত্রকরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি রমণী-হৃদয়কে বিবিধ কাল্পনিক অবস্থায় পরিস্থাপিত করিয়া তাহার সৌকুমার্য্যের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব সকল বিকশিত করেন। তাঁহার ঔপন্যাসিক রমণীগণ এই জন্য হৃদয়ভাবে সুন্দরী। তাঁহার বিমলা ও মতি বিবি, কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনী, আয়েসা ও সূর্য্যমুখী সকলেই এক এক ধরণের সুন্দরী। তাঁহাদিগের শারীরিক লাবণ্য অপেক্ষা হৃদয়ের লাবণ্য অধিকতর রমণীয়। তাঁহাদিগের হৃদয়-সৌকুমার্য্য এক এক বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছে। সেই এক এক বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়া প্রত্যেকের প্রকৃতিকে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। নচিলে ইহাঁরা সকলেই এক এক ভাবময়ী রমণী। সকলেই ভাবে পরিপূর্ণ। ইহাঁদিগের ভাবের উচ্চতায় উপন্যাসকে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস মধ্যে এই জন্য আমরা কেবল ভাবের রাজ্য দেখিতে পাই। কোথাও ভাবের প্রাচুর্য্য অতি গুরু ও প্রবল তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা ভাবের দ্বন্দ্ব অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে ফাল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। কোথাও ভাব সকল এত উচ্চতায় উঠিতেছে, যে তাহাদিগের সম্পাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উপন্যাসকে গম্ভীর করিয়া তুলিতেছে। হৃদয়ের কোমলতাকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছে। হৃদয়ের সুষমা গাম্ভীর্য্যে উত্তোলিত হইতেছে। হৃদয়ধারিণীকে সুন্দরী করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হই। দোষীকে নির্দ্দোষী ভাবি। সে ভাবাধিক্যে যে দোষ থাকে তাহাও ভুলিয়া যাই। তাহা কতদূর বিবেচনা-সঙ্গত তাহা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী এই প্রকার ভাবাধিক্যে * পরিপূর্ণ। আমরা বাঙ্গালী; আমরা কোমল ভাবের আধিক্যেরও পক্ষপাতী। এই জন্য তাঁহার উপন্যাসাবলী আমাদিগের যথেষ্ট সমাদরের সম্পত্তি। এই ভাবাধিক্যে যে দোষ আছে তাহা আমরা জানি † কিন্তু সে দোষ ও আপাততঃ গুণে পরিণত হইতে পারে। তিনি যদি রমণী-হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষ-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, উন্মত্ততা, ও ভাবাধিক্যের গৌরব উপন্যাস মধ্যে চিত্রিত করেন তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাস-শ্রেণী দ্বারা কিরূপে দেশের একটি প্রয়োজনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালী স্বাভাবিকই কবি, প্রেমিক, দয়াশীল, এবং যাবতীয় কোমল ভাবের একান্ত পক্ষপাতী। ইহারই জন্য

* *Sentimentalism* † vide The Lounger Paper No 20.

তাঁহার প্রকৃতি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি কোন কঠোর ধর্ম্মে কখন ভূষিত হয়েন নাই। যে বীরত্বে ও সাহসিকতায়, যে ত্যাগস্বীকারে ও ন্যায়পরতায়, এবং যে পুরুষত্বে ও উন্নততায় অপরাপর জাতি পৃথিবী মধ্যে আপনাপন গৌরব ও প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন সে সমস্ত মহার্ঘ গুণে বাঙ্গালী ভূষিত হয়েন নাই। এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী আরও দুর্ব্বলভাবে অবনীত করিতেছে। আমরা বাঙ্গালীকে আর কেবল কবি, প্রেমিক, দয়াশীল ও যাবতীয় কোমল ভাবের আধার দেখিতে চাহি না। যাহাতে তাঁহার প্রকৃতিকে ইহার বিপরীত ধর্ম্মে ভূষিত ও উত্তেজিত করিতে থাকে, আমরা এমত সকল গ্রন্থের অধিকতর সমাদর করিতে শিখিতেছি। দেশ, কাল, পাত্র ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে এখন এই প্রকার গ্রন্থাবলি বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে নিতান্ত হিতকর ও পুষ্টিকর বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী কি এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে?

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী যে প্রকার কোমল ভাবে পরিপূর্ণ, তাঁহার ভাষার রচনা-প্রণালীও সেই প্রকার ভাব-বিকাশের উপযোগী। তিনি যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমরা সন্দেহ করি, তাহাতে উচ্চ ও বিপরীত ভাবাদির ওজস্বিতা, বীর্য্য ও তেজস্বিতা, সম্যক্ স্ফূরিত এবং প্রকাশিত হইতে পারে কি না। তাঁহার ভাষা তাঁহার ভাবাদির ন্যায় সুন্দর, মধুর, নৃত্যশীল, ও কোমল। সে প্রণালীতে বাসন্তিক নদীর প্রসন্ন হিল্লোল নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বর্ষাকালের প্রবল তরঙ্গবেগ ধারণে সমর্থ হইতে পারে না। তাহাতে মধুর সঙ্গীত-নিক্কণ ধ্বনিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন নিনাদিত হইতে পারে না। তাহা লঘুভাবের উপযোগী, গুরুভাবের উপযোগী নহে।

বঙ্কিম বাবু গ্রীক সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটকের রীতি অবলম্বন করিয়া কপালকুণ্ডলার ঘটনাবলীকে অদৃষ্টের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এতদূর গিয়াছেন, যে গ্রন্থের একটি সমুদায় অধ্যায় অদৃষ্টবাদের প্রসঙ্গে পূর্ণ করিয়াছেন। উপন্যাসকে এই প্রকার মতামতের প্রবাহক করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা অনেক কাল পূর্ব্বে ইউরোপীয় বুধগণ একপ্রকার স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্থির করিয়া গ্রীক নাটকের দূষণীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে রীতিকে পুনরুদ্ধার করা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয় না। তাহা করিলে উপন্যাসে একটি দোষ এই ঘটে, যে তাহাতে এই মতামত সকল মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। উপন্যাস এই মতামতের দৃষ্টান্ত সাধক হইয়া উঠে। ঘটনাসকল দৈবের অনুসারী করিলে বিয়োগান্ত নাটকের গাম্ভীর্য্য অধিকতর প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু

তাহাতে যে কুফল উৎপন্ন হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। পৃথিবীতে ঘটনা সকল কখন কখন দৈববাণীর অনুসারী হইয়া পড়ে তাহাও আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সেই সমস্ত ঘটনা যে ঠিক দৈবের অনুসারী হইয়া ঘটিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? সে প্রকার বিশ্বাস করা কেবল নিতান্ত বিশ্বাস প্রবণ হৃদয়ের ধর্ম্ম। এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া উপন্যাস মধ্যে দেখাইয়া দেওয়া কতদূর বিচার সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এই প্রস্তাব অনেক দূর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাকে আর বর্দ্ধিত করা বিধেয় নহে। বিষয়ের দোষ গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। সেপ্রকার সমালোচনার সময় এখনও ঠিক উপস্থিত হয় নাই। আমাদিগের সমালোচনা এই জন্য ভিন্ন রীতিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা কপালকুণ্ডলার নিগূঢ় ও সুন্দর ভাব সকল প্রস্ফুটন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি কথঞ্চিৎও কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, এবং পাঠকগণ যদি এপ্রকার সমালোচনার প্রয়াসী হন—, আমরা সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ফলবতী করিতে উদ্যোগী হইব। বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য উপন্যাসাবলি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যাবলি এই প্রকার সমালোচনার বিষয় হইতে পারে। আমাদিগের এক্ষণকার সাহিত্যমধ্যে এই দুই জনই সুপ্রধান কবি। ইহাঁদিগের কাব্যের গুণ সকল প্রকাশ করিলে আমাদিগের সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। অতএব আমাদিগের সমালোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিষ্ফল হইবে না। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলির সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা বোধ হয় সুন্দর চিত্র দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, নক্ষত্ররাজি বিরাজিত হীরকমণ্ডিত আকাশ দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, এবং বিচিত্র-পুষ্প সুশোভিত উদ্যানের সুন্দর শোভা দেখিতেও ইচ্ছুক নহেন। তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব? তাঁহারা দূষিত দৃষ্টিশক্তি লইয়া বনবাসী হউন। সংসারের অপূর্ব্ব শোভা তাঁহাদিগের মনোমুগ্ধকর হইবে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ সংহিতার টীকাকার "ভট্টোৎপল" বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার

শালিবাহনকে, শকারি-বিক্রমাদিত্য বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যের মতানুসারে-শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে (৫৪৪ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমাদিত্যের ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই; আমাদিগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রতিষ্ঠান পুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরী তটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন শক এক্ষণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ভূপতি এবং ষষ্ঠকল্কী; এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ।
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ॥
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ।
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন; যুধিষ্ঠিরের শক * ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে বিজয়াভিনন্দন নৃপতির শক দশ সহস্র বৎসর ও তৎপরে গৌরদেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠনৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে। আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই সুতরাং তদ্বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ মাত্র করিলাম।

জিনপ্রভাসূরি প্রণীত কল্পপ্রদীপ নামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠান পুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তথায় এক কুম্ভকার-গৃহে কতিপয় ব্রাহ্মণ

---

* ইহার সহিত বৃহৎসংহিতা ও রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকের ঐক্য নাই। যথা—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন রাজ্য করেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তখন মঘা নক্ষত্রে। সেই রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর অবস্থিত ছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রত্যেক নক্ষত্রে শত বর্ষ থাকেন। এখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে আছেন।

একটি ভগিনী সহ বাস করিতেন। একদা তাঁহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শেষ নাগ তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া, মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করত, তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন। জিনপ্রভাস্থরি কহেন, লোকে তাঁহাকে এই কারণ সাতবাহন বলিত। যথা—

"সনোতের্দানার্থত্বাৎ লোকৈঃ সাতবাহন ইতিব্যপদেশং লম্ভিতঃ" অর্থাৎ পাণিনীয়-ধাতুপাঠে "সনু দানে" উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'সন' ধাতু-নিষ্পন্ন 'সাত' শব্দে শব্দের অর্থ দান। ঐ মহাত্মার দান বিষয়ে অত্যন্ত অভিরুচি থাকাতে তিনি লোকের নিকট "সাতবাহন" খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথিত আছে, এই রাজার সময়েই "দানমেকং কলৌ যুগে" এই আর্য্যবাক্যের সাফল্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র ভাষায় শালিবাহন-চরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম,সাতবাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্য-হর্ম্ম্য-পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোককে ঋণমুক্ত ও অধীন করিয়া তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাসূরি কহেন, তিনি জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুদৃশ্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে ৫০ ব্যক্তি জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখর কৃত প্রবন্ধকোষে ও শতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠান পুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিন-প্রভাস্থরি ১৪ শত সম্বৎ মধ্যে ও তিলকস্থরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ মধ্যে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কচূল, বিক্রমাদিত্য, নাগার্জ্জুন, উদয়ন, লক্ষণসেন, এবং মদনবর্ম্মণ্ এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাস্থরি এইরূপে প্রতিষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পূতমেত-
দ্গোদাবর্য্যা শ্রীপ্রতিষ্ঠানসঞ্জ্ঞম্।
যত্রাপীড়ং শ্রীমহারাষ্ট্রলক্ষ্ম্যা-
রম্যং হর্ম্ম্যৈর্নৈত্রশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈঃ ॥১॥
অষ্টাষষ্টি লৌকিকা অত্র তীর্থা
দ্বাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ।
পৃথ্বীশানাং ন প্রবেশোত্র বীর-
ক্ষেত্রত্বেন প্রৌঢ়তেজোরবীণাম্ ॥ ২ ॥
নায়াতীতি পুটভদেনতোস্মাৎ
ষষ্টিযোজনমিতং কিল বর্ত্ম।
বোধনায় ভৃগুকচ্ছমগচ্ছ-
দ্বাজিতো জিনপতিঃ কমঠাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

অন্বিতত্রিনবতের্বৎসরৈ-
অত্যাযেত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।
(কালকোব্যধিত)বার্ষিকপর্ব্ব
ভাদ্র পদ শুক্ল চতুর্থ্যাম্ ॥ ৪ ॥
তত্তদায়তন পংক্তি বীক্ষণা
দত্র মুঞ্চতি জনো বিচক্ষণঃ।
তৎক্ষণাৎ সুরবিমানধোরণী
শ্রীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং ॥ ৫ ॥
সাতবাহনপুরঃপুরানৃপা-
শ্চিত্রকারিচরিতা ইহাভবন্।
দৈবতৈর্বহুবিধৈরধিষ্ঠিতং
চাত্র সুত্রসদনান্যনেকশঃ ॥ ৬ ॥
কপিলাত্রেয়বৃহস্পতিপঞ্চালা
ইহ মহীভুদুপরোধাৎ।
ন্যস্তস্বচতুর্লক্ষগ্রন্থার্থং
শ্লোকমেকমপ্রথয়ন ॥ ৭ ॥
(সচায়ং শ্লোকঃ) জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ
কপিলঃ প্রাণিনো দয়া।
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ
পঞ্চালস্ত্রীষু মার্দবং ॥ ॥

অর্থাৎ গোদাবরী সংসর্গে পবিত্র, মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বা শিরোভূষণীকৃত এই প্রতিষ্ঠান নামক পত্তন (নগর) উৎকর্ষে থাকুন। ইহা নেত্র-স্নিগ্ধকর হর্ম্ম্য ও চৈত্য-মণ্ডল দ্বারা অতীব রমনীয়। এখানে ৬৮ জন শাস্ত্রকার ও ৫২ জন বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে শত্রু রাজার প্রবেশ দুঃসাধ্য। বীরকুলের উৎপত্তি স্থান বলিয়া মার্ত্তণ্ডদেবও এখানে নিজ তীক্ষ্ণ রশ্মি বিস্তার করেন না। ভগবান জিনপতি (কমঠাঙ্কনামা) এই নগর হইতে অশ্বারোহণে ৬০ যোজন পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া ভৃগুকচ্ছ * পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ভগবান্ জিনদেব (শাক্যসিংহ বা অন্য কোন বুদ্ধ) মোক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে ৯৯৩ বৎসর পরে এই স্থান হইতেই তাঁহার বার্ষিক মহাপর্ব্ব (উৎসব) প্রারম্ভ হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী সেই বার্ষিক পর্ব্বের কাল। (এই তিথিতে জিন দেব শরীর ত্যাগ করেন)। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই নগরের আয়তন শ্রেণীর শোভা দেখিলে আর স্বর্গীয় আয়তন শ্রেণী দেখিবার নিমিত্ত কুতকী হন না। পূর্ব্বকালে সাতবাহন প্রভৃতি ভূপাল এই স্থানেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকারই চরিত্র অদ্ভুত। এখানে বহুদেবতার অধিষ্ঠান ও অনেক যজ্ঞায়তন আছে। রাজার অনুরোধে কপিলাত্রেয় বৃহস্পতি পাঞ্চালেরা তৎকৃত চতুর্লক্ষাত্মক গ্রন্থের সার এক শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছিল। সে শ্লোক এই—আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল প্রাণির প্রতি দয়া, বৃহস্পতি অবিশ্বাস এবং পাঞ্চালেরা স্ত্রীজনের প্রতি মৃদুব্যবহার অর্থাৎ এই কএকটি বিষয়ই তাহার গ্রন্থের প্রতি-

* প্রতিষ্ঠান বা পাটন হইতে এক রাজপথ ভৃগুকচ্ছ (পশ্চিম সমুদ্রের তীরস্থ দেশ বিশেষ) পর্য্যন্ত তৎকালে বর্ত্তমান ছিল।

পাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এই চারিটি বিষয় লইয়া চারিলক্ষ শ্লোক রচিত হইয়া ছিল।

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রিয়দর্শিকা নাটীকা,—বিক্রমাদিত্য কোষ গ্রন্থ—, মুঞ্জ, মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা—ভোজদেব * অশ্বায়ুর্ব্বেদ, যোগ-সূত্র টীকা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ও তত্ত্বপ্রকাশ,—শূদ্রক মৃচ্ছকটিক,—কান্যকুব্জাধিপতি মদন পাল মদন-বিনোদ, ও নিঘণ্টু রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য. শালিবাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত নৃপতি গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ নৃপতি। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যাচক দলের একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

ধাতর্ধাতরশেষযাচকজনে
বৈরায়সে সর্ব্বথা।
যস্মাদ্বিক্রমশালিবাহন
মহীভৃন্মুঞ্জভোজাদয়ঃ॥
অত্যন্তংচিরজীবিনো ন বিহিতা-
স্তেবিশ্বজীবাস্তবো।
মার্কণ্ডধ্রুবলোমশ প্রভৃতয়ঃ
সৃষ্টাহি দীর্ঘায়ুষঃ॥

অর্থাৎ "হে বিধাতঃ! তুমি অশেষ অর্থাৎ বর্ত্তমান ও উৎপদ্যমান যাচক দলের শত্রু; যেহেতু তুমি বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাদিগকে চিরজীবী কর নাই। সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও বসুসম্পন্ন রাজাগণকে চিরজীবী না করিয়া কিনা, মার্কণ্ড, লোমশ ও ধ্রুব প্রভৃতি কতক গুলি নির্ধন ত্যাগী পুরুষ-কে দীর্ঘজীবী করিয়াছ!!

প্রবন্ধ চিন্তামণি ও চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা গাথাকোষ নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট, হর্ষচরিতে এই কোষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যথা।

"অবিনাশি নমগ্রাম্য
মকরোত্ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং
রত্নৈরিব সুভাষিতম্॥" ১।

অর্থাৎ সাতবাহন, গ্রাম্য দোষ-বিবর্জ্জিত চিরস্থায়িযোগ্য এককোষ শুদ্ধ জাতি (ছন্দোবিশেষ) দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা রত্ন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কবিবস্তুতে সুভাষিত অর্থাৎ সুশোভিত আছে।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্ব-

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে, যথা "অত্র ভোজঃ দলিবলিস্থালিরনিশ্বনিত্রপি ক্ষপযশ্চেতি পপাঠ" ইহা ভিন্ন বৈদিক নিঘণ্টুভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাসীন-নিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, শালিবাহন সপ্তশতী নামধেয় এই গাথা কোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাও সাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রী ভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যথা

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত	মরাঠী	অর্থ
অত্তা	আতে	পিতার ভগিনী
ঝুরই	ঝুরত্যে	দুঃখ
পাব ..	পাব	পাওয়া
ওট্টো	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ
তুইঝ	তুঝে	তোমার
মট্ঝ	মাঝেং	আমার
সিপ্পি	শিম্পি	ঝিনুক
পিক্কং	পিকলেলেং	পক্ক
পাণ্ডী	পাড়ি	গাভী
চিখিথল্লো	চিখল	কর্দ্দম
ফলই	ফাড়িতো	চক্ষের জল
স্থিল্লী	সাল	বৃক্ষের ত্বক্
পোট্ট	পোট	উদর
শোণার	শোনার	স্বর্ণকার
রুন্দো	রুন্দ	প্রশস্ত
তুপ্পং	তুপ	ঘৃত
মঞ্জরম্	মঞ্জর	মার্জ্জার
জুপ্পাং	জুনেং	বৃদ্ধ
ওল্লং	ওলেং	আর্দ্র
চুক্কং	চুকী	ভুল
বে	মুলগড়া	বালক

মুকুন্দরাজ সর্ব্ব প্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অঃ প্রারম্ভে বর্ত্তমান-ছিলেন। তাহার পর দ্যানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠী ভাষায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাঁহাদিগের ভাষার সহিত শালিবাহন সপ্তশতী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয় শালিবাহন-সপ্তসতী প্রাচীন গ্রন্থ, সেরূপ ভাষায় অপর এক খানি গ্রন্থ মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন সপ্তসতী সপ্ত অধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এই রূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসিঅ জণাহি অঅ দইএ
কইবচ্ছল পমুহ সুকই গিম্মবিত্র॥
সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্ ॥ ১ ॥

অর্থাত্ সুরসিকগণের আনন্দ বর্দ্ধক কবিকুল চূড়ামণি কবিবৎসলকৃত প্রথম শত গাথা (৭০০ শতমধ্যে) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহন কৃত তাহার সন্দেহ নাই। কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ইহার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনী-প্রসূত নহে। তাহার মধ্যে দুই স্থলে বিক্রম ও শালিবাহনের প্রশংসা-সূচক কবিতা আছে। তাহা

অপর কোন কবি প্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন সপ্তশতী টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্ন-লিখিত কবির রচিত কবিতাও আছে।

বোদিশ, চুলুহ, সমররাজ,
কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীবাজ।

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈন ধর্ম্মাবলম্বীছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। লক্ষণ সেনের সভাসদ্ শ্রীধর দাস সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৬ জন কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীর-নিবাসী সোমদেব ভট্ট-সঙ্কলিত কথা-সরিৎ-সাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে সাতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎ কথার সাতবাহন, মহারাজ নন্দের সমসাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন, শালিবাহন সপ্তশতীর গ্রন্থকার ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে।

শ্রীরামদাস সেন।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।*

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যখন ছত্রসিংহ রেসিডেন্টের নিকট আপিল করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না, যখন তাঁহার কার্য্যের যথাপদ্ধতি বিচার করা হইলনা, তখন তিনি ইংরেজদিগকে ঘোর দৌরাত্মকারী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের শোচনীয় নির্ব্বাসন ও মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহে রেসিডেন্টের অসম্মতিতে

* গত মাসের আর্যদর্শনের ১৫২ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে ও ১৫৩ পৃষ্ঠার মূলে লিখিত আছে ভ্যান্স্ আগ্নু মুলরাজকে নির্দ্দোষী বলিয়া সার ফ্রেডরিক কারির নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, সদাশয় পাঠকগণ সার ফ্রেডরিক কারির পরিবর্ত্তে জেনারেল কর্টল্যান্ট্ ও হারবার্ট এড্ওয়ার্ডিস পড়িবেন। এই পত্র বন্নুতে প্রেরিত হইয়াছিল।

তিনি ইহার পূর্ব্বেই ব্রিটীষ কার্য্য প্রণালীর প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের এইরূপ অপমান ও অপদস্থতায় তাঁহার সেই বিরক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের উদরসাৎ হইবে, শীঘ্রই তাঁহাদিগের ধর্ম্মলোপ ও ইজ্জৎ নষ্ট হইবে। ছত্র সিংহ আর স্থির করিতে পারিলেন না। নিজের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন, গুরুগোবিন্দসিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম এবং স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধারার্থ শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সের সিংহ পিতার নিকট হইতে তাঁহার দুর্গতির সংবাদ পাইলেন। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার মন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আর ইংরেজদিগকে বন্ধুভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন না। ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিলেন, তিনি আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটীষ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে মনস্থ করিয়াছেন (২৯)। বীরতনয় বীর পুরুষের এই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। ৫ই সেপ্টেম্বর ব্রিটীষ সৈন্য মুলতান-দুর্গ আক্রমণ করিল, ১৪ ই সেপ্টেম্বর সেরসিংহ দলবল সমভিব্যাহারে মুলরাজের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পদের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

সেরসিংহ পূর্ব্বাবধি ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত সেরসিংহ বিলক্ষণ প্রভুপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগকে রাজানুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন (৩০)। সের সিংহের সদ্ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু কেবল সার ফ্রেডরিক কারি ও কাপ্তেন আবটের অব্যবস্থিততায় এই তেজস্বী বীরপুরুষ ব্রিটীষ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কে জন্মদাতা প্রতিপালক কর্ত্তার অপমান ধীরভাবে চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হয়? কোন্ তেজস্বী ব্যক্তি আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পর পদ লেহন করিয়া থাকে? যাঁহারা প্রস্তাবিত বিষয়ে সের সিংহকে দোষী বিবেচনা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ ও পিতার কুসন্তান বলিয়া শতবার ধিক্কার দিই।

সেরসিংহ ব্রিটীষ্ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, মুলরাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এক্ষণে এই অতর্কিত ঘটনা দেখিয়া

---

* ২৯ সেরসিংহ ১২ই কি ১৩ই এই রূপ মনস্থ করেন। Edwardis:— A year on the Panjab Frontier, Vol. II p. 503. Empire in Asia, p. 347 348.

* ৩০ A year on the Panjab Frontier. Vol II p. 433.

তিনি সের সিংহের প্রতি যথোচিত বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত আপনার সৈন্যদিগকে নগরের প্রাচীরের ভিতরে লইয়া গিয়া সেরসিংহের সৈন্যদিগকে শত্রুর সম্মুখীন ও প্রাচীরের উপরি ভাগে দণ্ডায়মান করিয়াদিলেন, (৩১) সুতরাং সেরসিংহ কিছুদিনের মধ্যেই মুলরাজের সন্দেহে বিরক্ত হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য আপনার সৈন্য সহিত মুলতান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া মুলতানে পৌঁছিলে, ২৬ এ তারিখ ব্রিটীষ সৈন্য পুনর্ব্বার নগর আক্রমণ করে। ১৮৪৯ অব্দের ২ রা জানুয়ারি ইহাদিগের গোলায় নগর বিধ্বস্ত হয়। মুলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে সৈন্য সমষ্টির বিশৃঙ্খলা দোষে তাঁহার পরাজয় হয়। সুতরাং তিনি ২২ এ জানুয়ারি বিজেতার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

এইরূপে মুলতান বিধ্বস্ত হইল, এইরূপে মুলরাজ পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু ছত্রসিংহ ও সের সিংহের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। মুলতান পতনের পূর্ব্বে ১৮৪৮ অব্দে রামনগর ও সুদুলপুরে যে দুটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটীষ সৈন্য যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। সের সিংহ এক্ষণে ৬০টি কামান ও ৩০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই সৈন্য দল লইয়া তিনি চিলিয়ানওয়ালার নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করেন।

মুলতান ঘটিত গোলযোগের সম্বাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সার হেনরি লরেন্স পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়া ১০ই জানুয়ারি লর্ড গফের শিবিরে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু সে সময়ে সার ফেড্‌রিক কারির কার্য্য কাল শেষ না হওয়াতে হেনরি লরেন্সকে প্রধান সেনাপতির অবৈতনিক এডিকং হইয়া ব্রিটীষ শিবিরে থাকিতে হয়। এদিকে ব্রিটীষ সৈন্য ১৩ ই জানুয়ারি চিলিয়ানওয়ালায় সমুপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতি সের সিংহ অপূর্ব্ব সামরিক কৌশল সহকারে সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ব্রিটীষ সৈন্য উপস্থিত হইলে এই সন্নিবিষ্ট সৈন্যদল অসাধারণ বিক্রম সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জেনারেল কাম্পবেল (লর্ড ক্লাইড) ও জেনারেল পেনিকুইক দুইদল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কতা করিতেছিলেন, সের সিংহের সৈন্যের পরাক্রমে এই অধিনায়ক দ্বয়ের সৈন্যদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য সম্মুখ ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, স্বল্পসংখ্যক রণমত্ত শিখ অশ্বারোহীর অমিত পরাক্রমে এই সৈন্যশ্রেণীও বিচ্ছিন্ন হইয়া

৩১ A year on the Panjab Frontier Vol. II. p. 515.

ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। বিজয়শ্রী সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রিটীষ পতাকা শত্রুর করগত, ব্রিটীস কামান অধিকৃত, ব্রিটীষ অশ্বারোহী পলায়িত ও ব্রিটীষ পদাতিক বিধ্বস্ত হয়। সেনাপতি সের সিংহ বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করেন।

এইরূপে চিলিয়ানওয়ালার সমরের অবসান হয়। যাঁহারা ওয়াটালু ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে হৃতসর্ব্বস্ব ও হৃতগৌরব করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য চিলিয়ানওয়ালায় আর্য্য তেজ, আর্য্য সাহস, ও আর্য্য বীর্য্যবত্তার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণতরঙ্গায়িত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় গ্রীক্ সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্ম্মাপলী, আর এই চিলিয়ানওয়ালা ভারতবর্ষের মারাথন। মেওয়ারের প্রতাপ সিংহ ভারতের লিওনিদাস্ আর পঞ্জাবের এই সের সিংহ ভারতের মিলতাইদিস্। ইতিহাসে থর্ম্মাপলী ও মারাথন কিছু সামান্য যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে, লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস্ কিছু সামান্য যুদ্ধবীর নহেন। যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্ত্তমান থাকে, যদি পবিত্র স্বাধীনতার পবিত্র ধ্বজার কোন বিলাস-ক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই থর্ম্মাপলী ও মারাথন্, যদি কোন বীরপুরুষ বীরেন্দ্র সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরোদিগের বীণানিন্দিত মধুরস্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তবে তিনি সেই লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস্। এই থর্ম্মাপলী ও মারাথনের সহিত হলদিঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা এবং এই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিসের সহিত প্রতাপ সিংহ ও সের সিংহের নাম গ্রথিত করা ভারতবর্ষের কিছু অল্প গৌরব ও অল্প বীরত্বের বিষয় নহে। ফলে চিলিয়ানওয়ালা উনবিংশ শতাব্দীর একটী পবিত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল লীলা করিবে,—ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। সের-সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র সমাজে প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যদি লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে শিখ সেনানায়ক উৎকোচ-গ্রাহিতা পাপে কলুষিত না হইতেন, তাহা হইলে আমরা প্রথম শিখ যুদ্ধেও এইরূপ চিলি-

য়ানওয়ালা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম। (৩২)।

কিন্তু সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন এক জনের পক্ষাশ্রয়িনী থাকে না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার উর্দ্ধ পুনর্ব্বার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। সের সিংহ চিনিয়ানওয়ালায় যে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হয়েন, গুজরাটে তাহা বিচ্যুত হয়। ৩ তিনি ব্রিটীষ সৈন্যের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চিনিয়ানওয়ালা হইতে গুজরাটে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হয়েন। এদিকে জেনারেল হুইসও মুলতান হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড গফের দল পরিপুষ্ট করেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের সংগ্রাম হয়। এবার বিজয়লক্ষ্মী ব্রিটীষ সেনাপতির করতালগত হয়েন। ছত্রসিংহ ও সের সিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া ১৪ই মার্চ্চ বশ্যতা স্বীকার করেন। ৩৫ জন সর্দ্দার ও ১৬০০০ শত সৈন্যের অস্ত্র বিজেতার হস্তে সমর্পিত হয়। (৩৩)

এইরূপে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শেষ হইল। লর্ড ডেলহৌসী এই অবসরে সর্ব্বগ্রাসক মুখ ব্যাদান করিলেন। ইলিয়াট সাহেব গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হইয়া লাহোর দরবারে প্রেরিত হইলেন। সার ফ্রেডরিক কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে সার হেনরি লরেন্স্ পুনর্ব্বার রেসিডেন্টের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহাকে লইয়া ২৮ এ মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন। তৎপরদিন (২৯ এ মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এইশেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটীষ্ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অত্যাচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া শিখ রাজ্য বজায় রাখিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডেলহৌসীর ঘোষণা পত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিৎ দুর্গে ব্রিটীষ্ সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। পঞ্জাবরাজ্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্রিটীষ চাতুরীতে ভারত-মানচিত্রে

(৩২) শিখ ইতিহাসপ্রণেতা কাপ্তেন কানিংহাম লিখিয়াছেন, ইংরেজগণ রাজা লাল সিংহ, গোলাপ সিংহ ও সর্দ্দার তেজ সিংহকে ঘুস দিয়া প্রথম শিখ যুদ্ধে জয়ী হয়েন। Vide Cunninghum's History of the Shikhs. Second Edition, p p. 299, 317.

(৩৩) India under Dalhousie and Canning, p. 3.

লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। (৩৪)।

৩০ এ মার্চ্চ ডেলহৌসীর এই ঘোষণা-পত্র ফিরোজপুর হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিটীষাধিকৃত স্থান সমূহে প্রচারিত হয়। ৫ ই এপ্রেল গবর্ণরজেনারল মহারাজ দলীপ সিংহকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দিবার অনুমোদন করেন। যে লোক প্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লবে রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ যাহা অতি গৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন। ইংরেজ অদ্য "পাঁচ জুতি" মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহ হইতে গ্রহণ করিলেন (৩৫)।

কে সাহেব স্বপ্রণীত সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন লর্ড ডেলহৌসী যে, মহারাজ দলীপ সিংহকে রাজ্য-শাসনের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহাকে একটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সুখময় পরিবর্ত্তন হইল (৩৬)!! কি উদারতা!!! ব্রিটীষ অভিধানে, বলে ও কৌশলে অপরের রাজ্য হরণের অর্থ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, আর এক জন নিরীহ সরলপ্রকৃতি বালককে তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করার অর্থ সুখময় পরিবর্ত্তন!!

কালের কি অচিন্ত্য প্রভাব। নিয়তি নেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন!! যে পঞ্জাবে আর্য্য মহর্ষিগণ "প্রশস্ত হৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমাশক্তির স্বরূপ

---

(৩৪) Empire in Asia, p, 351.

(৩৫) কোহিনুরের ইতিবৃত্ত নিতান্ত অদ্ভুত। কিম্বদন্তী অনুসারে এই মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপর ইহা উজ্জয়িনী-রাজের শিরোভূষণ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালবদেশ অধিকার করিয়া ইহা প্রাপ্ত হয়েন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে এই মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদির সাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহাকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহাম্মদ সাহ ইহা প্রাপ্ত হয়েন। আহাম্মদ সাহের পরলোক প্রাপ্তির পর ইহা তদীয় উত্তরাধিকারী সা সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সা সুজাকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটে শোভমান রহিয়াছে। প্রথিত আছে, একদা ব্রিটীষ রাজ প্রতিনিধি কোহিনূরের মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন" এস কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

(৩৬) Kaye's History of the Sepoy war, Vol I. p. 47.

চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অথবা তদীয় আরাধনা জন্য জলদগম্ভীর মধুর স্বরে সাম করিতেন,” যে পঞ্জাবে রাজাধিরাজ রণজিৎসিংহ যুদ্ধ দুর্ম্মদ জাতিকে বশীভূত করিয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতেন, অদ্য সেই পঞ্জাব ব্রিটিনিয়ার করায়ত্ত, অদ্য সেই পঞ্জাব ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। “প্রলয় প্রযোধির জলোচ্ছ্বাসে” সে পূর্ব্ব গৌরব, সে পূর্ব্ব মহত্ত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। অদ্য যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ, সম্পাদ পত্রে অদ্য যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ তাহা এই, সুনিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের সুবিচার অথবা অবিচারের কাহিনী। “নূতন সৃষ্টি, নূতন রাজ্য এবং সর্ব্বত্রই নূতন শক্তির সঞ্চার চিহ্ন।”

যদি ন্যায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাইবে, লর্ড ডেলহাউসী ব্রিটীষ্ জাতির চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য হরণ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। সেরসিংহ যে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহা কেবল পিতার অপমান জন্য। লাহোর দরবারের প্ররোচনায়, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, “খাল্‌সা সৈন্যই শিখ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, লাহোর গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ছিলেন না।” (৩৭) প্রতিনিধি সভার যে আট জন মেম্বর দ্বারা রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছয় জন বরাবর সন্ধির নিয়ম ও ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ করা হয়। কেবল একমাত্র সেরসিংহ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন (৩৮)। তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ স্বীকার করিয়াছেন, সেরসিংহ আগষ্ট্ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ সদ্ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। পরন্তু প্রতিনিধি সভার যে ছয় জন মেম্বর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডেলহৌসী তাঁহাদিগকে বলেন, যদি তাঁহারা ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত না হয়েন, যদি তাঁহারা পঞ্জাব অধিকারের নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে জোর করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করান হইয়াছিল (৩৯)। এদিকে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট্

(৩৭) India under Dalhousie and Canning, p. 55.

(৩৮) Retrospects and Prospects of Indian Policy. p 159.

(৩৯) Ibid. p. 154—155.

লাহোর দরবারের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসীতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং দরবারের সমস্ত বিষয়েই ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা। তথাপি কোন্ দোষে দলীপসিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যে ব্রিটীষ্ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল? পক্ষপাত-শূন্য উদার ব্যক্তি কি ইহাতে জুলুম বলিবেন না? ইহাতে কি ব্রিটীষ্ গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই? সহস্র বৎসরের ও অধিক হইল, যখন দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মহারাজ পোরসকে সময়ে পরাজিত করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? পোরশের লোকাতীত বিক্রম, লোকাতীত সাহস দেখিয়া সেকন্দর সাহ তাঁহাকে স্বপদে স্থাপিত ও তাঁহার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী অভিভাবক ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট সেই পঞ্জাবের একটী নির্দ্দোষ নিরীহ স্বভাব বালককে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!! জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি বিচিত্র উন্নতি!!

পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লর্ড ডেলহৌসী একদা বারাকপুরের ভোজে বলিয়াছিলেন:—'আমি শান্তির ইচ্ছা করি, আমি ইহার জন্য বিশেষ লালায়িত। কিন্তু ভারতবর্ষের শত্রুগণ যদি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করে, যুদ্ধই তাহারা পাইবে, এবং আমার কথানুসারে তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিশোধের সহিত লাভ করিবে।" ডেলহৌসী কি ভাবে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া? না সর্দ্দার ছত্রসিংহকে অপমানিত করিয়া? একদিকে ঘোরতর অত্যাচার করিব, সকলের সম্মান নষ্ট, ইজ্জৎ নষ্ট ও সম্পত্তি নষ্ট করিব। অথচ অপর দিকে শান্তি শান্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া গগন প্রতিধ্বনিত করিব, এরূপ ব্যবহার কি ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয় নহে?

কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে লর্ড ডেলহৌসীর এই উক্তি অপেক্ষা জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি আরও অধিক ভয়ঙ্কর। অতীত সাক্ষী পবিত্র ইতিহাস লিখিতে যাইয়া এই ঐতিহাসিক এক স্থলে লিখিয়াছেন—"শিখগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তাহাদিগের সমুদয় বিষয়ই শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ন্যায় যুদ্ধে তাহারা এই সব বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। আমরা সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও ঠকবারিতা দ্বারা এই সহিষ্ণুতা ও ধীরতার বিলক্ষণ প্রতিশোধ তুলিয়াছে" (৩৯)। এই ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত লেখনী হইতে পুনর্ব্বার অন্যস্থলে এই বাক্য

(৪০) Kaye's History of the Sepoy war. Vol. I. p. 46.

বহির্গত হইয়াছে— "আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে একটী সাহসী জাতির এইরূপ যুদ্ধ অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ দৃশ্য, এবং ইহার অধিনায়কগণ ন্যায়তঃ সহানুভূতি ও সম্মান লাভের অধিকারী। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি মুখে আমাদিগকে বন্ধু বলিয়া গোপনে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদিগের ইতৈষণা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলঙ্কিত করে, এবং মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণা দ্বারা আপনাদিগের সম্মান হইতে বিচ্যুত হয়" (৪১)। এই ঐতিহাস-লেখক কেবল স্বজাতির গৌরব-প্রিয়তায় অন্ধ হইয়া এইরূপ অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করিয়াছেন। অপক্ষপাতী বিচারক কখনও ইহা মার্জ্জনা করিবেন না। যে ব্রিটেনবাসী মদ গর্ব্বে অন্ধ, তিনি অসঙ্কুচিত হৃদয়ে শিখদিগের এই অভ্যুত্থানে বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখিবেন, তাহার মতে 'চন্দ্রে ও কলঙ্ক রেখা সম্ভবে তথাপি এই ভারতরাজ্যে ব্রিটীষ চরিত্রে কখনও কলঙ্ক সম্ভবে না। যদি ব্রিটেনবাসী পরস্ব লুণ্ঠন করে এখানে তাহার নাম প্রমোদ ক্রীড়া, যদি ক্লাইবের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কপট লক্ষ্য প্রস্তুত করে এখানে তাহার নাম অকল্পিত পূর্ব্ব প্রতিভা। আপনারা অন্যায় করিয়া মহারাণী ঝিন্দনকে হঠাৎ নির্ব্বাসিত করিলেন, হঠাৎ তাঁহার বৃত্তি কমাইলেন এবং অন্যায় করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহের সম্মানচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন, তাহার নাম, সহিষ্ণুতা ও নম্রতা, সের সিংহ আপনার সম্মান রক্ষার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার নাম হইল, বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা। "নিয়মই তাঁহার অধীন তিনি নিয়মের অধীন নহেন, যে তাঁহার প্রতাব সহিতে না পারে সে অশিষ্ট সে উদ্ধত, যে তাহাকে ভোজ্য বস্তু আহরণ করিয়া দিতে না পারে, সে শঠ, সে ধূর্ত্ত; এবং যে পঞ্চমুখে তাহার স্তুতি গীত গাইতে না পারে, সে অজ্ঞ সে মিথ্যাবাদি, তাহার ইচ্ছায় বিধি, তাহার অভিসম্পাতে বিপদ এবং তাহার সন্দেহে, ঘোরতর সর্ব্বনাশ ও ঘোরতর বিপ্লব (৪২)।" এই প্রকার ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া অলোক সামান্য যুদ্ধবীর সের সিংহ এইরূপ কলঙ্কিত হইয়াছেন, এবং এই প্রকার ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া পরাক্রান্ত খালশা সৈন্য বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া ইতিহাসে ধিক্কৃত হইয়াছে। অহো বিড়ম্বনা!! অহো লাঞ্ছনা!! যদি মেকলের ন্যায় কঠোর প্রকৃতি সমালোচকের কঠোর লেখনী

(৪১) Ibid, p. 58.

(৪২) বান্ধবের তৃতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ব্রিটীষ ইণ্ডিয়া-শীর্ষক প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত।

হইতে এই ইতিহাস লেখকের উক্ত বাক্যের সমালোচন বাহির হইত তাহা হইলে তিনি নিসন্দেহ বলিতেন, ' শৃঙ্গ যেরূপ মহিষের, নখর যেরূপ ব্যাঘ্রের, হুল যেরূপ মধুমক্ষিকার, এবং প্রাচীন গ্রীক্ সঙ্গীতানুসারে সৌন্দর্য্য যেরূপ নারী জাতির সেইরূপ, প্রতারণা, চাতুরী ও সত্যের অপলাপই ব্রিটীষ জাতির স্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। ইহারা স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃত বীরবত্তাকে বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রকৃত দেশহিতৈষিতাকে চপলতা ও প্রকৃত মনস্বিতাকে নীচতার পরাকাষ্ঠা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কে সাহেবের সৌভাগ্য বলে একপ সমালোচক অদ্যাপি পঞ্জাবে জন্মিয়া তাঁহার লিখন-ভঙ্গীর এইরূপ কঠোর শ্লেষোক্তি করেন নাই।

এ বিষয়ে আর আমরা অধিক বাগাড়ম্বর করিতে চাহি না অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া পল্লবিতত্ব দোষের প্রবর্ত্তয়িতা হইতে ইচ্ছা করি না। দুইজন পক্ষপাত শূন্য সুবিচারকের হস্তে এ বিষয়ের বিচার ভার দিয়া আমরা অপসৃত হইতেছি। তাঁহারা ইহার বিচার করিয়া কি বলিয়াছেন, পাঠক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। মেজর ইভানস্ বেল্ লিখিয়াছেনঃ—" লর্ড ডেলহৌসী বলিয়াছেন "আমরা আমাদিগের নাবালক রাজার অধীনস্থ রাজ্য জয় করিয়াছি।" কিন্তু ইহা জয় নহে—ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্য্যের নিয়ন্তা বলিয়া পঞ্জাবে আমাদিগের সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমরা ইহার দুর্গ সকল করায়ত্ত করিয়াছিলাম, ইহার বিদ্রোহী অধিবাসিদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলাম, আমাদিগকে দলীপ সিংহের রাজ্য বজায় রাখিতে এই সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবের অধীশ্বর হইবার প্রত্যাশায় উক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। * * * প্রাচ্য ধারণা অনুসারে, যিনি অধিক সংখ্য রাজাকে আপনার শাসন ও পালনের আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী। লর্ড ডেলহৌসী স্বীয় হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া অনায়াসে ভারতীয় রাজাদিগের হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তিনি ইহা না করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, পবিত্র ইতিহাসের অবমাননা করিয়াছেন, উত্তর ভারতের সংস্কার সম্বন্ধে উপযুক্ত সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্যায় ও অবিচার দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য ভারাক্রান্ত করিয়াছেন" (৪২)। টরেন্স বলিয়াছেন, "সাধারণ নিয়ম অনুসারে, দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকার অবশ্য ন্যায়ের বহির্ভূত বলিতে হইবে। দলীপ সিংহ নাবালক সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির কোন বিষয়েরই দায়ী নহেন। রাজ-প্রতিনিধি

(৪২) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 178—179

সভার শিরঃ স্থানে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট অবস্থিত ছিলেন, রাজধানীতে কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় নাই এবং সাধারণ্যে সমস্ত অধিবাসিদিগের মধ্যে কোনও প্রকার বিদ্রোহ-ভাব লক্ষিত হয় নাই, রাণী সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, পরাক্রান্ত গোলাপ সিংহ বিশিষ্ট সদ্ভাব সহকারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কেবল মুলতান ব্রিটীষ্ সৈন্যের প্রবেশ-পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহাও বিধ্বস্ত করিয়া নিষ্ঠুর-প্রতি বিদ্রোহিদিগের অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হয়। যদি সামরিক আইন প্রচার করিয়া অবাধ্য খালসাদিগকে সম্পত্তি চ্যুত করা হইত, তাহা হইলেই সমগ্র ক্ষতির পূরণ ও প্রকৃত পক্ষে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইত। ইহা না করাতে পক্ষপাত শূন্য ইতিহাস অবশ্যই বলিবে যে, পঞ্জাব অধিকার কেবল ডাকাতি মাত্র" (৪১)।

রাজ্যচ্যুতির সময়ে মহারাজ দলীপ সিংহের বয়স দ্বাদশবর্ষ ছিল। তিনি সেই সময়ে বঙ্গদেশস্থ সৈন্যের জনৈক সহকারী সার্জ্জনের (Sir John loging) শিক্ষাধীন হয়েন। শিক্ষক স্বীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মহারাজ দলীপ সিংহ এক্ষণে ইংলণ্ডীয় সামাজিক ও স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী হইয়া ইংলণ্ডে ব্রিটীষ্ সিংহের জাজ্বল্যমান কলঙ্ক স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং মহারাণী ভারত সাম্রাজ্যেশ্বরী এক্ষণে ভুবন বিখ্যাত কহিনুর পঞ্জাব অধিকারের কলঙ্ক স্বরূপ স্বীয় মুকুটে ধারণ করিতেছেন। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাঁহার জন্য প্রভুরক্ত খালসা উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহার কি দশা হইল? স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তন পরে তিনি বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তনয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত অজ্ঞাত ও নির্জ্জন স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবন-স্রোতঃ অনন্ত কাল-সাগরে মিশাইয়া গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীরঃ—

(৪১) Empire in Asia, p. 352—353.

চিকিৎসা কল্পদ্রুম।*

এই গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। "ইহাতে যাবতীয় ব্যাধি (পুরুষ, স্ত্রী, এবং শিশু ও বালকদিগের সর্ব্ব প্রকারের পীড়া—চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ,

* চিকিৎসা কল্পদ্রুম, অর্থাৎ রোগ নির্ঘণ্ট এবং তচ্চিকিৎসা। সচিত্র।—শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস, কর্ত্তৃক সংগৃহীত। চুঁচুড়া, ১৮৭৬।

গর্ভাবস্থার পীড়া, এবং সূতিকা পীড়া সমেত)—অ, আ, ই, ঈ, ক, খ, গ, বর্ণ ক্রমে শব্দ কোষাকারের সহিত, এবং প্রত্যেক ব্যাধির আবশ্যক স্থলে

নির্ব্বাচন	Definition.
উপশব্দ	Synonyms
প্রকার	Varieties.
লক্ষণ	Symptoms.
উপসর্গ	Complications.
পরিণাম	Termination
নিদান	Pathology.
কারণ ..	Causes.
স্থিতিকাল	Duration.
মৃত্যুসংখ্যা.	Mortality.
নির্ণয়তত্ত্ব	Diagnosis.
ভাবীফলার্থকতত্ত্ব	Prognosis.
চিকিৎসা	Treatment
অভিনব চিকিৎসা	Recent mode of Treatment.
লেখকের মত	Compiler's opinion.
প্রতিষেধ	Prophylaxis.

এই গুলি ক্রমান্বয়ে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মাসে মাসে ইহার এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। বলিতে কি যদুবাবু অত্যন্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের রোগ প্রায় অসংখ্য। গৃহে গৃহে, ইহার প্রমাণ। প্রতি মনুষ্যের শরীর রোগের আগার। এক্ষণে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বহুবিধ উন্নতি হওয়াতে রোগ মাত্রেরই অনেক প্রকার তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। একেত রোগের সংখ্যা করাই দুরূহ, তাহাতে রোগ মাত্র সম্বন্ধেই অসংখ্য তত্ত্ব জ্ঞেয়, ও সমালোচনীয় হইয়াছে। তাহাতে আবার যদু বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সকলের পর্য্যালোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থ অতি বৃহদ্ব্যাপার এবং যদু বাবুর স্বীকৃত ব্রত অতি কঠিন ব্রত বলিতে হয়।

কিন্তু ব্রত যেমন কঠিন, এবং ব্যাপার যেমন বৃহৎ, সুসম্পন্ন হইলে কার্য্যটি তেমনি মহাশুভ-ফলদায়ক হইবে। একেত কোন একটি শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্বন্ধীয় এক খানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ যে ভাষায় থাকে, সেই ভাষার সৌভাগ্য। সেই ভাষা যাহাদিগের একমাত্র অথবা প্রধান অবলম্বন, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ দুস্তর জ্ঞান সাগরে ভেলা স্বরূপ। তাহাতে আমাদিগের ভাষায় এরূপ এক খানি কোষ গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। কেন না, আমাদিগের ভাষায় বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব সম্বন্ধীয়, গ্রন্থ, অথবা কোন প্রকার সম্পূর্ণ, সর্ব্বতত্ত্ববাদী গ্রন্থ একবারে নাই। যাহার অদৃষ্টে মালা ঘুনসী যোটে না, তাহার পক্ষে বকুহার বিশেষ আদরণীয়। ইহার পর, যখন মনে করা যায়, এই কোষ দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয়, তখন ইহার সূচনা অস্মদ্দেশের বিশেষ গৌরব ও সুখের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

কেননা, বঙ্গদেশ রোগে আকুল। সুশিক্ষিত চিকিৎসকের ভাগ অতি অল্প।

বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। গ্রামবাসীদিগের ভাগ্যে অধিকাংশস্থলে—কেহই নহে—কেবল যম, অথবা তাঁহার অনুচরবৎ "কবিরাজ"—চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি না- ঔষধব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা চাসও করেন--এবং সময় পাইলে গাছরা ঔষধও বিতরণ করেন। একবেলা ধানের তলার ঘাস মারেন—আর এক বেলা শয্যাতলে মনুষ্য মারেন—কখনও কণ্টক কুল, কখনও রোগীকুল, নির্ম্মূল করেন। আমরা স্বীকার করি যে এ শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের সঙ্গে এ গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এরূপ চিকিৎসকগণ কেবল কৃষিদিগের গ্রামেই অবস্থান করেন। গ্রাম্য ভদ্রলোকদিগের সহায় বটিকা-ব্যবসায়ী কবিরাজ এবং কুইনাইনব্যবসায়ী নেটিব ডাক্তার। কবিরাজের বিদ্যা থাকিলে, আদরণীয় বটেন। কিন্তু অধিকাংশ কবিরাজের বিদ্যার শেষ সীমা একটি বচনার্দ্ধ—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।" তার পর প্রয়োজন হইলে চাণক্য-শ্লোক ও গঙ্গাস্তব আওড়াইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। নেটিব ডাক্তারগণ ছুরি কাঁচি শলা পটি মলম জোলাপ লইয়া রোগীগণকে বিত্রস্ত এবং দক্ষিণাভিমুখে সত্বরগামী করিতে বিলক্ষণ সক্ষম বটে, তাহার অধিক আর কিছু তাঁহাদিগের সাধ্য হয় না। তাহার দুইটি কারণ। এক এই যে তাঁহাদিগের কাছে যে ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বকালের খরিদ, ধূলি কর্দ্দমে কিঞ্চিৎ স্ফীত, কদাচিৎ লবণ ও ময়দার বিমিশ্রণে স্বাদবিশিষ্ট, সচরাচর মৃত কীটগণের দেহ [illegible] সুগন্ধিত; এবং হীরকচূর্ণের মূল্যে বিক্রীত। এরূপ ঔষধ গৃহস্থলোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না; কিনিতে পারিলে গলাধঃকরণ করিতে পারে না, গলাধঃকরণ করিতে পারিলেও কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় কারণ, পুস্তকের অপ্রতুল। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যে কয়টি স্থূল বিষয় ঘটিত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবসায় চলে না। নিত্য নূতন শিখিতে হইবে, যতকালে ব্যবসায় করিতে হইবে, ততকাল শিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ডাক্তারি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভূত হইতেছে। আজ যাহা সত্য, কালি তাহা মিথ্যা; আজ যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহা অগ্রাহ্য। আজ যাহা অসাধ্য, কাল তাহা সুসাধ্য। আর চিকিৎসক ও ব্যবহারাজীবের পুস্তকের উপর বিশেষ নির্ভর। যেমন কেহ সংসার ধর্ম্মের সকল দ্রব্য পকেটে লইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না, তেমনি কেহ এতদুভয় শাস্ত্রগত সকল তত্ত্ব স্মৃতি মধ্যে রাখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এইজন্য চিকিৎসকের পক্ষে ছুরি কাঁচি পটি বড়ী সিসি অপেক্ষা সৎপুস্তকের অধিকতর আবশ্যকতা। কিন্তু নেটিব ডাক্তারের ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট পুস্ত-

কের নিতান্ত অভাব। অনেকেই ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি হীন। তাঁহাদিগের অবলম্বন দুই একখানি ক্ষুদ্র, পুরাতন ইংরেজি গ্রন্থ। হয়ত সে গ্রন্থ প্রপিতামহের আমলের; নয় ত তাহাতে দুই তিনটি ব্যাধির মাত্র তত্ত্ব লিখিত আছে। তাঁহাদিগের প্রয়োজন যদ্দ্বারা সুনির্ব্বাহ হয়, এমত গ্রন্থ প্রায় নাই। যদু বাবুর এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের সেই অভাব পরিপূরণ হইবে।

যদুবাবুর এই গ্রন্থ প্রণয়ন যেরূপ কঠিন কার্য্য তাহা সহজে বুঝা যায়। ইহার প্রথম উপকরণ, লেখকের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা—অর্থাৎ সকল রোগের সকল তত্ত্বে পারদর্শিতা। এরূপ পারদর্শিতা দেশীয় চিকিৎসকের মধ্যে কত লোকের আছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা দুর্লভ, এ কথা বলিতে পারি। কেবল অধীত শাস্ত্র স্মরণ রাখাকে পারদর্শিতা বলি না। তদ্রূপ পারদর্শিতার দ্বারা এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন দুঃসাধ্য। অনেকের বোধ আছে যে ইংরেজিতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করণ পক্ষে, কেবল ভাষান্তর করিলেই হইল। সেরূপ ভাষান্তরে কেহ উপকৃত হয় না। কেহ কিছু বুঝিতে পারে না, কেহ কিছু শিখিতে পারে না। লেখকও যে কিছু বুঝিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণীকৃত হয় না। আমি যাহা ইংরেজিতে শিখিয়াছি, তাহা তোমাকে বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন, যে যাহা ইংরেজিতে আছে তাহা নিজে পরিষ্কার করিয়া বুঝিব; অধীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী হইব। তাহার পর ইংরেজির অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আপন চিত্ত হইতে তাহা তোমাকে বুঝাইব।

যদুবাবুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই এবং তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থে সেইরূপ অধিকারের লক্ষণ আছে। তবে, নূতন শব্দ লইয়া বড় গোলে পড়িতে হয়। ইংরেজিতে যে সকল ব্যাধি যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং নামপ্রাপ্ত, সেই সকলের ভাষান্তর দুর্ঘট। ব্যাধির, লক্ষণের, ঔষধের বাঙ্গালা নাম, তাঁহাকে নূতন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। বিশেষ শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নাম সকল দেশীভাষায় নাই, থাকিলেও তাহার ব্যবহার নাই, সুতরাং তাহার অভিনব ব্যবহারে ভাষা অত্যন্ত কটমটে ও আপাততঃ দুর্গম হইয়া উঠে। সে সকল যদুবাবুর দোষ নহে—বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার দোষে। যদুবাবু এইরূপ অপ্রচলিত শব্দ সকলের ব্যবহার কালে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ইংরেজি শব্দও লিখিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নার্থ গ্রন্থকারকে প্রথমতঃ বহুতর সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সকল রোগের সকল কথা লিখিতে হইবে, সুতরাং প্রায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল গ্রন্থ ঘাঁটিতে হইতেছে। এই সংগ্রহ পর্য্যায় ক্রমে সংকলিত এবং যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। তাহার

পর, লেখক নিজ মত সকল তাহাতে সংযোগ করিয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তার পর মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের পারিপাট্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই কার্য্যটি অতি উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। যে গ্রন্থ অপর সাধারণের ব্যবহারের প্রত্যাশা দেখা যায় না, তাহার উপর সাহস করিয়া এত ব্যয় করিতে, আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিশেষ ইহাতে যে চিত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে অসাধারণ ব্যবহার। প্রথম খণ্ড ষোল পৃষ্ঠা মাত্র। তাহাতে তিনটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে, প্রথম প্রসূন, দ্বিতীয় জরায়ুজ প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রসূন সংশ্লেষ, তৃতীয় দর্শনচক্র। চিত্রগুলি দেখিলে উৎকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

এরূপ বহুব্যয় ও বহুশ্রমসাধ্য জাতীয় কীর্ত্তি, সাধারণের কাছে বিশেষ সাহায্য ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। এবং সেই সাহায্য দান বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থখানি কেবল নেটিব ডাক্তারদিগের প্রয়োজনীয় এমত নহে, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসকেরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কেননা, ইহাতে সর্ব্বরোগতত্ত্ব একত্রিত, শ্রেণীবদ্ধ, এবং যথাস্থানসন্নিবেশিত থাকিবে, এবং যদু বাবুর ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিজের মতও লিখিত থাকিবে। আর যদি যদু বাবু, এই সঙ্গেই বৈদ্যগণমধ্যে সুপরিচিত রোগ সকলের দেশী চিকিৎসা সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে আরও বিশেষ ফলোপধায়ী হইবে।

আমাদিগের বিবেচনায় কেবল চিকিৎসক কেন, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই এরূপ গ্রন্থ খানি ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে সকলেই নিজ গৃহ মধ্যে, অথবা নিজ পল্লী মধ্যে চিকিৎসা করিতে পারা নিতান্ত স্পৃহণীয়। এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে বাল্যকাল হইতে যাঁহারা চিকিৎসা শিক্ষা এবং ব্যবসায় না করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া কেবল রোগীর মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। যেখানে রোগ কঠিন অথবা ঔষধ দুষ্প্রযুজ্য সেই খানে এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র সত্য নহে। সামান্য সবিরাম জ্বরে, একটু কুনাইনের ব্যবস্থা করা, বা বাহ্য প্রদাহ দেখিলে তপ্ত সেকের পরামর্শ দেওয়া, বহুজ্ঞান বা বহুদর্শিতা সাপেক্ষ নহে। অথচ ইহাতে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয়। সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দুই এক খানি সৎপুস্তক অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে স্বপরিবার এবং দরিদ্র প্রতিবাসীগণের মধ্যে অনেক উপকার করিতে পারেন। আর সকলেরই কখন না কখন এমত অবস্থা ঘটে যে গুরুতর বিপদ উপস্থিত—কিন্তু চিকিৎসক পাওয়া যায় না। অনেকেই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। এই সকল সময়েরই জন্য, সক-

ন্দেরই কিছু কিছু জ্ঞান এবং কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ থাকা চাই। যাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা, যদু বাবুর পুস্তক তাঁহাদিগের বিশেষ সহায় হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান শিল্পাদির উৎসাহ জন্য যে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকৃত আছেন, সাহেবদিগের নিকট অপরিচিত কোন বাঙ্গালী কি তাহার কিয়দংশ পাইতে পাবে না? যদি পারে, তবে যদু বাবুর এই গ্রন্থ তাহা পাইবার বিশেষ অধিকারী। কেননা এরূপ বৃহৎ এবং ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ অস্মদ্দেশে সমাজ-সাহায্য এবং রাজ-সাহায্য উভয়ও ব্যতীত কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীবঃ—

পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি।

১

কে তুমি বরাঙ্গী! বসি অলিন্দ উপরে,
কহ মোরে সুহাসিনি। কে তুমি রমণী,
বিকচ কুসুম বপু আবরি অম্বরে,
কেন আজি ম্লান-মুখী কুরঙ্গ-নয়নী!
* * তুমি জানি বরাননে,
কেন বসি একাকিনী নিরানন্দ মনে।

২

কি কারণে ম্লান নীল নলিন নয়ন,
অরঞ্জিত কেন শ্যাম নিবিড় কুন্তল,
বিরস মলিন মরি নিথর বদন।
উষার হিমাংশু যথা মলিন সজল,
অলিন্দ উপরে বসি ভুবন-সুন্দরী—
অলিন্দে অচল যেন রূপের লহরী।

৩

মলিন বদন চারু মলিন নয়ন,
কেন হেরি কহ অয়ি শশি-নিভাননে,—
এইত তোমার বালা কুসুম যৌবন
বিকসিত জীবনের প্রমোদ কাননে,
এইত ফুটিলে তুমি মধুরা উষায়,
রূপের অপরাজিতা যৌমের লতায়।

৪

অতুল ঐশ্বর্য্য, তুমি রাজরাজেশ্বরী—
অনন্ত সম্পদ তব তায় এ ভুবনে,
কি অভাব ত্রিজগতে তোমার সুন্দরী?
তবে কেন ম্লান মুখ নিরখি নয়নে,
তবে কেন হায় তব নয়নের জল,
কোমল বয়ান বহি ঝরে অবিরল?

৫

এখনি কি কীট-রাশি বিকচ কুসুমে
পশিয়া নাশিল তার শোভা নিরমল;
শুকায় কি প্রভাতের তপন-কিরণে
শারদের তামরস প্রফুল্ল তরল;—
নিরখি তোমার বালা সজল বদন,
অন্তরে অনন্ত শোক হয় উদ্দীপন।

৬

ঊষার পঙ্কজ জিনি-স্ফুট মনোরম
অনঙ্গ-তুলিতে আঁকা নয়ন তোমার;
বল সখি! বিধাতা কি করিল সৃজন,
ঝরিতে কেবল তায় অনন্ত আসার;
আছে কি এ ত্রিভুবনে এমন পাষাণ,
তোমাকে নিরখি যার কাঁদেনা পরাণ?

৭

ডুবিলে পশ্চিমে রবি সন্ধ্যার মিলনে,
মধুর প্রভাতে কিম্বা নিরখি যখন,
ও বদন—পূর্ণ চাঁদ—অলিন্দ সদনে,
তখনি নিরখি তব সজল নয়ন,
তখনি নিরখি পদ্ম করতল-পরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র বিষাদের ভরে।

৮

তখনি নিরখি মেলি নয়ন অমলে,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে গগনের পানে;
কিম্বা হেরি সরসীর প্রফুল্ল কমলে,
দেখিতেছ জললীলা সুমন্দ পবনে;
রাজরাণী হ'য়ে তুমি চির-দুঃখিনী;
অনন্ত সংসারে তুমি অনন্ত-দুঃখিনী।

৯

দেখিয়াছি প্রতিদিন ও চন্দ্র-বদন,
বিকশিত বিম্বাধর দেখেছি সুন্দরী;
কিন্তু অয়ি বিনোদিনি! দেখিনি কখন
মধুর অধরে তব হাসির লহরী;
দেখিয়াছি শত বার নয়ন কমলে
নয়নের চিরজল মুছিতে অঞ্চলে।

১০

কুল-বিহঙ্গিনী বসি কুলের পিঞ্জরে
ফেলিতেছ দিবা নিশি নয়নের জল,
বিষাদ-সঙ্গীত দুঃখ তরলিত স্বরে
মনের অনন্ত দুঃখে গাও অবিরল,—
সেই দুঃখ এজনমে যাবে না কখন,
অনন্ত যাতনা তব ললাট লিখন।

১১

সরল অন্তর তব—প্রেম পারাবার,
সরল অন্তর তব পূরিত প্রণয়—
সেই সুকুমারতর অন্তরে তোমায়
চির প্রেমময়ী কত তরঙ্গিণী বয়;—
সেই তরঙ্গিণী স্নিগ্ধ সুকোমল
তোমার কপালে আজি পূর্ণ হলাহল।

১২

বিষময় বিবাহের কুসুম-শৃঙ্খলে,
বাঁধিল তোমার যবে পাণি সুকোমল,
হৃদয় ভিতরে প্রেম-সরসীর জলে,
মুকুলিত হল যবে প্রণয় কমল;
ভাবিলে তখন মনে সেই পরিণয়
আনন্দের নিকেতন হইবে নিশ্চয়।

১৩

বিধাতার বিড়ম্বনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
আজি সেই পরিণয়—কুসুমের হার
তোমার কপাল দোষে, অয়ি অভাগিনী;
চির হলাহলময় ভুজঙ্গ-আকার;
ভাগ্য দোষে হায় তব জীবন-সাগরে,
মুদিল সুখের পদ্ম চিরদিন তরে!

১৪

পতি তব হতভাগ্য, নৃশংস নির্দ্দয়,
ত্যজি হেন সুবর্ণের চারু পঙ্কজিনী,—
চির মধুমতী স্বর্গ অমিয়-নিলয়,
বিনোদ কুসুম রূপে ভুবনমোহিনী,
প্রফুল্ল মল্লিকা ফুল রূপের কাননে,
স্বর্ণময়ী তারা কিম্বা নিদাঘ গগণে।

১৫

পাষাণের সম তব পতির অন্তর,
তা না হলে ত্যজি হেন কুসুম কামিনী—
চিরপতি-পরায়ণা, সুমধুরময়,
প্রণয়ের সুশীতল রম্য প্রবাহিনী—
দুঃখের সাগরে কেন হইবে মগন,
করিবে জ্বলন্তানলে জীবন অর্পণ ?

১৬

কি কুক্ষণে পরিণয় হইল তোমার,
পরাইলে ফুলমালা নির্ম্মম পাষাণে ;
সুখের ললামময় মূর্ত্তি সুকুমার,
দেখিল না কোন দিন পুলকিত প্রাণে ;
একাকিনী মনোদুঃখে বসিয়া নির্জ্জনে,
কান্দিবার তরে শুধু জন্মিলে ভুবনে।

১৭

শোভিলে না কোন দিন তুমি সুহাসিনী,
প্রেমময় প্রাণেশের হৃদয় সদনে ;
বসিলে না পতিপ্রেমে হ'য়ে সোহাগিনী ;
পতির কোমল অঙ্ক—প্রেম-সিংহাসনে ;
প্রণয় মিলনে কিম্বা হইয়া বিহ্বল,
চুম্বিলে না কভু নাথ-বদনকমল।

১৮

এমন পতির কণ্ঠে কমলের দল
জিনিয়া কোমলতম বসন্ত-কামিনী,
সাজে কি কখন মরি মণি সমুজ্জ্বল,
সাজে কি পবিলে কভু চিরভিখারিণী,
উষার মধুর চম্পা প্রচণ্ড অনলে,
মুকুতার মালা কিম্বা বানরের গলে ?

১৯

রাজ-অট্টালিকা-সম প্রাসাদ তোমার ;
অই দেখ সুহাসিনী চির শূন্যময়,
কোথায় প্রাণেশ তব—সকলি আঁধার,
নীরব বিজন অই আমোদ নিলয়,
অবরোধে তুমি সুধু বসি একাকিনী—
সুবর্ণ পিঞ্জরে যেন বন-বিহঙ্গিনী।

২০

অই দ্বারে দৌবারিক ফিরিছে উল্লাসে,
সহস্র কিঙ্কর অই নিদ্রায় কাতর,
সখের বিহঙ্গকুল, পিঞ্জর সকাশে
ছড়াইছে সেই অই সুমধুর স্বর ;
হায় রে প্রাণেশ তব কোথায় এখন,
বারাঙ্গনা-প্রেম-নীরে রয়েছে মগন !

২১

সেই বার-রমণীর হৃদয় ভিতরে,
থাকিলে থাকিতে পারে মধুর প্রণয় ;—
সেও বটে প্রেম-রত্ন সমুজ্জ্বলতর,
সে প্রেমেও প্রাণ মন সুশীতল হয় ;
কিন্তু বল বিনোদিনী কি দোষ তোমার,
কেন তুমি পতি-চক্ষে বিষের আগার ?

২২

অই পতি-বিবর্জিতা চির-অভাগীর
দেখিলে বদন খানি প্রেমে বিস্ফারিত,
প্রণয়ের প্রতিকৃতি, নয়ন সজীব,
বিষাদে হৃদয় আহা হয় উচ্ছসিত ;
ইচ্ছা করে সমাজের কঠোর নিয়ম
এখনি জলন্তানলে করি অরপণ !

* * * *

২৫

কত শত সিমন্তিনী রূপে বিদ্যাধরী—
শরদিজ শশি-কলা, কিম্বা মনোরম,
নিরাশার হুতাশনে দিবস শর্ব্বরী
জ্বলিয়া হয়েছে আহা অঙ্গার বরণ !
কবে অই বামাকুল পাবে পরিত্রাণ,
বিবাহের কুনিয়ম হবে অবসান ?

* * * *

শ্রীহঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঔষধ-সার-সংগ্রহ। কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অপ্রকাশিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ ফার্ম্মা কোপিয়া ও বিবিধ অভিনব পুস্তক অবলম্বন করিয়া, ডাক্তার নেলিগ্যান্ প্রদর্শিত নিয়মে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে ভৈষজ্য বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে অতি সংক্ষেপে অথচ পরিস্ফুটরূপে এই গুরুতর বিষয় যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। এই জন্য আমরা মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ও ছাত্রদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এই পুস্তকের আদর করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

ভারত-সুহৃৎ—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। আমরা উপর্য্যুপরি এই পত্র খানির কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধও আমরা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু কোন ২ প্রবন্ধে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমাদিগের মতে নিতান্ত অপরিপক্ব। এরূপ অপরিণত মত চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট আদরণীয় হইবে প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপ মত পাঠে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি যুবকমণ্ডলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য আমরা আমাদিগের মফঃস্বলস্থ সহযোগীকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন মত প্রচার বিষয়ে কিঞ্চিৎ সতর্ক হয়েন। মফঃস্বল হইতে এরূপ পত্রিকা প্রচারিত হয় ইহা আমাদিগের নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। আমরা সম্পাদক ও লেখকগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে পরম প্রীত হইয়াছি।

অবকাশ-গাথা—কোষকাব্য বিবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত। ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সংস্কৃত হইতে বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্ধ আহরণ করিয়া এই কবিতা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান অতি সুললিত। ইহার অনেক স্থল আপাতত পড়িতে সংস্কৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বই আর কিছুই নয়। যে সকল কবি একঘেয়ে ছন্দে পাঠকদিগের ধৈর্য্য লোপ করিয়া থাকেন, এই ছন্দোময়ী কবিতা তাঁহাদিগের উপদেশস্থল।

প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সমাজের অর্থ একতা, এবং একতার অনিবার্য্য প্রয়োজন স্বার্থের সম্পূর্ণ-মূলোচ্ছেদ ও প্রণয়াদি হৃদ্‌বৃত্তি সকলের পূর্ণ প্রসারণ। যেমন বংশ বৃদ্ধিতে বাধ্য হইয়াই মানুষকে সমাজ বদ্ধ হইতে হইয়াছে, তেমনি বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে স্বার্থের মূলোচ্ছেদ ও হৃদ-বৃত্তি সকলের প্রসারণ করিতে হইবে। কেহ ২ ইহাতে এমন তর্ক করিতে পারেন, যেমন মিল্ তাঁহার কোমৎ দর্শন সমালোচন কালে কোমতের উক্ত রূপ মতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, যে স্বার্থের মূলোচ্ছেদ করিতে গেলে, স্বাতন্ত্র্যের (Individuality) মূলোচ্ছেদ করা হয়; স্বাতন্ত্র্য মানবের সৌন্দর্য্য, অতএব স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইলে, মানুষের সৌন্দর্য্য গেল, সৌন্দর্য্য গেলে মানুষের আর থাকিল কি? কিন্তু আমরা বলি স্বার্থের মূলোচ্ছেদ হইলে স্বাতন্ত্র্যের মূলোচ্ছেদ হয় না, মানবীয় সৌন্দর্য্যের লোপ না হইয়া বৃদ্ধি পায়। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য (direct end) করিয়াই মিল্, স্পেন্সর প্রভৃতি উক্ত মতের উদ্ভব করিয়াছেন। আমার সুখ আমার উদ্দেশ্য, আমি যাহাতে আমার সুখ পাই, তাহাই করিব, আমি আমার আশু সুখ উপেক্ষা করিয়া অপরের সুখের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিব এ কেমন কথা? আমার স্বত্বনাশ করিয়া অপরের সুখের হেতু হইয়া জীবন যাপন করা, জীবনকে শ্রীহীন করিয়া অপরের দাস করা মাত্র। এই নিমিত্তই স্পেন্সর কহিয়াছেন "অন্যের সুখের ব্যাঘাত না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন সুখের অনুসরণ করুক।" ইহাতে স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা হইবে, সুখও সম্ভবমত আয়ত্ত হইবে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের পথ-নির্দ্দেশন করা হইল কই? আকাঙ্ক্ষিত উপপাদ্যের মন্তব্যের পূরণ হইল না। আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য, পূর্ণ সুখ উপভোগ করা। অন্যের সুখের ব্যাঘাত না করিয়া সুখ উপভোগ করিতে গেলে, সংসারে অতি অল্প সুখই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। হডন উদ্যানে এক ব্যক্তি নির্জ্জন সুখ উপভোগ করিব, বলিয়া বসিয়া আছেন, আমি তথায় গেলে তাঁহার সুখের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং আমার কিম্বা অপর কাহার, স্পেন্সরের মতে তথায় যাওয়া উচিত নহে। পুনশ্চ মানব কখন কোন্ সুখের উপভোগে নিমগ্ন আছে, তাহার ব্যাঘাত নিবারণের জন্য সতর্ক হইতে হইলে সর্ব্বদা উহা জানিয়া উঠাও সহজ নহে; আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অপরের সুখের লঘু গুরু ব্যাঘাত না করিয়া থাকিতে

পারি না। স্বার্থের সহিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। মানিলাম সুখই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করিতে গেলে, কেবল স্বার্থেরই পূর্ণ মুক্তি দ্বারা উহা আয়ত্ত হইতে পারে, অন্যথা সুখের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। স্পেন্সর উদ্দেশ্যকে খাটি করিয়া উপায় রক্ষা করিয়াছেন; তিনি সুখের পূর্ণ উদ্দেশ্যকে সংকীর্ণ করিয়া তাহার উপায় সমাজ-নীতি রক্ষা করিয়াছেন। মানুষের অসামাজিক অবস্থায় সুখের পূর্ণ উপভোগই মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, মানুষ উহার আয়ত্তির নিমিত্ত স্বার্থের পূর্ণ মুক্তি দান করে। এখন যেমন মানুষকে বাধ্য হইয়া সমাজ বদ্ধ হইতে হইয়াছে, এই বাধ্যতার ফল ভোগ স্বরূপ, প্রকৃতির দণ্ড স্বরূপ, তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য খাট করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হইবে; মানুষের যেন আর পূর্ণ সুখ উপভোগ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমরা এই সামাজিক অবস্থাতেও পূর্ণ সুখকে অবশ্য উদ্দেশ্য করিব, এবং সেই উদ্দেশ্য আয়ত্তির উপায় ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ ও ফরাসি পণ্ডিত কোমৎ যাহা দেখাইয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য দেখাইতেছি। ইহাঁদের মতে সামাজিক জীবনে সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য না করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করিতে হইবে; জীবনে আত্ম-সুখ ভুলিয়া গিয়া অপরের সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিতে হইবে; সুতরাং স্বার্থের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রণয়কেই জীবনের কার্য্যের বলবৎ সহায় করা চাই। অপরের সহিত আপন জীবনকে একীভূত করিতে হইলে, গাঢ় ও তন্ময় করিতে হইলে, প্রণয় ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু এখানে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আত্ম-সুখ ভুলিয়া গিয়া অপরের সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য করিব একথার তাৎপর্য্য কি? আমরা এ সম্বন্ধে এস্থলে মিলের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। মিল্ পূর্ব্ব জীবনে এই মতের বিপরীত-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পর জীবনে তাঁহার নিজ জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার সময় পূর্ব্বমতের বিপরীত মতাবলম্বনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিল্ ইতিপূর্ব্বে কিছু দিন হইতে মানসিক বিমর্ষতা রোগে ভুগিতে ছিলেন; এই রোগ কোন সাংসারিক দুর্ঘটনা বশতঃ নয়, মানুষের মন সময়ে সময়ে যেরূপ অকারণ দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়, উহা তাহাই মাত্র। এই সময়ে মিলের মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে এক দিবস (Marmontel's Memoires) পড়িতে পড়িতে, তাহার মধ্যে যে স্থলে মারমনটেলের পিতার বিয়োগে সেই পরিবারের ঘোর দুর্দ্দশাস্থলে উপনীত হইলেন, মারমনটেল্ তখন কেবল বালক মাত্র, সহসা উত্তেজিত হইয়া পরিবার সকলকে ইহা বুঝাইলেন, যে তিনিই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হইবেন, পরিবারবর্গেরা যাহা হারাইয়াছেন তিনিই তাঁহাদিগের

সকল অভাবই পূরণ করিবেন। এই শোকাবহ জাজ্বল্যমান দৃশ্যটি মিলের মনে পূর্ণ উদয় হওয়াতে, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইহা হইতেই মিলের অন্তরের ভাব লঘুতর হইয়া আসিল এবং তাঁহার মৃতবৎ হৃদবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর মিল্ লিখিতেছেন;—"এই সময়ের ভূয়োদর্শনে আমার মতের এবং স্বভাবের উপর দুইটি বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়। আমি এক্ষণে এমন একটি জীবন্-মত অবলম্বন করিলাম, যাহা আমি পূর্ব্ব জীবনে যদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং বোধ হয় আমি এই সময়ে কারলাইলের (Carlyle) আত্ম ভাব বিদ্বেষী মতের বিষয় কিছুই শুনি নাই। সুখই যে জীবনের নীতি, জীবনের কার্য্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে আমি ইহাই ভাবিলাম যে, এই উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য না করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় যে সকল ব্যক্তিরা আপনার সুখ ছাড়া অপর কোন বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে; অপর কোন ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে, সমস্ত মানব জাতির উন্নতির বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে, অথবা যে কোন ফল বা কার্য্যকে উদ্দেশ্যের উপায় বলিয়া অনুসরণ না করিয়া, তাহাকেই মনসিজ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই সুখী। এইরূপে অপর কোন বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়া মানব তাহার অনুসরণেই সুখ পাইয়া থাকে।—যদি তুমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, তুমি সুখী কি না, তুমি তৎক্ষণাৎ দেখিবে তুমি সুখী নহ। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য না করিয়া, তাহার অতীত কিছু লক্ষ্য করাই সুখ পাইবার একমাত্র উপায়।—এই মত এক্ষণে আমার জীবন-দর্শনের মূল-ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। এবং আমি অদ্যাপি এই মত দৃঢ় ধারণ করিয়া আছি যে, ইহা যে সকল ব্যক্তির কিয়ৎ পরিমাণ অনুভূতি ও উপভোগ শক্তি আছে অর্থাৎ মানব মণ্ডলীর অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মত অতি উৎকৃষ্ট মত।" আমরা স্বীয় মত পরিপোষণার্থে মিলের ন্যায় গভীর চিন্তাশীল উদারপ্রকৃতি ব্যক্তির মত*

---

* The experiences of this period had two very marked effects on my opinions and character. In the first place, they led me *to* adopt a theory of life, very unlike that on which I had before acted, and having much in common with what at that time I certainly had never heard of, the anti-self-consciousness theory of Carlyle. I

উদ্ধৃত করিলাম। মিল্, কারলাইল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি এই মতের অনুমোদন করিলেও, ইংলণ্ডীয় সমাজ নীতিতে অদ্যাপি ইহার শক্তি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা বিশেষ জানি না, যে রূপ শুনিতে পাই, ফরাসী সমাজনীতিতে সদ্বৃত্তির প্রসারণ, প্রেমের প্রসারণ, নিস্বার্থপরতা, পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহার কতদূর ব্যাপ্তি হইয়াছিল এবং এখনও কতদূর বর্ত্তমান আছে, আমরা এই কৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহা দেখাইব।

আর্য্যজাতির ইতিহাস নাই, কিন্তু ইতিহাস অনুদ্ধার্য্য একথা বলিতে পারি না। ইতিহাস গঠনের উপাদান সম্পূর্ণই বর্ত্তমান আছে। শিল্প, সাহিত্য, অর্থাৎ চিত্র, তক্ষণ, হর্ম্ম্য প্রণালী প্রভৃতি

---

never indeed, wavered in the conviction that happiness is the test of all rules of conduct, and the end of life. But I now thought that this end was only to be attained by not making it the direct end. Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness; on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art or pursuit, followed not as a means, but as itself an ideal end. Aiming thus at something else, they find happiness by the way. The enjoyments of (such was now my theory) are sufficient to make it a pleasant thing, when they are taken *en passant*, without being made a principal object. Once make them so, and they are immediately felt to be insufficient. They will not bear a scrutinizing examination. Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so. The only chance is to treat, not happiness, but some end external to it, as the purpose of life. Let your self consciousness, your scrutiny, your self-interrogation, exhaust themselves on that; and if otherwise fortunately circumstanced you will inhale happiness with the air you breathe, without dwelling on it or thinking about it, without either forestalling it in imagination, or putting it to flight by fatal questioning. This theory now became the basis of my philosophy of life.

See Mill's Autobiography, From page 139 to 143.

শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্য ও ধর্ম্ম, কিরূপে সূত্রপাত হইয়া কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহার আপূর্ব্ব উপাদান, বহুল ধ্বংসের পরেও এখনও একরূপ বজায় আছে, ইহা হইতেই আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির চিত্র, এখনও উজ্জ্বলরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন, বিজ্ঞত্ব ও প্রখর ধীষণা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিরই এই কার্য্য সম্ভব। আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র বিদ্যা বুদ্ধিতে কৃষ্ণ চরিত্র উপলক্ষে, এই মহদ্ব্যাপারের আভাস কয়েক স্থল স্পর্শ করিব মাত্র।

আর্য্যজাতির উন্নতির ক্রম অনুশীলন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বৈদিক কাল অবলম্বন করিতে হয়। এই বৈদিক কালে আর্য্যজাতির শিল্প সাহিত্যজ্ঞানের অবস্থা কি তাহার অনুশীলন আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়: আমরা কেবল সমাজনীতির আভাস মাত্র উদ্ধৃত করিব। যেহেতু আর্য্যজাতির সমাজনীতির উন্নতিই আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈদিক কাল আমাদিগের এ প্রস্তাবের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হইলেও, উহাকে আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল ভিত্তি করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের তত বিরক্তিকর না হইয়া, আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। মানব সমাজ সাধারণতঃ প্রয়োজনের দাস। প্রয়োজনের বাধ্য হইয়াই মানুষ তাহার উপায় অন্বেষণ করে, এবং এই অন্বেষিত উপায় সকলই সেই সেই কালের প্রয়োজন-সাধিনী কর্ত্তব্য নিয়ম বা নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্য্যগণ যখন তাঁহাদিগের আদি বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চনদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম ভারতভূমে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই সময়ের ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না। বৈদিক কালের অবস্থা যে তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার ভূয়সান্ আভাস পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার আভাসও কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত করাইয়া দেয়। বৈদিক কালের পূর্ব্বে তাঁহাদের সমাজের অবস্থা যে উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।* মানব অতি আদিম অবস্থায় অন্য জ্ঞানের অভাবে এই সকল সৃষ্টিকে তাঁহারই ন্যায় জীবন্ত জ্ঞান করে; পরে ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে ক্রমে সৃষ্টির জড়ভাবত্বের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু সৃষ্টির গতি ও কার্য্য দেখিয়া মানব তাহার অভ্যন্তরে কোন অতীত প্রকৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। মিল্ এই কথা তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক তিন প্রবন্ধের একস্থানে বিস্তীর্ণরূপে বুঝাইয়াছেন। ঋক্‌বেদ এবং

---

* আমরা এই বৈদিক কালকে কেবল ঋক্‌বেদের কালই কহিতেছি; যেহেতু সামবেদ বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদের কাল ঋক্‌বেদের কাল হইতে অনেক পরে বোধ হয়।

তাহার পূর্ব্বকালের আর্য্য অবস্থা কেবল ঋক্‌স্তোত্র গুলির অর্থ মাত্র বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলে, এই সময়ের অবস্থা বলিয়াই বেশী উপলব্ধি করাইবে। কিন্তু ঋক্ সকলের যে বিচিত্র ও ব্যাপ্ত কবিত্ব শক্তি, তৎকালীন মনের ভাব প্রকাশক, বহু বিশেষণ সম্পন্ন উহার ভাষার যে প্রশস্ত সম্বল (আধুনিক সংস্কৃত ভাষার প্রশস্ততা আমরা উল্লেখ করিতেছি না) সমাজ-নীতিজ্ঞান ও ঐশিক জ্ঞানের উৎকর্ষ্য যত টুকু প্রকাশ করে, তাহাতে তৎকালীন আর্য্যগণকে সমাজোন্নতির দ্বিতীয় সোপা-নান্তর্ভূত বলিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা উক্ত সোপা নের শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ মক্ষমূলর কৃত ঋক বেদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমতঃ কবিত্ব ও বর্ণনা-চাতুর্য্য স্বরূপ—

"Those who stand around while he moves on, harness the bright red steed, the lights in heaven shine forth."

"যাহারা তাঁহার গমন সময়ে তাঁহার চতুস্পার্শ বেষ্টন করিয়া চলে, যাহারা তাঁহার লোহিতাশ্বের বল্‌গা স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় আলোক সকল প্রদীপ্ত হও।" (প্রথম মণ্ডল, ছয় সূক্ত, প্রথম স্তোত্র)

পুনশ্চ;—

"The pious singers (the Maruts) have, after their own mind, shouted towards the giver of wealth, the great, the glorious (Indra.)"

"সেই পবিত্র-সঙ্গীতকারী মরুদ্গণ আপন ইচ্ছায় ধনদাতা, মহান্, গৌরবা-ন্বিত ইন্দ্রের যশোগান করিতেছে।" (প্রথম মণ্ডল, ছয় সূক্ত, ছয় স্তোত্র)।

দ্বিতীয়তঃ ঐশিক জ্ঞানের একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"when you thus from afar cast forwards your measure like a blast of fire, through whose wisdom is it, through whose design? To whom do you go, to whom, ye shakers (of the earth)?"

"যখন তুমি দূর হইতে অগ্নির ঝঞ্ঝার ন্যায় তোমার শক্তিকে নিঃক্ষেপ কর, কাহার জ্ঞানে এবং কাহার কল্পনায় উহা করিতে সমর্থ হও? কাহার নিকটে তোমরা গমন কর, কাহার নিকটে, হে পৃথিবী আলোড়নকারী মরুদ্গণ?"

(ঐ গ্রন্থ ৮১ পৃষ্ঠা, প্রথম স্তোত্র।)

এই স্তোত্রে দেখা যাইতেছে এই কালের আর্য্যগণের ঐশিক জ্ঞান, জড়া-ধার প্রকৃতির কল্পনা ছাড়াইয়া জগৎকারণ তাহারও অতীত কোন বস্তুর অনুমান করিতেছে; জড়াধার মরুতাদি প্রকৃতি-বাও সেই অনুমেয় বস্তুর দাস।

তৃতীয়তঃ সমাজনীতি বিষয়ক একটি স্তোত্র;—

"Let not one sin after another

difficult to be conquered, overcome us; may it depart together with lust."

"একটি পাপের পর আর একটি দুর্জ্জয় পাপ আমাদিগকে যেন অভিভূত না করে; দুরাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহারা যেন চলিয়া যায়।" (ঐ গ্রন্থ, ৬৫ পৃষ্ঠা, ৬ স্তোত্র)।

এই স্তোত্রে পাপ অর্থে তাঁহারা কি বুঝিতেন তাহাব কিছুই পরিব্যক্ত নাই; কিন্তু অপরাপর স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ আছে। প্রবঞ্চনা, মিথ্যাব্যবহার, অনপরাধির প্রতি অভিসম্পাত, পরস্ত্রীতে অভিলাষ প্রভৃতি সমাজনীতিগুলি সেই কালে সমাজে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমাজনীতিগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে, যে এইগুলির ঠিক সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষ স্বাতন্ত্র্য-জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিলেই এইগুলি আশু প্রয়োজন হইয়া উঠে। স্বাতন্ত্র্যজীবনে ছলে বলে অন্যের অধিকার হরণ পূর্ব্বক আপনার সুখ বৃদ্ধি করার কোন বাধা ছিল না; কিন্তু সামাজিক জীবনে উক্ত ব্যবহার ঘোর অনিষ্টোৎপাদনের এবং মানবকুল-নির্ম্মূলের কারণ হইয়া উঠে। এই অত্যায় নিবারণের নিমিত্ত আশু মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষ নিবারণের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমার অধিকার লইবে না; আমি মিথ্যা বাক্যে বা মিথ্যা ব্যবহারে তোমাকে কোন অনিষ্টপাতে নিক্ষেপ করিব না; নিরপরাধে তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশে অভিসম্পাত করিব না; একজনের উপভুক্ত স্ত্রী অপরজনে ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু ইহা করিতে হইলে (এক জন অপর জন হইতে দূরে নয়) একজনকেই অবশ্যই অপর জনের প্রতিহিংসা ভোগ করিতে হইবে; তাহাতে ক্রমে সমাজে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজ নষ্ট হইবার সম্ভব; এই নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে, স্বার্থ সংঘর্ষের বিরুদ্ধে আশু অনিষ্ট নিবারণ মাত্র কতকগুলি সমাজ নিয়ম বা নীতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিয়ম বা নীতি সকল প্রবর্ত্তিত হইবার পরেই আমরা স্বীকার করিব, মানুষের স্বাতন্ত্র্য কালের অবস্থা হইতে এই কালের অবস্থা অনেক অবনত হইল; যেহেতু স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা সুখে কখন পূর্ণ উদ্দেশ্য করিতে পারি না, কিন্তু এই অবস্থায় মানুষের স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কতকগুলি নিয়ম সৃষ্ট হইয়া তাহার পথ অবরোধ করিল, সুতরাং সুখ এক্ষণে আর আমাদের পূর্ণ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য জীবনে সুখোদ্দেশ্য পূর্ণ ছিল, এক্ষণে সুখোদ্দেশ্য আংশিক হইল। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার করিব, এককালে সামাজিক জীবন হইতে যে প্রভূত

সুখের উৎপত্তি হইবে এই তাহার পত্তনভূমি। স্বাতন্ত্র্য-জীবন একটি ক্ষুদ্র সরোবরে একটি মাত্র প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিল, কিন্তু এই অবস্থার সামাজিক জীবন অগণ্য কুট্মলপরিবৃত বিশাল সরোবর; এই সকল কুট্মল যে এক দিন সহস্র দল বিস্তার করিয়া সমস্ত সরোবর জুড়িয়া গিয়া একীভূত হইবে, ও জগতে অতুল্য সুষমা ও সৌরভ বিস্তার করিবে আমরা সেই দিনের আশা করিতেছি। নিয়ম দল পরিবৃত কুট্মল প্রয়োজনোৎপন্ন ফল, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি না। মানুষ কিন্তু এই সকল নিয়মের হাত সহজে এড়াইতে পারে না; ইহার যন্ত্রণা অনুভব করিলেও এড়াইতে পারে না, ইহার অবধারিত কাল আছে, সেই কালে তবে মানুষ ইহার হাত এড়াইবে। যন্ত্রণা বোধ হইলে তবে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা উপস্থিত হয়, চিন্তা উপস্থিত হইলে সুদূরদর্শী, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহার উপায় স্থিরীকৃত হয়। উপায় স্থিরীকৃত হইলেও সাধারণ লোকে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে এবং উহা অভ্যাস করিতে যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করে; সুতরাং মানুষ নিয়ম হাত সহজে এড়াইতে পারে না।

আর্য্যগণের এই কালের অবস্থা নীতি-সকল প্রবর্ত্তিত করিতেছে, আশু উচ্ছৃঙ্খলার উপায় স্থির করিতেছে, কিন্তু নিয়ম সকল তখনও গাঢ় হয় নাই, নিয়ম জনিত কষ্টও তখনও অনুভূত হয় নাই, সুতরাং সে নিয়মের হাত এড়াইবার উপায়ও চিন্তার তখনও প্রয়োজন হয় নাই। তখন ও "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" "তে তে সৎ পুরুষাঃ, পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে—"এই সকল মনসিজ নীতি দূরে রহিয়াছে। নিয়ম হাত এড়াইয়া সমাজের একতা সম্পাদন পূর্ব্বক পূর্ণ সুখোদ্দেশ্য রক্ষার এই সকল নীতি যুগান্তর পরবর্ত্তী কালের মুনীষিগণের শিরে নিমজ্জিত রহিয়াছে। আর্য্যগণের বৈদিক কালের নীতি সকল যে তখনও সমাজে দৃঢ় স্থান পায় নাই আমরা তাহার একটি উদাহরণ দেখাইতেছি।——

"ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের অভিষুক্ত (কণ্ডিত) সোমের নিকটে আগমন কর; এবং যেমন যুবষানি ব্যক্তি মহতের ন্যায় কার্য্য করেন, অর্থাৎ অন্য স্ত্রীর দ্বারা অপহৃত চিত্ত না হইয়া আপন যুবতীতেই অভিরমিয়া থাকেন, তদ্রূপ অন্যান্য হরি-রূপ অন্ন সমূহ দ্বারা অপহৃত না হইয়া ইহাতেই (এই সোমেতেই) অভিরমিবে।"*

এই স্তোত্রের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, যে যদি কোন যুবতীভার্য্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়া আপন স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মহতের ন্যায় কার্য্য দেখান হয়। কিন্তু ইহা দুরূহ পাপ, ঘৃণা, সাধারণে ইহা অবশ্য করিবে না, উহার এরূপ দৃঢ়তা জন্মায় নাই; যদি কেহ উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেইটি গৌরবের কথা মাত্র।

আমরা অতি ক্ষুদ্র উদাহরণ সকল উদ্ধৃত করিয়া বেদের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু বেদের পূর্ণ ভাব ইহাতে কিছুতেই বুঝান যায় না; বেদের একরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদ সকলের কিছু কিছু অংশ পাঠ করা আবশ্যক।

আমরা বেদ হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ দ্বারা আর্য্যগণের বৈদিক কালের পূর্ব্বাবস্থায় নৈতিক জ্ঞানের আভাস দেখাইলাম। তাঁহারা এই সকল নৈতিক জ্ঞান লইয়াই ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয়; যেহেতু বৈদিক স্তোত্র সকলে এই সকল নীতির রক্ষার নিমিত্তই তাঁহাদিগকে ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই কহিয়াছি, আর্য্যগণের বৈদিক কালের অবস্থা, তাহার পূর্ব্বাবস্থার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনার্য্য জাতিগণ তখন কেবল বর্ব্বর মাত্র, তাহাদের মধ্যে এ সকল নীতির প্রাদুর্ভাব দাঁড়ায় নাই, সুতরাং তাহাদের সংসর্গে তাঁহাদের এই সকল নীতি রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল।

আর্য্যগণ পঞ্চনদ উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের কিয়দংশ মাত্র তখন অধিকার করিয়াছেন, এই স্থানে তাঁহারা একরূপ স্থিত; কিন্তু এই সংস্থান সৈন্যগণের সমর ক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপনের সংস্থিতির ন্যায়। চতুর্দ্দিকে আমমাংসভোজী ভীষণ অনার্য্য রাক্ষসগণের প্রবল আক্রমণ, তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা, তাহার উপর আবার দারিদ্র্য দশা, স্বচ্ছন্দ আবাস নাই; কৃষি অতি সামান্য, পশুপালই একমাত্র অবলম্বন। এই ভীষণ অবস্থায় তাঁহাদিগের কার্য্য, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের নীতি, একই দিকে ধাবিত হইয়াছে। কঠোর প্রয়োজন, তাঁহাদিগের কার্য্য তাঁহাদিগের চিন্তাকে তাহারই দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই নিমিত্ত ঋক্ সকল আর কিছুই নয়, কেবল ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট আত্মরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রার্থনা মাত্র। পূর্ব্ববাস স্থলে আর্য্যগণ যে সম্পদশালী ছিলেন তাহা সম্ভাবিত নহে; উক্ত স্থলের অনুর্ব্বরত্বে বোধ হয় তাঁহাদিগের কষ্ট নিবারণ না হওয়াই উর্ব্বরক্ষেত্র ভারত ভূমে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ। কিন্তু তথায় তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত শান্তিসুখ ছিল এমন বোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি তাঁহাদের আর শান্তি ছিল না। তাঁহাদিগের স্তোত্র সকল হইতে দুই একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিলে তাঁহাদের তাৎকালিক অবস্থার একরূপ আভাস পাওয়া যাইবে। শত্রু ভয়ে তাঁহারা কেমন অস্থির ও ভীত এই দুইটি স্তোত্রে তাহা বুঝা যাইবে।—

"ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চারিদিক্ হইতে অস্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়াছ, অতএব প্রার্থনা—শূর রাক্ষস যেন আমাদিগের নিকটে রাত্রি গুলিতে না আইসে; যদি আইসে, তবে যেন আমরা, তোমার সাহায্যে

তাহাকে নষ্ট করি।” ৪। ১৪। ১২৮॥ সামসংহিতা। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ির অনুবাদ।

“ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার জন্য সম্যক্ উপাস্য, সমান-শত্রু-জয়শীল, সর্ব্বদাই-শত্রুগণ পরাভব-হেতু ও অতিবীর্য্যবান্ যে ধন তাহা আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও।” ৫। ১৫। ১২৯। সামসংহিতা। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ির অনুবাদ।

দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণে তাঁহারা কেমন ব্যাকুল, তাহা দুইটি স্তোত্রে উপলব্ধি হইবে।

"Will you then, Maruts, grant on to us wealth, durable, rich in men, defying all onslaughts? Wealth a hundred and a thousand-fold, always increasing?"

“হে মরুদ্গণ! তোমরা কি আমাদিগকে সর্ব্ব বিপদ্-অতিক্রমশীল, মানব-পরিপূর্ণ স্থায়ী সম্পদ্ দিবে? সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধনশীল, শত এবং সহস্রগুণ ধন দিবে?”

(মক্ষ মূলর অনুবাদ ঋক্‌বেদ, ৯৩ পৃষ্ঠা; ১৫ স্তোত্র)

"May this praise, O Maruts, this song of Mandarya, the son of Mana, the poet approach you (asking) for offspring to our body together with food: May we find food and a Camp with running water!

(ঋক্‌বেদ; মক্ষমূলর অনুবাদ, ২০১ পৃষ্ঠা)

“হে মরুদ্গণ! মান্দার্য্যের পুত্র মান কবির এই স্তোত্র, এই গীত তোমার নিকটে উত্তীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শরীর হইতে সন্ততি এবং খাদ্যের প্রার্থনা করিতে কি সমর্থ হইবে?, আমরা কি খাদ্য, এবং জল-প্রবাহ-সংযুক্ত শিবির প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব?”

এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আর্য্যগণের সমাজনীতিও তদনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন হইল। অনার্য্যগণের সহিত ঘোর বিদ্বেষ সংস্থাপন, বলবৃদ্ধির নিমিত্ত অপত্যোৎপাদন, এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতিই তাঁহাদের এই সময়ে অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং যে কোন উপায় দ্বারা এই সকল আয়ত্ত হয় তাহাই সমাজ-নীতি, তাহাই সাধারণ-গ্রাহ্য, তাহাই প্রশংসনীয় হইল।

বৈদিক কালের এতদনুরূপ সমাজ-নীতি সমাজে একরূপ প্রচলিত হইলে, তৎপরে মহর্ষি মনু তাহাদিগকে সঙ্কলন করিলেন। মনুসংহিতার সূত্র সকল হইতে আমরা এই বিষয়ের নিদর্শন দেখাইব।

“প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ” শিরস্ক দিয়া আমরা আর্য্যজাতির সমাজোন্নতি লইয়া দীর্ঘ ভূমিকা করিতেছি দেখিয়া হয়ত কেহ কেহ আমাদিগের উপর অনাস্থা করিতে পারেন; কিন্তু প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের কেবল ব্রজলীলা বর্ণনা করা

উদ্দেশ্য নয়; মানুষের সামাজিক জীবনে পূর্ণ-সুখ উপভোগ বা আয়ত্ত করিতে হইলে প্রণয়ই তাহার প্রধান সহায় বা উপায়, আর্য্যগণের সামাজিক নীতি-জ্ঞানোন্নতির পর্য্যায়ে এই জ্ঞান উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে আসিয়া তাহার কতদূর পরিস্ফুটতা দেখাইয়াছে, এবং সমাজেই বা তাহা কতদূর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য; সুতরাং আর্য্যগণের সমাজনীতিই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

(ক্রমশঃ)।

শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্যবহার-বিজ্ঞান।

অর্থাৎ

পুরাকালের রাজকার্য্যের প্রণালী।

পৃথিবী যখন নবতরা,—ভারত ভূমি যখন মায়া-দম্ভ বিবর্জিত সরল-স্বভাব সন্তানগণে শোভমানা,—আহার্য্য-শোভা বিরহিত অব্যাজ-সভ্যতায় অধিরোহণ করিতেছিলেন, একবার তখনকার বিধান-শাস্ত্র কীদৃশ, অনুসন্ধান করা যাউক।

ভারতভূমি যখন এক্ষণকার মত প্রাণি-সঙ্কুলে ব্যাপ্তা ছিলেন না,—ভারাক্রান্তা ছিলেন না,—দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ সারবান্ দেহ ধারী জীবনিবহের সেবনীয়া ছিলেন,—এখন-কার ন্যায় ব্যাধিত-ক্ষুধিত-তৃষিত-জীবিকার্থ-প্রধাবিত উদ্ভ্রান্ত সন্তানগণে পরিপূর্ণা হন নাই, তখনকার রাজাদিগের বিচার নিষ্পত্তি কিরূপ, অনুসন্ধান করা যাউক।

ভারতমাতা যখন অত্যল্প সন্তান প্রসব করিয়াও তাহাদের সারবান্ দেহ এবং দীর্ঘজীবন হেতু সমধিক সন্তানবতী অপেক্ষাও সুখিনী ছিলেন, সেই সকল সন্তানেরা কেহ ধীর, কেহ বীর, কেহ জ্ঞানী, কেহ ধ্যানবন্ত, কেহ যোগী, কেহ মুনি, কেহ ঋষি ছিলেন,—কেহ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে, কেহ যোগ-সামর্থ্যে, কেহ অন্যবিধ উপায়ে শৈলশিখরে, নির্ঝরিণী-তীরে, বিজন অরণ্যে, গিরি-গহ্বরে উপবিষ্ট হইয়া মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি, আপনাদের সমুন্নতি, দেশের যশোবৃদ্ধি এবং অন্যের উপকার সাধনের উদ্দেশে সর্ব্বদাই নিমগ্ন থাকিতেন, তখনকার বিধানচিন্তকেরা কিরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা অদ্য প্রভৃতি সেই পৌর্ব্বকালিক রাজ-বিচারের চিত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত সঙ্কল্প ধারণ করিলাম। প্রস্তাববদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

যে যে বিষয় প্রস্তাবের উ াদান হইবে তাহা অগ্রেই প্রকাশ করিতেছি। যথা—

বিচার স্থান	১
সভাসদ	২
ব্যবহার	৩
বিচারপতি	৪
বিচার নিষ্পত্তির রীতি পদ্ধতি	৫
সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ	৬
বাদী ও প্রতিবাদী	৭
বাদে নিযুক্ত অর্থাৎ উকীল	৮
তাহাদের কার্য্য	৯
বাদী প্রতিবাদীর প্রশ্ন ও উত্তর গ্রহণ প্রকার	১০
বিবাদ নিষ্পত্তি ও দণ্ডাদির নিয়ম	১১
ঋণ-ঘটিত বিবাদ	১২
নিক্ষেপ অর্থাৎ আমানৎঘটিত	১৩
ক্রয় বিক্রয়-ঘটিত	১৪
বাণিজ্য	১৫
দানকর্ম্ম	১৬
বেতন-ঘটিত	১৭
কূটকরণ	১৮
প্রতিজ্ঞা বা স্বীকারের অন্যথাকরণ	১৯
স্বামি ভৃত্য-ঘটিত	২০
সীমা-ঘটিত	২১
রাজস্ব-সংক্রান্ত	২২
বাক্-পারুষ্য	২৩
দণ্ডপারুষ্য	২৪
সাধারণ পরুষ ব্যবহার	২৫
চৌর্য্যঘটিত	২৬
স্ত্রী-হরণ	২৭
দাম্পত্য-নিয়ম-সংক্রান্ত	২৮
দ্যূত অর্থাৎ ক্রীড়া ঘটিত	২৯
আহ্বান-ঘটিত	৩০
সঙ্কীর্ণ	৩১

১। বিচার স্থান— এই সকলের মধ্যে প্রথম বক্তব্য বিচার-স্থান। অতীত কালের হিন্দু রাজারা কিরূপ স্থানে বিচার করিতেন, প্রথমতঃ তাহারই নির্দ্দেশ করা যাউক।

রাজাদিগের সাধারণ বিচার স্থানের নাম সভা। পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অধিপতিদিগকে ভ্রমণ করিতে হইত, এ নিমিত্ত বিচার স্থানের সামান্য বিশেষ ঘটনা হওয়াতে যখন যে স্থানে সভ্যেরা উপস্থিত হইতেন, তখন সেই সেই স্থানই সভা বলিয়া পরিচিত হইত। যথা,—

"যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রাবেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণাস্তাং
সভাং বিদুঃ॥"

"নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপাদৌ তু বিশেষো বস্তুতে"
ইতি বাচস্পতিঃ।

তদ্ভিন্ন বিচারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাহা তৃণকাষ্ঠ, কাষ্ঠেষ্টক, ও প্রস্তরেষ্টক নির্ম্মিত ছিল। নির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট বিচার স্থানের নাম সভামণ্ডপ, সদোগৃহ, অধিকরণ মণ্ডপ, অধিকরণ গৃহ ইত্যাদি।

মনে করিবেন না যে অধিকরণ মণ্ডপ কেবল রাজধানীতেই স্থাপিত থাকিত, অন্যত্র থাকিত না। রাজধানীর নিকটস্থ স্থানেই রাজার দৃষ্টি, বিচারের প্রচার, নিয়মের শৃঙ্খলা ছিল, দূরে ছিল না। হিন্দু

দিগের ব্যবহার শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, অতি সুদূরস্থ গ্রামগুলীও রাজ-নিয়মে শাসিত হইত। দূরস্থ প্রজার শাসন-নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। যথা,—

"গ্রামাধ্যক্ষঃ কুটুম্বিকেভ্যঃ করমাদায় দশ-গ্রামিণে প্রযচ্ছতি। এবং দশগ্রামিণোপি বিংশতীশায়। সোঽপি শতগ্রামিণে। সচ সহস্রাধিপতয়ে। সোপি নগরাধিপতয়ে। সচ বিষয়াধ্যক্ষায়। বিষয়াধ্যক্ষস্তু রাজ্ঞে নিবেদয়ত্যেবং পারম্পরিকো ব্যবহারঃ।"

(নীতিচিন্তামণি)।

শাসন কার্য্যের ও কর গ্রহণের সুবিধার নিমিত্ত এইরূপ বিভাগ ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এক একটি সামান্য অধিকরণ স্থান থাকিত। তাহার অধ্যক্ষ তদনুরূপ ব্যক্তি। তিনি সেই গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই পদের নাম মণ্ডল।

দশখানি গ্রাম ও মণ্ডলেশ্বরের উপর অপর এক অধিকরণ। তাহার অধিপতি তদুপযুক্ত ব্যক্তি। ইঁহার নাম দশগ্রামী। ইনি মণ্ডলগণের কর্ত্তা। মণ্ডলগণের কিছু জানাইতে হইলে অথবা মণ্ডলগণের নামে অভিযোগ করিতে হইলে, ঐ দশাধীশ ব্যক্তির নিকটই উপস্থিত হইতে হইত।

এই দশাধীশের উপর বিংশতীশ। বিংশতীশের উপর শতাধ্যক্ষ, শতাধ্যক্ষের উপর সহস্রাধ্যক্ষ, ইহার উপর নগরাধ্যক্ষ অর্থাৎ রাজধানী স্থিত অধিকরণ। ইহার উপর রাজা স্বয়ং।

এইরূপে, মফঃস্বলের মণ্ডল হইতে নগরাধ্যক্ষ পর্য্যন্তের শাসন কর্ত্তা রাজা। এইরূপ শাসন-পদ্ধতির সহিত আধুনিক শাসন-পদ্ধতির বড় প্রভেদ নাই। কেন না, আউট্ পোষ্ট, ষ্টেসন, বা থানা, মহকমা, জেলা, হাইকোর্ট, প্রভৃতি উপর্য্যুপরি অধিকরণ সত্তা দৃষ্ট হইতেছে।

২। সভাসদ—একব্যক্তির উপর বিচার কার্য্যের নির্ভর থাকিলে ভ্রম-প্রমাদাদি বহুবিধ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; এই ভাবিয়া পৌর্ব্বকালিক বিধান শাস্ত্র-বেত্তারা সভাসদ্ নিযুক্ত করিবার বিধি দিতেন। রাজারাও সেই বিধি অনুসারে সভাসদ্ নিযুক্ত করিতেন। সভাসদেরা নিপুণ হইয়া বিচারপতির বিচার পরিদর্শন করিতেন। প্রাড্বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সম্পূর্ণ বিধানজ্ঞ হইলেও সভ্যদিগের মতামত শ্রবণ করিতেন। সভ্য বা উপপ্রণিধি, বাদী প্রতিবাদীর উত্তর প্রত্যুত্তর ও প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া নিষ্কর্ষ অংশ বিচারপতির গোচর করিতেন। প্রাড্বিবাক তত্তাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিতেন। জয় পরাজয়ের নির্দ্ধারণ করা বা তাহা বাদী অথবা প্রতিবাদীর নিকট প্রকাশ করার অধিকার সভ্যদিগের ছিল না, তাহা কেবল বিচারকেরই ছিল। সভ্যদিগের তাদৃশ অধিকার না থাকিলেও তাহা তাঁহাদিগের বিচার-পতিকে বলিতে হইত। যথা,—

"সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থং সহিতং ঘচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তু সভ্যস্তদাঽনৃণঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অর্থ এই যে, সভ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটিত বাক্যের নিষ্কর্ষ অংশ অবশ্য বলিতে হইবে। বিচার পতি তাহা না শুনেন, সভ্যেরা অঋণী হইবেন।

পূর্ব্বকালে এইরূপ সভাসদ বা অমাত্য যে সে ব্যক্তি হইতে পারিত না।

"শ্রুত্যধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্য বাদিনঃ। রাজ্ঞঃ সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রেচ যে সমাঃ॥" (কাত্যায়নঃ)।

যাঁহারা বিধানশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী. সৎকুল-জাত, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র ও পক্ষপাত-বুদ্ধি-পরিবর্জ্জিত, এমন সকল ব্যক্তিরাই পূর্ব্বকালে বিচার-পতির বিচার দর্শনের সভাসদ হইতেন। বিচার নিষ্পন্ন অর্থাৎ জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ হইলে তাহা লিখিত হইয়া প্রচার হইত কি না বলা যায় না; বোধ হয় পূর্ব্বকালে তাহা মৌখিক প্রকাশ করাই প্রথা ছিল। ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

৩। ব্যবহার—যেরূপ পদার্থ লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে 'ব্যবহার' শব্দ ব্যবহৃত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় তাহা এক্ষণে 'মোকদ্দামা নামে ব্যবহৃত হইতেছে। যথা,—

"বিনানার্থেঽব-সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানা সন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতিস্থিতিঃ॥"
(কাত্যায়নঃ)

"নানা-বিবাদ-বিষয়ক-সংশয়োঽপহ্নীয়তে অনেন—"
(ইতি ব্যবহার-মাতৃকা)

মর্ম্মার্থ এই যে, প্রজাদিগের বিবাদ ঘটনা হইলে যে ব্যাপারের দ্বারা তদ্গত সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক দোষাদোষ বা জয় পরাজয় নির্ণীত হয়, সেই সমস্ত ব্যাপারের নাম ব্যবহার।

৪। বিচারপতি বা প্রাড়্বিবাক—বিচার করা প্রধানতঃ রাজারই কর্ত্তব্য। পরন্তু একমাত্র রাজার দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই; এজন্য বিধান শাস্ত্র কর্ত্তারা তৎকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রতিনিধির বিধান করিয়াছেন। তাদৃশ বিচারকের নাম প্রাড়্বিবাক। যথা,—

"রাজা কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ
প্রাড়্বিবাকোঽথবা দ্বিজঃ॥"
(বৃহস্পতিঃ)

রাজা স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করিবেন অথবা প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন।

পূর্ব্বকালে এই পদ যে সে ব্যক্তি পাইত না। প্রায় ব্রাহ্মণেরাই এই পদ গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের অভাবে বৈশ্যেরা ঐ পদ পাইতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য; ব্রাহ্মণেরাই ব্যবস্থাকারক; রাজারাও ব্রাহ্মণদিগের অনুগত; পরন্তু শূদ্রেরা ইহাঁদের দাস ছিলেন। বোধ হয় শূদ্রজাতির প্রতি ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার বিদ্বেষের কারণ ঘটনা হইয়াছিল। কারণ শূদ্রদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ

কঠিন শাসন দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে নীচ মনে করিয়া ঘৃণা করিতেন, কেন না, তৎকালের শূদ্রেরা অত্যন্তনীচ ও অজ্ঞ ছিল। তৎকালের শূদ্রেরা তথাবিধ অবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে রূপ পরুষ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহাতে শত্রুতা না থাকিলে কদাচ তাদৃশ ভাব উদ্ভব হইতে পাবে না। বিবেচনা করুন, এক্ষণে যে ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষা নীচ ও অজ্ঞ; তাহাদের প্রতি আমাদের ত তাদৃশ পরুষ ব্যবহারের ইচ্ছা উদিত হয় না! তাহাদিগকে আমরা নীচ মনে করিয়া স্পর্শ না করি, একত্র শয়ন ভোজন উপবেশন না করি, কিন্তু জিহ্বাচ্ছেদ করিতে বলিনা; ববং তাহাদিগের প্রতি দয়া ভাব উদ্রিক্ত করিয়া কি কারণে জগদীশ্বব তাহাদিগকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তাহারই চিন্তা করি। অতএব, শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কোন নিগূঢ় বৈর-কারণ ছিল সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়দিগের সহিত পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদের এক একবাব সুমহৎ বৈরভাব উপস্থিত হইয়া এক সুদীর্ঘকাল অতীত করিয়া ছিল, ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রদিগের সহিত সেরূপ বৈরভাব ঘটনার কিছুমাত্র আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যৌবন কাল পর্য্যালোচনা করিলে একটু অঙ্কুর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। সম্প্রতি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যে ব্রাহ্মণদিগের কিছুকাল ব্যাপিয়া শত্রুভাব চলিয়াছিল, তাহা আমরা এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ করিব।

ব্রাহ্মণদিগের অযথা আধিপত্য এবং ক্ষত্রিয়দিগের উৎকট বল বীর্য্যের মাদকতা প্রবৃদ্ধ হইয়া তদুভয় যখন যখন সম্মিলিত হইয়াছে, তখন তখনই এক এক সর্ব্বাস্তকর তুমুল বিরোধ ঘটনা হইয়াছে। ভৃগুনন্দন পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতিবার ক্ষত্র শূন্যা করেন ইহা প্রথিত আছে। মুনিপ্রবর পরাশর ও একবার সর্ব্বক্ষত্র বিনাশে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতৃলোকের অনুরোধে তাহা করেন নাই। এইরূপ ক্ষত্রিয়েরাও একবার পৃথিবীকে ব্রাহ্মণ শূন্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরাই বিস্তীর্ণ-গোষ্ঠী সম্পন্ন এবং মান্য গণ্য ছিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণ ইহাঁদের যজমান ছিলেন, সেই কারণে ইহাঁরা অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধনশালীও ছিলেন। কোন এক সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কোন এক আদি পুরুষ (কৃতবীর্য্য) তাৎকালিক সমস্ত ক্ষত্রকে নিঃস্ব করিয়া ধনাহরণ কবত তাহা যজ্ঞ কার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্ষত্রিয়েরা নিঃস্ব, আব ব্রাহ্মণেরা ধনশালী হন। কৃতবীর্য্যের পরলোক লাভ হইলে পর তাঁহার জ্ঞাতিদিগের ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাবা ভৃগুবংশীয় পুরোহিতদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা করিলেন।

ঠাকুর মহাশয়েরা চিরকালই সমান দাতা!!—ক্ষত্রিয়েরা বার বার প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা কিছুমাত্র দিলেন না; প্রত্যুত 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহারা মনে মনে জানিতেন যে আমরা ক্ষত্রিয়দিগকে আঁটিতে পারিব না, সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়দের ভয়ে সমস্ত ধন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; কেহ বা জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে বিতরণ করিলেন। তথাপি ধন-শূন্য আপদ্দশাগ্রস্ত যজমানদিগকে দিলেন না। পরন্তু ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের 'নাই' বলাতে বিশ্বাস নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের গৃহ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—অবশেষে মৃত্তিকার মধ্য হইতে সেই সমস্ত প্রোথিত ধন নিষ্কাসিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ কার্য্যে তাঁহারা অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধ-পরায়ণ ক্ষত্রিয়েরা তখন ব্রাহ্মণ বংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল।

"নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।

আগর্ভাদব কৃন্তন্তশ্চেরুঃ সর্ব্বাং বসুন্ধরাম্॥

ততউচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষ্বেবং ভয়াত্তদা।

ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে॥

তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্।

ঊরুণৈকেন বামোরুর্ভর্ত্তুঃ কুলবিবৃদ্ধয়ে॥"

[মহাভারত]

তাঁহারা এক বাক্যে ব্রাহ্মণ বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এমন কি গর্ভ পর্য্যন্ত বিনাশ করতঃ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগু বংশের ঘোরতর ধ্বংস উপস্থিত দেখিয়া ভয়ার্ত্ত ভৃগু-পত্নীরা গিরি দুর্গ ও নিবিড় অরণ্য লক্ষ্য করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ঋষি-পত্নীদিগের মধ্যে এক জন গর্ভবতী ছিলেন, তিনিই কেবল যত্ন-পূর্ব্বক ভর্ত্তৃ-বংশ রক্ষার নিমিত্ত ঊরু দ্বারা গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অনুসন্ধান করিয়া সেই গর্ভ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পারেন নাই। সেই গর্ভ-প্রসূত সন্তান পরিশেষে 'ঔর্ব্ব' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং তিনি মাত্র ভৃগুবংশের বংশধর হইয়া প্রসূত হইয়াছিলেন। এই যেমন অশীতি সহস্র ভার্গব ব্রাহ্মণের বিনাশ ঘটনা হইয়াছিল, এইরূপ মধ্যে মধ্যে প্রায় হইত। রামায়ণ মহাভারতাদি পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ ঘটনার সংবাদ অনেক পাওয়া যায়। পরন্তু শূদ্রেরা কি জন্য যে ব্রাহ্মণদিগের অত পদানত, তাহার অবশ্য কিছু নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

কার্য্যের সোপান।

সরোবরে পদ্মিনী ভাসিতেছে অগ্রে দেখিলাম। দেখিবা মাত্র লালসা জন্মিল পদ্মিনীকে তুলিয়া আনি। লালসার পর সন্তরণ দিয়া পদ্মিনীকে তুলিয়া আনিলাম। এখানে দেখা যাইতেছে অগে দর্শনশক্তি দ্বারা মনে জ্ঞানের উদয় হইল, জ্ঞানের পর লালসা, এবং লালসার পর কার্য্য। এইটি কার্য্যের স্বাভাবিক নিয়ম। কার্য্যের পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষা, এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বে জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কার্য্য নাই। একেবারে কার্য্যের কেহ প্রত্যাশা করে না। কোন কার্য্যের প্রত্যাশা করিতে হইলে অগ্রে তাহার আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করা আবশ্যক, এবং আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিতে হইলে, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ না করিয়া যিনি অগ্রেই কার্য্য চান তিনি নিশ্চয় নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অধীর।

অনেকে নির্জ্জীব বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে কার্য্যশীল দেখিতে চান। যে জাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিষ্পন্দ, অচেতন, মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, সে জাতি কি সহসা সঞ্জীবিত হইয়া বীর কার্য্যক্ষেত্রে একদিনে মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে? কিন্তু অনেকে এমনি অধীর যেন তাঁহাদিগের ইচ্ছা আজিই বাঙ্গালী জাতি কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া মহতী কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পৃথিবীকে যশোগৌরবে পূর্ণ করুক। এরূপ ইচ্ছা কি কখন ফলবতী হয়? এবং ফলবতী হইল না বলিয়া যাঁহারা আবার ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ হন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব খুঁজিয়া পাই না। তাঁহারা যদি একেবার মানবপ্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, এবং মনুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতির তত্ত্ব ও কারণ ভাবিয়া দেখেন, অবশ্য বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদিগের নৈরাশ্য অকারণ এবং অধীরতা বাতুলতা মাত্র।

দশাধিক বৎসর গত হইল, কোথায় কিছু নাই একদা বিধবাবিবাহের রীতি প্রচলিত করিবার উদ্যোগ হইল। বঙ্গ সমাজ তখন বিধবা বিবাহের নাম শুনিবা মাত্র একেবারে স্তম্ভীভূত। কে যেন তাহাদিগের জাতি মারিতে আসিতেছে, তাহারা যেন এই ভয়ে জড় সড়। সাধারণ জনগণ মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন। চিরকাল তাহারা যে অভ্যস্ত পথে চলিয়া আসিতেছে তাহারা সেই পথেই চলিতে জানে। চিরকাল যে পবিত্রতা ও পাপপুণ্যের ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, তদ্ব্যতীত অন্যভাব সহসা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? তাহারা কখন

কোন নূতন ভাবের সঙ্গতাসঙ্গততা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; বিবেচনা করিয়া কখন কোন নূতন কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই; সামাজিক শাসন, ও পারিবারিক শাসন, কখন লঙ্ঘন করে নাই। জীবন, নদীর ন্যায় এক স্রোতেই চিরন্তন প্রথার প্রণালী দিয়া বহিয়াছে। কখন সে প্রণালী উল্লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় নাই। রাজনৈতিক দাসত্ব, সামাজিক দাসত্ব ও পারিবারিক দাসত্বে তাহাদিগের জীবন ঘোর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই অধীনতায় তাহাদিগকে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, নিঃসাহস ও জড়প্রায় করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা কি, এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করায় কত সুখ, তাহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কখন চিরন্তন প্রথার বিন্দু বিসর্গ অতিক্রম করিয়া স্বাধীন পথে দাঁড়ায় নাই। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের ভাব তাহাদিগের মনেও কখন উদয় হয় নাই। দিবাস্বাপী বাঙ্গালি দিনে নিদ্রা যায়; যে অল্পক্ষণ জাগরিত থাকে, আহার বিহার, পরের নিন্দা, গ্রামের গোল যোগ, সামান্য সম্ভাষণ, চাষ বাসের কথা, মকর্দ্দমার কথা, প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিয়া দিন কাটায়। যাহা নিত্য করে, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের পরিসীমা। এই সীমার অতীত তাঁহাদিগের পক্ষে আর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা, ও জ্ঞান নাই। অন্য কথা তাহারা বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না, বুঝিবার সামর্থ্যও নাই। যে দুই এক জন খৃষ্টান হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মের জন্য নহে, বাড়ীতে ঝগড়ার জন্য, বালসুলভ চঞ্চলতার জন্য, অথবা অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য।

এই নিদ্রাতুর জড়প্রায় জাতির নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র ধরিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন না যে শাস্ত্রানুযায়ী আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচলিত হয় না। শাস্ত্র আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, চিরন্তন প্রথা আমাদিগের ধর্ম্ম। চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তিতাই আমাদিগের নিষ্ঠা, যাগ যজ্ঞ ও তপস্যা। হাজার শাস্ত্র দেখাইলেও বাঙ্গালী এ প্রথার বহির্দ্দেশে তিলার্দ্ধও বিচরণ করিতে পারে না। চির-অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আজিও বাঙ্গালীর কার্য্য নহে।

এই দেখুন এই নিশ্চেষ্ট বাঙ্গালীজাতির বিষয় একজন সুলেখক কি বলিয়াছেন। "গঙ্গার শত মুখের তীর-বাসী থর্ব্বকায় বঙ্গদিগের মানস স্বদেশের ভূমির ন্যায় হিমার্দ্র ও নিস্তেজ। তাহাদিগের আন্তরিক তেজের স্ফুলিঙ্গ, দেশের সজলতা দ্বারা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া থাকে। এই তেজের ইন্ধন নাই, ইহার উদ্দীপন কিছুতেই হয় না। যত পদাঘাত কর, যত ঘর্ষণ কর, ইহার উষ্ণতা কখন অনুভূত হয় না।" এজাতির নিকট শাস্ত্রই কি, ধর্ম্মই কি, আর অধর্ম্মই কি? অগ্রে জিজ্ঞাস্য, সেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দেশের

রীত্যনুযায়ী কি না? তাহা যদি না হয়, তাহা অবলম্বনীয় নহে, তদ্বিপরীত প্রথায় কেন মহাপাতক থাকুক না, কিন্তু যখন তাহা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা সহস্রবার অবলম্বনীয় ও পবিসেব্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিশ্চেষ্ঠ, জড়প্রায়, চির-অভ্যাস-প্রিয়, অজ্ঞ বঙ্গজাতির নিকট শাস্ত্র ধরিলেন। যত টুলো পণ্ডিত, গ্রামের বর্দ্ধিষ্ট ও মণ্ডলগণ হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল এ আবার কি? বিধবার আবার বিবাহ কি? একথা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপহাসাস্পদ হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎপরোনাস্তি যত্ন স্বীকার ও বহুল অর্থব্যয় করিয়া দুই দশজন নব্য সাম্প্রদায়িকের ঘরে বিধবা বিবাহ দিলেন। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত; আর বিধবার বিবাহ শব্দ বৎসরেও একবার শুনা যায় না। বিদ্যাসাগব মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সুমহৎ সামাজিক সংস্কার নিষ্ফল হইল কেন, যাঁহারা ইহার নিগূঢ় কারণানুসন্ধান করিতে যাইবেন, তাঁহারা স্থির বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালীজাতি এই সংস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যে বাঙ্গালী জাতি সামাজিক স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রের সাগরে কখন বিচরণ করিতে জানে নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে এক দিনে এই সাগরের মধ্যস্থলে আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি এ সাগরে কখন সন্তরণ দেয় নাই, সন্তরণ জানিত না, সুতরাং অধিকাংশ লোকেই তীরবর্ত্তী হইতে চাহে নাই; যাঁহারা বুক বাঁধিয়া তীরে আসিয়াছিলেন, সাগরের মহা বিভীষিকা দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর শীঘ্র এ তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। অগ্রে তাঁহারা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিখুন, অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ক্ষেত্রে স্বাধীন, চিন্তাশীল, ও কার্য্যশীল হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করুন, তবে বৃহৎ ব্যাপারে ও বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। যে শিশুর পদে উঠিবার বল হয় নাই, সে শিশু কি দৌড়িতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ শিশুকে দৌড়িতে বলিয়াছিলেন। সে শিশু দৌড়িতে পারিবে কেন? সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল না।

প্রকাশ্য সামাজিক কার্য্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির কতদূর কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিয়াছে তাহা বিধবা বিবাহের উদ্যোগে বিশিষ্টরূপে প্রতীত হইয়াছে। তবু আমাদিগের সামাজিক কোন শাসনকর্ত্তা নাই। সমাজ যাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারে, তাহা অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইতে পারে; তাহার প্রতিবন্ধক কেহ নাই। তথাপি বঙ্গবাসিগণ স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে সাহসী হয় না কেন?

সামাজিক স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার

পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণের মনে স্বাধীনতার ভাব উদিত হওয়া আবশ্যক। আজিও স্বাধীনতার জ্ঞান বঙ্গবাসীর মনে কিছুই উদ্রিক্ত হয় নাই। স্বাধীনতা কি অমূল্য নিধি যত দিন না সাধারণ জনগণ সকলেই বুঝিতে পারিবে, যত দিন না তাহাদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়তা স্বতঃই উদ্রিক্ত হইবে, ততদিন বঙ্গসমাজ নিশ্চেষ্ট অসাড় ও নির্জ্জীব থাকিবে। সমাজ-সংস্কারের পক্ষে যে সমস্ত মহৎ ভাবের প্রচারের আবশ্যক, আজিও সে সমস্ত ভাব সর্ব্বসাধারণে অবগত নহে। বঙ্গসমাজ আজি পর্য্যন্ত কেবল আমোদ প্রমোদে অতিযাপিত করিতেছে। কয় জন স্বাধীনতা, স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বাত্মা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চ ভাবাদির আলোচনা করিয়া থাকেন? আজিও অনেকের জ্ঞান নাই, কিসে স্বদেশের অবমাননা হয়, কিসেই বা তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। বঙ্গজাতি কেন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত সাধারণ জনগণ আজিও নিতান্ত লজ্জাকর কার্য্য সমূহে ব্রতী হইয়া সমস্ত সভ্য সমাজের উপহাসাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বদেশীয়গণ দ্বারাই দেশের যত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে এবং আজিও সাধিত হইতেছে, তত অপর জাতীয়গণ দ্বারা সাধিত হয় নাই, হইতেও পারে না। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে এই সমস্ত সাধারণ জনগণের মনে, তাহারা যে কি করিতেছে, আজিও এমত বিবেচনা ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই। কোন্ কার্য্যে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, কিসেই বা তাহাতে কলঙ্কপাত হয়, তদ্বিষয়ে আজিও সাধারণ্যে কিছুই সংস্কার নাই। সাধারণ্যে এই সমস্ত ভাব প্রচারিত হইতে বহুকাল যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত ভাব প্রচারের জন্য কয় জন বক্তা হইয়াছেন? শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যাহারা উচ্চ ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয় জন সেই সমস্ত উচ্চ ভাব, ও উচ্চ অভিলাষ স্বদেশ মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন? গণনা করিলে অঙ্গুলী মাত্রেই তাঁহারা গণনীয় হইতে পারেন। যত দিন না সর্ব্ব সাধারণে উচ্চ ভাব সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহাদিগের নিকট হইতে সৎকার্য্যের প্রত্যাশা করা অবিবেচনার ফল। গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখ, সাধারণ সমস্ত জনগণই ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। কোন সাধু ভাব, কোন উচ্চ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় নাই। শত সহস্র জনগণের মধ্যে এক জনও উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ভদ্র লোকের মধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিতের দল অনেক। নীচ লোকের মধ্যে শিক্ষার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং সাধারণ জন সচরাচর সামান্য কথা বার্ত্তায় দিন যাপন করিতেছে। সেই কথা বার্ত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ তন্মধ্যে উচ্চ ভাব কিছুই নাই; বরং সমস্তই নীচ ভাবের পরিচায়ক। সেই সমস্ত কথা বার্ত্তায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, আজিও

আমাদিগের সাধারণ জনগণ মধ্যে নীচ ভাব সকল কত প্রবল। কাহাকে নীচতা বলে এবং কিসে নীচতা হয়, আজিও অনেকের এমত জ্ঞান নাই। সকলেই স্বার্থ-পরতার ও আত্ম চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এই স্বার্থপরতার উদ্দেশে অনেকে সমাজের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধনও করিতেছেন। তাহারা হয়তো আত্মসুখ ও আত্মোন্নতির সহিত সামাজিক সুখ ও সামাজিক উন্নতির প্রভেদ জানেন না। সমাজ সম্বন্ধে কোন কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করা তাঁহাদিগের ক্ষমতাতীত। সামাজিক ভাব আজিও তাহাদিগের মনে কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় নাই। তাঁহারা সকল বিষয় আত্ম-সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধেই বিচার করিয়া পরিসমাপ্ত করেন। ভবিষ্য বিবেচনা ও সামাজিক ভাবে তাঁহাদিগের মন বিস্তৃত হয় না।

অধীনতায় আমাদিগের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে আর আমরা অধীনতায় কোন লজ্জা বোধ করি না। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমাদিগের কিছুই লজ্জা বোধ নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কিছু সম্পন্ন হইয়া উঠেন, আমি অমনি নিশ্চেষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে তাঁহার অধীন হইয়া রহিলাম। আমার সন্তানাদি সমগ্র পরিবার তাঁহার গলগ্রহ হইল। তাঁহার লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করি। তাঁহার কোন বিষয়ে ক্রটি হইলে নিন্দা করিয়া বেড়াই। তিনি আমার নিকট, যেন ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে ক্রটি আমার অসহ্য হয়। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের অংশে আমি স্বত্বাধিকারী!

অধীনতা আমাদিগের শুদ্ধ ব্যক্তিগত ভাব নহে, ইহা আমাদিগের জাতীয় অবস্থা। চাকরী করা ও পরের দাস হইয়া থাকা আমাদিগের জাতীয় ব্যবসায় ও জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতির চাকরী করা জাতীয় ব্যবসায় নহে, আর কোন জাতি এতদূর নীচ-প্রকৃতি নহে। চাকরী ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চিন্তাও বিস্তৃত হয় না। যাহার চৌদ্দপুরুষ চাকরী ও গোলামী করিয়া আসিতেছে, সে কি অন্য দিকে চিন্তা বিস্তৃত করিতে পারে? বাল্যকাল অতীত হইয়া গেলে, জীবিকা নির্ব্বাহের কাল উপস্থিত হইলেই বাঙ্গালীর মন চাকরীর দিকে যেন এক স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে নীয়মান হইবে। সে প্রভাব বিধ্বস্ত করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। শতবার স্বাধীন ব্যবসায়ের শত চিন্তা উদিত হইবে, বাঙ্গালী অমনি শত সহস্র বিভীষিকা দেখিতে থাকিবেন। কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থির হইবে না। অবশেষে চাকরী,—নিরীহ দাসত্ব ব্যবসায়। ইহাতেই মন সুস্থির হইল। শত-কোটি দিন চাকরীর জন্য বাঙ্গালী পরের উপাসনা ব্রতে ব্রতী হইলেন। পরের পাদলেহনে ও উপাসনায় বাঙ্গালী বিলক্ষণ পটু। সে কার্য্যে তাঁহাকে আর শিক্ষা দিতে হয় না। সে কার্য্যে যে চাতুরী,

যে নীচতার আবশ্যক তাহা বাঙ্গালী বিলক্ষণ জানেন। চাকরী হইলে, আবার সেই চাকরী কিরূপ চাতুরী ও নীচতার সহিত রক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও বাঙ্গালী বিশিষ্টরূপে পারদর্শী আছেন। বাঙ্গালী আর কিছুর জন্য গৃহত্যাগী হইবেন না, কেবল চাকরীর জন্য হইবেন। বাঙ্গালী আর কিছুরই জন্য আত্মস্বজন ও পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ও থাকিতে পারেন না, কেবল চাকরীর জন্য পারেন। বাঙ্গালী কিছুতেই জাতিভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইবেন না, কেবল চাকরীর জন্য হইতে পারেন। আর কিছুর জন্য বাঙ্গালীকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বল, বাঙ্গালী তিলার্দ্ধও নড়িবেন না। কিন্তু চাকরীর জন্য তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে স্বীকৃত আছেন ও বাস্তবিক তাহাই করিতেছেন। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কি জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন?—পরের চাকরী ও দাসত্ব করিবার জন্য। এই দাসত্ব বিশিষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হইয়া আসিলেন। স্বাধীন দেশে পদার্পণ করিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ভাব বিরাজিত দেখিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ব্যবসায়ের ধুমধাম, ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তিনি কণামাত্র স্বাধীনভাবে উদ্বোধিত হইলেন না; তাঁহার মন স্বাধীনব্যবসায় ও স্বাধীন চিন্তায় প্রধাবিত হইল না। তিনি সে সমস্ত ভাব পরাজয় করিয়া মস্তকে অধীনতার ভার বহন করিয়া স্বদেশে আসিলেন; আসিয়া এখানে গোলামী করিতে লাগিলেন। এখানে ইংরাজের অবজ্ঞাপাত্র হইতে আসিলেন। এখানে ইংরাজের পদসেবা ও তিরস্কার সহ্য করিতে আসিলেন। এখানে স্বদেশীয়গণকে দাসত্ব শিক্ষা দিতে আসিলেন। হায়! বঙ্গের অবস্থা কি হইবে? ধিক্ বঙ্গের সন্তানগণ!

ইহাতেই প্রতীত হইতেছে আজিও অধীনতায় বাঙ্গালীর লজ্জা বোধ হয় নাই। চির-অধীনতায় তাঁহার প্রকৃতি এরূপ অসাড় হইয়া গিয়াছে, যে তিনি শীঘ্র সে জড়তা, সে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী যে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবেন, তাঁহার জড়তা ও তাঁহার অধীনতা-প্রিয়তা তৎপক্ষে ঘোর প্রতিবিরোধী হইয়াছে। যত দিন এই জড়তা ও অধীনতা-প্রিয়তা দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গবাসীগণের অভ্যুদয় হইবে না। অধীন হইয়া কোন জাতি মহত্ত্বের সোপানে উঠিতে পারে নাই। স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন না করিলে, স্বাধীন চিন্তা সকল স্ফুরিত হয় না, অধীনতার নীচতা ও অসুখ বোধগম্য হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে ভাবসম্ভূত আকাঙ্ক্ষা, এবং সর্ব্বশেষে কার্য্য। অগ্রে বঙ্গবাসীর মনে অধীনতার নীচতা বোধগম্য হওয়া চাই, অগ্রে স্বাধীনতার সুখ ও গৌরব জ্ঞানগোচর হওয়া

চাই, তৎপরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও তজ্জন্য চেষ্টা। অগ্রে উচ্চভাব সকল জাতি মধ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, তৎপরে কার্য্যের কথা।

অতএব বঙ্গদেশ মধ্যে অগ্রে সুমহৎ ভাব সমুদায় যাহাতে সুপ্রচারিত হয় তৎপক্ষে সমাজ সংস্কর্ত্তাগণের বিশেষ যত্নের আবশ্যক। অগ্রে মনকে ফিরান চাই, মন ফিরিলেই হৃদয় ভাববেগে পূর্ণ হইবে, এবং সেই বেগ কার্য্যক্ষেত্রে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গবাসিগণের জড়তা ও অসাড়তা অপনয়ন করিবার এই প্রধান উপায়। তাঁহাদিগের মধ্যে মহৎ-ভাব সকল উত্তমরূপে সুপ্রচারিত ও হৃদয়ঙ্গম হইলে কে তাঁহাদিগের ভাববেগ নিবারণ করিবে? তখন ভাববেগ স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, ভাববেগ প্রবল হইলে স্বতঃই কার্য্যক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত হইবে। তখন তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের জড়তা অপনীত করিবেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেই উচ্চভাব সকলের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাহাকে জাতীয় ভাব বলে, কাহাকে স্বদেশানুরাগ বলে, তাহা অনেকেরই বিদিত নাই। প্রকৃত বীরত্ব ও পুরুষকার, আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম, গৌরব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাব কয়জন বাঙ্গালী অবগত আছেন? এই সমস্ত উচ্চভাব দেশ মধ্যে প্রচারিত হউক; শুধু পুস্তকে নয়, শুধু সম্ভাষণে নয়, বাগ্মীর অগ্নিগর্ভ বাক্যে প্রচারিত হউক, হৃদয়-মধ্যে সুদৃঢ় অঙ্কিত হউক, তবে তাঁহাদিগের ভাববেগ বঙ্গবাসীর হৃদয়কে প্রতাড়িত করিবে। আজি বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে এ সমস্তের কোন ভাবই জাগরিত নাই, আমরা কিরূপে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবদান-পরম্পরা প্রত্যাশা করিতে পারি? দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণ করিয়া দেখ, বঙ্গবাসিগণ বিষম অজ্ঞানতার ঘোরে নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। কাহার মনে জাতীয় ভাবের সংস্কার মাত্রও নাই, স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও নাই। কেবল অধীনতার ভাব জাজ্জ্বল্যমান; জড়তা ও উদাসীনতাই প্রবল।

যে মহাত্মনেরা বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যস্ত ও চিন্তাপরায়ণ, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন, যাহাতে এদেশ মধ্যে অগ্রে মহৎ ভাব সমুদায় সুপ্রচারিত হয়। এক্ষণে বঙ্গের বিশাল ক্ষেত্রে বাগ্মীর উৎসাহ সূচক প্রবোধনার নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গবাসিগণের মন সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা এই সদ্ভাবে আকৃষ্ট হন, যাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয়ের অধঃস্থল পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে তাঁহারা এক্ষণকার কালোচিত কর্ত্তব্য সমুদায় বুঝিতে পারেন, এক্ষণে বাগ্মীর এরূপ উত্তেজন বাক্যের নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালীর পূর্ব্বকালের ভাব সকল যেরূপ ছিল, তাহাতে কেবল নীচতারই পরিচয় দেয়; তাহাতে স্বদেশানুরাগের